এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ এর উপস্থাপিত বিষয়

বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা (১৯৯১-'৯৬)

গবেষক

রমা রানী হালদার

GIFT

Dhaka University Library
403556

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

এ.কে.এম. শামছুল হক

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

403556

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

২০০৫

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উৎসর্গ

বাবা ও মা-কে

408538

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা (১৯৯১-'৯৬) শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

403556

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তারিখ ৩১. ১২. ২০০৫ইং
ঢাকা

রমা রানী হালদার
রমা রানী হালদার
এম. ফিল. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

থিসিস টি সম্পন্ন করতে যিনি সার্বিক সহযোগীতা দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক এ.কে.এম. শামছুল হক। শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় শিক্ষক মন্ডলী বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে অনুপ্রানীত করেছেন।

যাদের সহযোগিতায় ও অনুপ্রেরনায় আমার থিসিসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রমা রানী হালদার

Dhaka University Institutional Repository

UNIVERSITY OF DHAKA
Dhaka–1000, Bangladesh

Dated : 29.12.05

CERTIFICATE OF THE SUPERVISOR

With regard to the thesis entitled **"বিরোধীদল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা (১৯৯১-'৯৬)"** submitted by Rama Rani Halder for the M.Phil degree in Political Science at the University of Dhaka.

I certify that Rama Rani Halder carried out the research work under my direct supervision and guidance and that the manuscript of the thesis has been scrutinized by me.

The entire thesis comprises the candidates own work and it is her own personal achievement. It has not been previously submitted for the award of any degree, diploma or other similar title of recognition.

She has completed her research work to my satisfaction; and the final type copy of the thesis, which is being submitted to the University office, has been carefully read by me for its material and language and is to my entire satisfaction. The thesis is worthy of consideration for the award of M.Phil degree.

Dated : the 29.12.05

A.K.M. Shamsul Hoque

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

১.১ গবেষণার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য ১

১.২ গবেষণার পদ্ধতি ৩

১.৩ সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহের বিশ্লেষণ ৪

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়
পটভূমি

২.১ গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা ১৩

২.২ সরকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ১৮

২.৩ বিভিন্ন শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা ২১

তৃতীয় অধ্যায়
পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বিএনপি-র সরকার গঠন ও এর কার্যকারিতা

৩.১ সংসদ নির্বাচন ও বিএনপির সরকার গঠন ৩৮

৩.২ অধিবেশন সমূহের আলোচনা ৪০

৩.৩ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ ৫৪

চতুর্থ অধ্যায়
বিএনপি বা সরকারী দলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.১ কৃষি ব্যবস্থা ৬৮

৪.২ শিল্প ব্যবস্থা ৬৯

৪.৩ শিক্ষা ব্যবস্থা ৭৩

৪.৪ গোলাম আযম প্রসঙ্গ ৭৪

৪.৫ ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ৭৫

৪.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ৭৭

৪.৭ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকারী দলের কার্যক্রম ও বিরোধীদল হিসাবে আওয়ামী লীগ এর ভূমিকা

৫.১ ১৯৯১ এর নতুন সম্ভাবনা ও গ্রহণযোগ্যতা ৮৮

৫.২ ১৯৯২ এর পরিক্রমায় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ৯৪

৫.৩ ১৯৯৩ এর আলোকে সরকারী দল ও বিরোধী দল ৯৯

৫.৪ ১৯৯৪ এর আবর্তে রাজনীতির হালচাল ১১৪

৫.৫ ১৯৯৫ এর সার্বিক রূপ ১৪৮

৫.৬ ১৯৯৬ এর পরিণতি ও পরবর্তী অবস্থা ১৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার

সার্বিক মূল্যায়ন ও সুপারিশ ২১৬

গ্রন্থ পঞ্জি

তথ্য পঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

১.১ গবেষণার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য ঃ

পৃথিবীর সবগুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে এবং এ ধরনের রাষ্ট্রে বিরোধী দল সরকারি যন্ত্রেরই একটি অংশ বিশেষ হিসেবে পরিচিত ও স্বীকৃত। বিরোধীদলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র চলতে পারে না। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। যেকোন গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই সরকারী ও বিরোধীদলের সমঝোতার প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের সমঝোতা ছাড়া গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না। সরকারী ও বিরোধীদলের সদস্যরা একত্রিত হয়ে মূলতঃ জাতীয় নীতি প্রণয়ন করেন। বিরোধীদলের অংশগ্রহণ ব্যতীত কখনও জাতীয় নীতি গড়ে উঠতে পারে না। অথবা এ ধরনের কোন নীতি প্রণীত হলেও তার কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। এ কারণেই গণতন্ত্রের স্বার্থে বিরোধীদলের উপস্থিতি প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক সমাজে বিরোধীদলের এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই বিরোধী দলের প্রতি পরোক্ষভাবে সরকার গঠনের দায়িত্ব বর্তায়। বিরোধীদল এ জন্যই গঠন করে 'ছায়া মন্ত্রীসভা' যা সরকারি মন্ত্রী সভার বিকল্প হিসাবে কাজ করে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদলের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Sir Jennings এ প্রসঙ্গে বলেন, "তাৎক্ষণিকভাবে বিরোধী দল সরকারের বিকল্প এবং গণঅসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে থাকে। এর কার্যক্রম অনেকাংশে সরকারের মতই গুরুত্ববহ। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র হয় না। মহামান্য রানীর কাছে বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা সরকারী দলের মতই। আবার বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনকে মেনে নিতে না পারলে সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর হবে না।"[১]

Gilbert Campion সংসদীয় বিরোধীদের সম্পর্কে বলেন, "The opposition is the party for the time being in the minority organized as a unit and officially recognized, which has had experience of office and is prepared to

---

১ W. I Jennings, The British Constitution P–11

Dhaka University Institutional Repository

form a government when the existing ministry has lost the confidence of the country. It must have a positive policy of its own and not merely oppose destructively.[2]

বস্তুতপক্ষে বিরোধীদল এবং সরকার ঐক্যমতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমালোচনা করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। পারস্পরিক সহনশীলতা না থাকলে সংসদীয় সরকারের প্রক্রিয়া ভেঙ্গে যায়। বিরোধী দলের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে Harold Laski বলেছেন, "The opposition spends its time in revealing the defects of the government programme". বিরোধীদলের সমালোচনায় তীব্রতা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সংযত ও সতর্কভাবে চলতে বাধ্য করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচারী মনোভাবকে প্রতিহত করে। তাছাড়াও যে বিষয়ের উপর জেনিংস গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হলো "The prime minister meets the convenience of the opposition and the leaders of the opposition meets the convenience of the government".

স্বাভাবিকভাবেই সংসদীয় ব্যবস্থায় বিতর্ক ও আলোচনায় অধিকার স্বীকৃত বলে বিরোধী দল প্রায়ই সুযোগ খুঁজবে সরকারের ব্যর্থতা, দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তুলে ধরার জন্য। তারা সরকারী দলের পাবলিক পলিসি ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরবে এবং যুক্তির মাধ্যমে জনগণকে এমন ধারনা দেবে যে, ক্ষমতায় গেলে তারা ক্ষমতাশীল দলের চেয়ে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে দেশকে পরিচালিত করতে পারবে।

এছাড়া সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধীদলই যে শুধু বিরোধিতার ভূমিকা নেবে তা নয়। সরকারীদলের অসন্তুষ্ট অংশও বিশেষ ক্ষেত্রে দলের অভ্যন্তরে গঠনমূলক ও কার্যকর সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে। অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন, আর,এইচ,এস ক্রসম্যান (R.H.S. Crossman), স্যামুয়েল বিয়ার (Samuel Beer) জেমস্ লিন্স্কি প্রমুখ। বিরোধীদলকে সুপরিকল্পিত নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। কেননা, বিরোধীদলের ভূমিকা শক্তিশালী হয় ও কার্যকর হয় যদি তাদের কর্মসূচীতে সুনির্দিষ্ট সুচিন্তিত বক্তব্য থাকে।

---

[2] Gilbert Campion, "Development in Parliamentary system since 1918 in British Government Since 1918, P–19.

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বিরোধী দলকে জাতীয় স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে নিজেদের পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে। সেক্ষেত্রে বেগম খালেদা জিয়াকে মনে রাখতে হবে যে, তিনি শুধু বিএনপির প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি সারাদেশেরই প্রধানমন্ত্রী। আর বিরোধী দলকে মনে রাখতে হবে যে, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করাই বিরোধীদলের কাম্য নয়। কখনও সরকারের সাথে সহযোগিতা করাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পঞ্চম সংসদে অর্থাৎ ১৯৯১-'৯৬ সালে বিরোধীদলগুলো কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে।

১৯৯১-'৯৬ এই সময়ে বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা এর উপরে গবেষণা করা জরুরী হয়ে পড়ে এ কারণে যে এটি ছিল নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত প্রথম সংসদীয় সরকার। আর এ সময়ে প্রধান বিরোধী দল গণতান্ত্রিক চর্চার কেমন রূপ দেখিয়েছে তা খুব গুরুত্ববহ। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে এই গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি হলোঃ

১। গণতন্ত্রে বিরোধীদলের ভূমিকার প্রেক্ষাপট

২। পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকারী দলের কার্যক্রম সাপেক্ষে বিরোধী দলের ভূমিকা ও সার্বিক পরিস্থিতি।

১.২ গবেষণার পদ্ধতি ঃ

গবেষণার বিষয়টি যথাযথভাবে বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসসমূহের উপর নির্ভর করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎসসমূহের মধ্যে আছে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের বই, বিভিন্ন সাময়িক পত্র, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ এবং বিভিন্ন গবেষকের গবেষণা কর্ম, ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত রাজনীতিক যারা সরকারী ও বিরোধীদলে বর্তমানে আছেন এবং তখনও ছিলেন এমন ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা ও একটি জরিপ কার্য পরিচালনা। ক্ষেত্র পর্যায়ের লক্ষ্য ও নমুনা জনগোষ্ঠী ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর মানুষ। এদের মতামত জরিপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নমালা অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তসমূহ সমন্বিত করা হয়েছে এবং তা প্রয়োজনীয় স্থানে যথাযথভাবে সংযোজিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহের বিশ্লেষণ ঃ

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর ব্যাপারে উন্নয়নশীল বিশ্বের আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেলে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা বাড়ছে। রাশিয়াতে, পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ায় সংসদ গঠিত হয়েছে। সে সব দেশে মানুষ প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন করছে এবং সরকার পরিচালনা করছে। পশ্চিম ইউরোপে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ লাভ করেছে আরও আগেই। বৃটেনেও শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়েই জন্ম নেয় গণতান্ত্রিক চর্চা। এভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ দেশই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আর এই সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংসদীয় রীতিনীতি ও তার ঐতিহ্যের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃত্বের আস্থা ও অঙ্গীকার থাকা প্রয়োজন তথা বিরোধীদলের সদাসতর্ক ও দায়িত্ববান 'বিরোধী' ভূমিকারও প্রয়োজন।

পশ্চিমা উদারবাদী তাত্ত্বিক যেমন কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও তাদের অনুসারীদের লেখায় সাংবিধানিক বিরোধী দল এবং গণতান্ত্রিক ধারা সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মার্কসবাদ আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্রকে শাসিত অর্থনৈতিক শ্রেণীর সমাজ এর জন্য অত্যাচারের শক্তি হিসাবে মনে করে। উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এক ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয় যে, সমাজ গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত, উদার গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পুঁজি দ্বারা শ্রমিকদেরকে শোষণ নিশ্চিত করার জন্য মেয়াদোত্তর নির্বাচন এই পদ্ধতির আদৌ পরিবর্তন করে না। প্রচলিত মার্কসবাদীরা বলেন, রাষ্ট্রকে এত সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না, ইহা একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দমন করা যেতে পারে। অতএব, এর বলপ্রয়োগমূলক কাঠামো আন্দোলনের মাধ্যমে চূর্ণ করতে হবে। মার্কসবাদ পশ্চিমা উদারবাদী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এড়িয়ে চলে যা পুঁজিবাদী শ্রেণীকে আলাদা সুবিধা দেয় এবং কেবলমাত্র এই শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। উদারবাদী বুর্জোয়া গণতন্ত্রে চিন্তার স্বাধীনতা, অভিব্যক্তি, সংগঠন এবং সংগঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দল থাকে কিন্তু বাস্তবে এই পদ্ধতি শ্রমিক শ্রেণীক বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে কোন উপকার পেতে সমর্থ করে না। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে সরকারী ও

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীদলের নিপীড়িত শ্রেণীরা কিছুই পায় না। এমতাবস্থায় যেখানে ধনীদের টাকা ও প্রভাব প্রতিপত্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেখানে দরিদ্ররা রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এভাবে বুর্জোয়াদের রাজনেতিক অবকাঠামো শোষিত সাধারণ জনগণের জন্য কিছুই করতে পারে না। দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা নির্দিষ্ট প্রতিনিধির চাপে ভোট দিতে বাধ্য হয় এবং ঐ অত্যাচারী শ্রেণী সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেও তাদের উপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখে। এভাবে লেনিন লক্ষ্য করেন যে, সাধারণ মানুষকে বোঝা বানিয়ে কিছু বিশেষ উদ্দেশ্যের কারণেই সংসদ বাদ দেয়া হয়েছিল। মার্কসবাদীরা এটা সমর্থন করে যে, উদারগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান অত্যাচারিতদের জন্য একটি সুবিধা দেয় তা হল শ্রেণী সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো মার্কসীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন-সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে এক দলীয় সরকারের সৃষ্টি হয়েছে। Michael Curtis লক্ষ্য করেছেন যে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি এটা বুঝায় না যে, এখানে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র বিরাজমান, উদার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এখানে বহু চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাজ করে।

যদিও সাংবিধানিক বিরোধীদের ধারণা এবং সংগঠিত বিরোধীদের অস্তিত্ব বিকল্প সরকার হিসেবে মার্কসীয় মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তবুও কার্ল মার্কস এঙ্গেলস, লেনিন ও মাও সেতুং এর লেখা এবং তাদের অনুসারীরা শোষিতদের নতুন গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার সাথে এগিয়ে নিয়েছেন এবং এদের প্রধান উদ্দেশ্য সামগ্রিক কল্যাণ সাধন ও অধিকাংশ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মুক্তি দান।

পূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশগুলোর মার্কসীয় ও লেনিনীয় একদলীয় শাসন ব্যবস্থা অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে এখানে পশ্চিমা উদার গণতন্ত্রের সূচনা হয় যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরোধীদলের মুক্ত ভূমিকা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

There has also been as S.P. Huntington states third wave transition to democracy in which many of the less developed societies formerly under the control of authoritarian regimes have opted for participatory democratic politics characterized by the presence of constitutional and legal opposition.[3]

বিরোধীদের ধরন ঃ

বিরোধীদের ধরন বা প্রকারভেদ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমনঃ সাংবিধানিক কাঠামো, দলীয় পদ্ধতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি। সংসদীয় পদ্ধতি ও রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতিতে বিরোধীদের কার্যকলাপে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। বিরোধীরা রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতন্ত্রের চেয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে অনেক বড় ও বাস্তব ভূমিকা নেয়। সংসদীয় পদ্ধতিতে একটি ছায়া কেবিনেট থাকে যা রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতিতে থাকে না। এ পদ্ধতিতে বিরোধী নেতা আলাদা পদে আলাদা সুবিধা পায়। আবার দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থায় বিরোধীদের পৃথক ক্ষমতা, মর্যাদা ও অবস্থান আছে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় বিরোধীরা খুবই শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী এবং বিকল্প সরকার হিসেবে কাজ করে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ, নির্বাচনী দৃঢ়তার অভাব, ঐক্যজোটের সরকার সামনে এসে যায়।

Dodd mentioned that governments in multi party parliaments must be minority cabinets, coalition cabinets or both occurring in socially fragmented societies.[4]

Powell noted that majoritarian political systems tend to bring about two party competition that leaves no space for extremist parties in opposition whereas representative party systems. multi party systems, characterized by fractionalization offer a real opportunity for such parties.

---

[3] S.P. Huntingtorn, Journal of Democracy, vol. 2, No.2, Spring 1991, P–13.

[4] C. Dodd coalitions in Parliamentary government of print on : Princeton University Press, 1976.

Dhaka University Institutional Repository

এই পদ্ধতিতে লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দলের সাথে বিরোধীদের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন-আনুগত্য প্রদর্শন, বিরোধিতার প্রবণতা বা দ্বন্দ্বমূলক।

According to Dahl in at least six important way opposition may differ. These include :

1. Organizational cohesion or concentration of the opponents.
2. Competitiveness of the opposition.
3. Site or setting for the encounter between opposition and those who control the government.
4. Distinctiveness or identifiability of the opposition.
5. Goals of the opposition and
6. Strategies of opposition.[5]

এটা বিশ্বাস করা হয় যে, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বিরোধীদের ধরন বা আচরণ বিভিন্ন রকমের বৈষম্যের কারণে বিভিন্ন রকম হয় যেমন, অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষম্য, সামাজিক অবস্থান, ভাষাগত দিক এবং জাতিগত গ্রুপ, ধর্ম ও আঞ্চলিক ব্যবধান এসব কিছু।

In categorising opposition Sartori indentified the following :
Constitutional and responsible opposition; constitutional but non-responsible opposition; and oppositions which are niether responsible not constitutional.

এছাড়াও বিরোধীদের শ্রেণী ভাগ করতে গিয়ে আরও উল্লেখ করা যায় ঃ সক্রিয় বিরোধী, নিষ্ক্রিয় বিরোধী, বিভাগীয় বিরোধী, নিকটবর্তী বিরোধী, একঘেয়েমি বিরোধী, মৌলিক বিরোধী এবং প্রকৃত বিরোধী।,

উন্নত ও উন্নয়নশীল গণতন্ত্রে বিরোধী দল ঃ

উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্বের রাজনীতিতে বিরোধীদের ভূমিকা, অস্তিত্ব ও বিবর্তনে পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয়। নিচে এই দু'ধরনের বিরোধীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

---

[5] Robert A. Dhal, Op. Cit. P. 332.

Dhaka University Institutional Repository

বৃটেনে বিরোধী রাজনীতি ঃ

Her Majesty's loyal opposition in U.K. বৃটেনে নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র থেকে সীমিত সরকারে রূপান্তরিত করতে অনেক বছর ও শতাব্দী সময় নিয়েছে। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা আইন, ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদন, ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব, ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন এমন কিছু আইন বৃটেনে সংসদীয় গণতন্ত্রে পরিবর্তন এনেছে এবং সাংবিধানিক বিরোধীদের স্বীকৃতি দিয়েছে। তার রাজকীয় ক্ষমতায় বিরোধিরা সবার কাছে পরিচিত হতে থাকে ১৮২৬ সাল থেকে। দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এটাই বুঝায় যে, রাজকীয় ক্ষমতায় বিরোধীরা এখনকার মত বিকল্প সরকার হিসেবে ছিল না। শক্তিশালী, শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং সংগঠিত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে বিরোধীরা কার্যকরী বিকল্প সরকার হিসেবে উঠে আসছে। বৃটেনের বিরোধী নেতা অফিসিয়াল মর্যাদার অধিকারী এবং সংসদীয় বিরোধী দলকে এবং পার্লামেন্টের ছায়া কেবিনেটকেও তিনি পরিচালনা করেন।

S.E. Finer mentioned that opposition in Britain is well organized to pose a challenge to the government in the parliament. It is continuous and as such permanent, it is representative with its party followers; it is alternative government as it takes over with the fall of the government and it is a participant in the governmental performance in the legislature.[6]

লক্ষ্য করা যায় যে, রাজা বা রানীর ক্ষমতায় বিরোধীরা বৃটিশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সমালোচনা করা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করা কেবল সরকারকে বাঁধা দেয়া বা বিঘ্নিত করা তাদের কাজ নয়। সংসদীয় বিতর্ক ও আলোচনার অধিকাংশ ব্যাপারের সামনে চলে আসে দুইটি পক্ষ– সরকার ও বিরোধী। বৃটেনে সরকারের জবাবদিহিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্ষমতাসীন দল সবসময় অবশ্যই বিরোধীদলের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে।

---

6 S.E. Finer in D. Sundas Ram Op. Cit. P-37.

Dhaka University Institutional Repository

Curtis stated that opposition in British political system attempts to amend or moderate the policy and legislation of the party in office.

K.C. Wheare illustrated that opposition in Britain means that it is constitutional as well as 'Loyal'.

যদিও বিরোধীদের মাঝে ক্ষমতাসীন দলের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিরোধ থাকে, তবুও তারা রাজনীতির নিয়মে সরকারের সাথে একমত শাসন ব্যবস্থা ও সরকারী কার্যক্রমে তারা এক এবং তাদের কাছে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে দলীয় কার্যক্রমের বাইরে।

বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন যে, দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক কাঠামো ভাল কাজ করে এবং বৃটেন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমেরিকার রাজনীতিতে বিরোধী দল ঃ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতান্ত্রিক দেশ যার ভিত্তি সংবিধানে বিধৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, যা ১৭৮৯ সালে গৃহীত। যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের তিনটি বিভাগই যেমন রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস ও বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে। তবু সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ভারসাম্য নীতির উপর নির্ভরশীল। আমেরিকার সংবিধান প্রণয়নকারীরা একটি সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকার তৈরি করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের নিয়মিত ব্যবধানের পর নির্বাচন পদ্ধতি তৈরি করে গেছেন কিন্তু রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করেননি যা প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের শাসনকাল (১৭৮৯-১৭৯৭) পর্যন্ত ছিল। "Parties originated during that administration largely in support of or in opposition to its policies".[7] বহু বছর যাবৎ এদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে দ্বিদলীয় প্রতিযোগিতায় রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক দলের মাধ্যমে।

While commenting on the opposition in the united states K.C. Wheare stated that there is a government of the U.S.A and there is plenty of opposition to it and there is plenty of people to lead this opposition.

---

[7] Stephen J. Wayne, 'Political Parties in the United States" (Mimeo), P–3

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান, একদলের প্রাধান্য থাকে এবং অন্য দল নিজেদেরকে বিকল্প বলে মনে করে। এভাবে আমেরিকায় বিরোধীরা স্বীকৃত ও বৈধ। সংবিধানের জন্য দুই দলই সমানভাবে একত্রিত। তবুও কোন বিরোধী নেতা নেই। এখানে কংগ্রেসে প্রচুর বিরোধীরা আছে যাতে সরকার প্রস্তাব করে ও কাজ করে। বৃটেনের মত নয়, আমেরিকায় দুইদলের কংগ্রেস সদস্যরাই রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে এবং তার কার্যাবলী প্রত্যাখ্যান করতে পারে। বৃটেনের সাথে মৌলিক পার্থক্য থাকার কারণে আমেরিকায় সাংবিধানক ভাবেই বিরোধীদল থাকা অসম্ভব।

ভোটারদের মধ্যে স্থির সমর্থন ও আনুগত্য থাকার জন্য আমেরিকার দলগুলো বিরোধীদের জন্য একটি ভিত্তি যোগার করে। পার্টির মধ্যে বিদ্যমান এমন আনুগত্য কখনও সম্পূর্ণভাবে শেষ হতে পারে না।

Dahl mentioned the following normal patterns of oppositions in the united states :

(1) Opposition seeks limited goals that do not directly challenge the major institutions or prevailing American beliefs.

(2) Opposition employ a wide variety of strategies combining a heavy emphasis on bargaining and pressure group activities in policy formulation.

(3) Oppositions are not usually very distinctive and are not even clearly identifiable as oppositions; they are thus melt into the system.

(4) Oppositions are not combined into a single organization; they usually work through one or both major parties; these parties are highly competitive in national elections but in congress they are both competitive and cooperative.

(5) Opposition try to gain their objectives by seeking out encounters with decision makers at different bureaucratic, judicial, congressional on local levels.

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষজ্ঞদের লেখা থেকে এটা মনে হয় যে, আমেরিকায় বিরোধীদের কার্যাবলীতে কেবলমাত্র দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উভয় দলের কংগ্রেস সদস্যরা প্রেসিডেন্টেরও বিরোধিতা করে।

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায়, বৃটেন ও আমেরিকার সাংবিধানিক কাঠামো ভিন্ন-সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত। কিন্তু দুই দেশেই দ্বিদলীয় ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন ব্যবস্থায় অংশ নেয় ও অন্য দল বিকল্প সরকার হিসেবে মনে করে এবং উভয় গণতন্ত্রেই রাজনৈতিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিরোধীরা বৈধভাবে সংগঠিত।

উন্নত ব্যবস্থাগুলোতে যেমন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা বিরোধী দলসহ দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের উদাহরণ। বৃটিশ ও আমেরিকার মত নয়; পশ্চিমা ইউরোপের দেশ যেমন ইটালী, ফ্রান্স ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জাতিদের বহুদলীয় পদ্ধতি রয়েছে যেখানে কোন বিকল্প সরকার নাই।

অনুন্নত গণতন্ত্রে বিরোধী দল ঃ

পশ্চিমা উদারবাদী গণতন্ত্রের মত নয় উন্নয়নশীল সমাজে কখনও কখনও সম্পূর্ণ বিরোধী চিত্র দেখা যায়। অনুন্নত বিশ্বের অনেক দেশ উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উপনিবেশিক ক্ষমতার পথ গ্রহণ করেছে। অনুন্নত সমাজের নেতাদের জন্য দ্রুত আধুনিকায়ন, স্থায়ীত্ব, সংহতি ও উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে পশ্চিমা উপনিবেশিক ক্ষমতায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানীকরণ ও সাংগঠনিক আয়োজন একটি আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু দেখা গেছে এই সমাজের অনেক দেশই এই গণতান্ত্রিক চর্চা করতে গিয়ে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। অনুন্নত গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক চর্চার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এখানে দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সংহতির উপস্থিতি কম। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের চেয়ে রেষারেষি, কোন্দল এগুলো বেশী প্রাধান্য পায়। দেশের বা জনগণের স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থ তথা ব্যক্তি স্বার্থকে তারা বড় করে দেখে। দেশের উন্নয়নের জন্য সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে একত্রিত মনোভাব খুব কমই দেখা যায়। গণতন্ত্র যেখানে জনগণের জন্য, দল সেখানে দলীয় নেতাদের স্বার্থে পরিচালিত হয়। বিরোধীরাও হীন মানসিকতার পরিচয় দেয়। সর্বোপরি অনুন্নত দেশগুলোর গণতান্ত্রিক আদর্শে বিরোধী দলের ভূমিকা নেতিবাচক।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

মূলতঃ এমফিল অভিসন্দর্ভের জন্য এই গবেষণা পরিচালিত হয়। সংক্ষিপ্ত সময়, সীমিত আয়োজন, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, কারিগরি ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা গবেষণা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এছাড়াও বিভিন্ন স্তরের মাত্র কিছুসংখ্যক মানুষের মধ্যে পরিচালিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে গৃহীত সাক্ষাৎকার দৃশ্যতঃ গবেষণার শিরোনাম "বিরোধীদল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা (১৯৯১-'৯৬)"—এর জন্য যথেষ্ট পরিমান প্রতিনিধিত্বশীল নাও হতে পারে। যাহোক প্রাপ্ত তথ্য ও সাক্ষাৎকার দাতাগণের সাথে প্রশ্নমালার মাধ্যমে আহরিত মতামত নিঃসন্দেহে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়েছে, যা নির্দিষ্ট অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
পটভূমি

২.১ গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা ঃ

সংজ্ঞা ও বিশেষজ্ঞদের মতামত ঃ 'Opposition' বা 'বিরোধী' র সংজ্ঞা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। যেমন- এনসাইক্লোপিডিয়া, অভিধান, বই, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিকদের লেখায়।

Grolier encyclopedia তে "The name opposition is given to a party that is out of power and that exists mainly for the purpose of the criticising the party in power if possible supplanting it."[8]

Opposition বা বিরোধীকে "Universal Dictionary of English Language–এ এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে "As a bod-y of individuals who hold opposing views to a decision or policy and as part of parliamentaries they are opposed to the party in the government.[9]

Oxford Advanced Dictionary regards opposition as the majority and minority members of a political party in the congress holding political views opposed to the president and his executive department; in the context of parliamentary system it mentions that opposition include the political party opposed to the government and offers itself to replace the rubbing party whenever necessary.[10]

According to the penguin Dictionary of politics, "an opposition is political grouping, party or loose association of persons who wish to change the government and alter its policy decisions."[11]

---

8 Grolier Encyclopedia, (New York and Tarento, Thge Grolier Society Publishers 1958), P–139
9 The Universal Dictionary, the English Language, P–804.
10 Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (Oxford, Oxford University Press, 1974), P–589.
11 Dictionary of politics (London, Penguin Books, 1986) P. 243.

Dhaka University Institutional Repository

ইহা এভাবে ব্যাখ্যা করে–গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধীদের একটি স্বাভাবিক অবস্থান আছে এবং বিকল্প সরকার হিসেবে নিজেকে দাবী করতে পারে আর এ দুই-ই সরকারের নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নির্বাচনে সম্ভাব্য শাসনকারী দল হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে।

রবার্ট এ ডাল বলেছেন যে, সংগঠিত বিরোধীদলের অধিকার ভোটারদেরকে নির্বাচনে ও সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা এবং সরকারের বিরুদ্ধে সমর্থন দেয়ায় রাজী করা। ইহাই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে মাইলফলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বৈধ, নীতিগত এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক বিরোধীদলের মনোভাব খুব কমই দেখা যায়।

যেহেতু মানুষের মধ্যে মতের পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব থাকে তাই সরকার ও রাজনৈতিক সমাজকে সবসময়ই বিরোধীদের সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু আগের দিনের বিরোধীদের সাথে বর্তমানের বিরোধীদের এক বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।

বিরোধীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ বিরোধ এবং বৈধ ভাবে সংগঠিত গ্রুপ এবং সরকারের সমালোচনাকারী রাজনৈতিক দল খুব কম দেখা যায়। বর্তমান যুগে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়াস রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংগঠিত বিরোধী দলের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পার্থক্য ও সামাজিক দ্বন্দ্বের নিরসনের পদ্ধতি খোঁজা এবং নাগরিকের কাছে তাদেরকে বিকল্প সরকার হিসেবে উপস্থাপন করা। বর্তমানে যেকেউ গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিরোধীকে মনে করতে পারে বৈশিষ্ট্যমূলক রূপ এবং বিরোধীদল ছাড়া গণতন্ত্রের কোন মূল্যই থাকে না।

সরকারের বিরুদ্ধে বৈধ প্রতিক্রিয়া জানানোর মত সংগঠিত বিরোধী দল এর গুরুত্বও কম নয়। Michael Curtis বৈধ ও সাংবিধানিক বিরোধী দলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে বলেন, "His Majesty's opposition" যা ১৮২৬ সালে বৃটেনে প্রথম ব্যবহৃত হয়। বৃটেনে এর আনুগত্য রয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর শৃঙ্খলা ও গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে; ইহা সরকারের ধ্বংসমূলক কাজ করে না, বিরোধী দলকে বিপক্ষে কাজ করতে দেয় না, সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে দেয় না।

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রের উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে সাথে সাংবিধানিকভাবে বিরোধী দলের উদ্ভব হয়েছে। অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে গণতন্ত্র বিরোধী দলের জন্য বেশী সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে এবং গণতন্ত্রের এই বিরোধী দলের পরিধিও বেশী। পাশাপাশি গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য বিরোধী দলের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমানে দাবী তুলে ধরা হচ্ছে।

Lame and Erosson opined that democracies not only offer freedom of thought, speech and contract but faster the autonomy of organization and political institutions.[12]

সরকার ও বিরোধী উভয়েরই একটি পরিষ্কার বোঝা পড়ার ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের এ অধিকার থাকে যে, তারা নির্দিষ্ট সময় ধরে দেশ শাসন করবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ বা বিরোধী দলের এ অধিকার থাকে যে, ক্ষমতাসীন দলের অপারগতা নাগরিকদের ধরিয়ে দেবে এবং সরকারের অনুপযুক্ততা তুলে ধরবে। এভাবে বিরোধীরা জনসাধারণকে নিজেদের মতে পরিচালিত করার চেষ্টা করবে যাতে তারা সরকারের বিপক্ষে যায় এবং পরবর্তী সময়ে তারা ক্ষমতা গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। এভাবে সরকারী ও বিরোধী উভয় দলই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাদের চর্চা অব্যহত রাখতে পারে।

Guglielme Ferrero pointed out that in democratic country the opposition is an organ of popular sovereignty just as vital as the government to suppress the opposition is to suppress the sovereignty of the people.

A.D. Lindsay noted that good representative system requires not only a strong opposition. It needs also that the opposition should be an alternative government; thus representative political democracy involves differences and opposition.[13]

---

12 Jan-Erik Lave and Svant O. Errson, Politicas and society in western Europe (London : Sage Publications, 1987)P–16.

13 Ad. Lindsry The Essentials of Democracy (London : Oxford University Press, 1929, Sixth Impression Oxfored at Claredon Press, 1967)

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে H.B. Mayo বলেন, "The existence of political opposition by persons and groups, by the press, and above all by organized political parties has been the litmus paper for democracy".[14]

গণতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা মত প্রকাশ করেন যে, গণতন্ত্র হলো প্রকৃতিগতভাবে ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের একটি পদ্ধতি এবং বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব ছাড়া গণতন্ত্র হতে পারে না। এভাবে গণতন্ত্রে বিরোধী দল সম্পর্কে অনেক তাত্ত্বিকরাই অনেক মত প্রকাশ করেছেন তা তুলে ধরা হলো ঃ

James L. Gibson et al stated that tolerance is typically thought to be an essential ingredient of democratic politics. Without toleration of opposition widespread contestation is impossible, regime legitimacy is imperiled and no conformity prevails.[15]

Ernest Barker, "Democracy liberates opposition and that the essential feature of democracy is the presence of opposition whcih may be in the electorate, in parliament and even in the anti cabinate which confronts and challenges the cabinet.[16]

Edward Shills indicates the importance of organize reponsible and coherent opposition in a political democracy.[17]

K.C. Wheare noted that the chief part of performing the function of making the government behave falls to the opposition and its leader.[18]

MIchael curtis observed that the crucial element in a parliamentary democracy is the existence of a legal opposition which is not only tolerated but sometimes may select the subjects and opportunities for debate and provide an impact on the governmental actions and decisions.

---

14 H.B. Mayo, Introduction to Perocratic Theory (New York : Oxoford University Press, 1960), P-149.
15 Jame L. Gibson et al, "Democratic Values and the Transformartion of the Soviat Union" The Journal of Politics vol. 54, no. 2, May 1992.
16 Ernest Berker, Reflections in Government (London : Oxford University Press, 1942, 1967, P–202–203)
17 Edward Shills, Political Development in the New States-II.
18 K.C Wheare, Legislatures (London : Oxford University Press, 1968) P–77

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীদের অস্তিত্বের স্বীকৃতির অধিকার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একান্ত দরকার এবং ইহা সংগঠিত হওয়ার স্বীকৃতি দেয়া হয় শুধুমাত্র সরকারের সমালোচনা করার জন্য নয় বরং নির্বাচনী সময়ে নির্বাচিতদের বিভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য জানানোর জন্য। দুই বিরোধী পক্ষ যেমন শাসনকারী শ্রেণী ও বিরোধীদলের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য খুবই প্রয়োজন রয়েছে।

একটি কার্যকরী বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলকে তার কার্যক্রমের সীমা লংঘন করা থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, তার দায়িত্ব কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। জনগণের দাবীতে সাড়া দানকারী হিসেবে গড়ে তোলে এবং খুব ভাল কাজের মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে তোলে। দেশের সার্বিক পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণী জনগণকে যথাসময়ে জানিয়ে দেয়া বিরোধী দলের দায়িত্ব এবং সরকারী দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে জনমত সংগ্রহ করাও এর কাজ। দেশ যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর সম্মুখীন হয় বিরোধীরা সেক্ষেত্রে জনমতকে আরও সচেতন করে তোলে এবং আলোচনা ও বিতর্কের পদ্ধতিকে আরও কার্যকরী করে তোলার জন্য জনগণকে আইনসভার কাছাকাছি নিয়ে আসে। ইহা অফিসিয়াল ক্ষমতাকে স্বেচ্ছাচারী হওয়া থেকে প্রতিরোধ করার জন্য সামাজিক ক্ষমতা সংগঠিত করে এবং গণতান্ত্রিক আদেশের নিরাপত্তার জন্য ইহা সদা-সতর্ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

জুয়ান লিঞ্জ সাংবিধানিক বিরোধীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বলেন, নির্বাচনী প্রচারণায় ক্ষমতা লাভ করার জন্য সব কথা দেয়া হয় ক্ষমতা লাভ করতে চরম অসমঝোতাপূর্ণ আচরণ বাদ দেয়া, সেনাবাহিনীতে অসাংবিধানিকতা বাদ দেয়া; ক্ষমতা পেতে সমর্থকদেরকে অন্য উপায়ে রাজী করানো বাদ দেয়া, রাজনৈতিক পদ্ধতিতে এসে অন্যায় কাজ করা, স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা, শর্ত ছাড়া নির্বাচন ও সংসদীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এবং আনুগত্যহীন বিরোধীদের সাথে গোপন চুক্তি করা বাদ দেয়া এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের যেকোন কিছুর বিনিময়ে সমর্থন বাদ দেয়া। উপযুক্ত সাংবিধানিক নিয়ম ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে উপরোল্লিখিত দিকগুলো বিরোধী দলের ভূমিকা রাখতে সহায়ক হয়।[১৯]

---

19 J. Lins, The Breaddown of Democractice Regimes : Crisis, Breakdown, and Requililoration (Baltiuore : John Hopthins Unioversity Press, 1978) P-36.

Dhaka University Institutional Repository

One scholar has explained the role of democratic opposition in the following manner, "No real democracy can function without a strong vigilant and vigorous opposition. It in an integral part of the democratic structure and the conscience keeper of a democratic society."

যথাযথ সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিরোধী দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে, দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করে, বিরোধীদের সরকারী দলের পাশে থেকেই সকল নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সহায়তা করা উচিত। গণতন্ত্রে বিরোধীদেরকেও গণতান্ত্রিক মানসিকতায়ই পরিচয় দেয়া উচিত। কেবলমাত্র সরকারের ত্রুটি না ধরে তাদেরকে সকল কাজে সহযোগিতার মানসিকতা পোষণ করা এবং জনগণের কল্যাণের কথা ভেবে উদার মানসিকতায় পরিচয় দেয়াই বিরোধীদের উচিত। গণতন্ত্র যেমন সবার, তেমনি গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও হওয়া উচিত সরকারি দল ও বিরোধী দল সবায় অংশগ্রহণ ভিত্তিক যায় মুখ্য উদ্দেশ্য জনকল্যান। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হয়ে সমঝোতাপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেয়া উচিত।

২.২ সরকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ঃ

সংসদীয় গণতন্ত্র ও বাঙ্গালীর আন্দোলন কথা দু'টি একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের জনগণকে এই সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, করতে হয়েছে অনেক আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বৃটিশ শাসনের অবসান হলে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানও সংসদীয় পদ্ধতির পদ্ধতির সরকার দিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত চারজন গভর্নর এর অধীনে ৭টি মন্ত্রি পরিষদ ছিল। সংসদীয় সরকারের নীতিগুলি বাস্তবে কাজ করতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় শাসনে গভর্নরদের অহেতুক হস্তক্ষেপের জন্য পাকিস্তানের প্রথম দশকের সংসদীয় রাজনীতি ভাইসরিগ্যাল ব্যবস্থায় পরিণত হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলায় প্রথমবারের মত সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ইহা বেশীদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত এই দশ বৎসর সামরিক শাসন ও রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকে। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের একমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

সাধারন নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ পূর্ববাংলার সকল দল সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে জোড়ালো দাবী তোলে ও তা পরবর্তীতে কার্যকরী হয়। আর এভাবেই সংসদীয় ব্যবস্থা বাঙ্গালীর রাজনৈতিক কৃষ্টির অপরিহার্য অংশে পরিণত হয় যেখানে সরকারী ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে থাকে।

জাতীয়তাবাদী দলগুলোর কার্যধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা সার্থক বাহন হলেও শাসনকারী দল হিসেবে অনুপযুক্ত। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রতিটি দেশের ইতিহাস পর্যালোচনাকালে এ ধরনের রূপই পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত এদেশের গণমানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা এবং তাদেরকে আন্দোলনমুখী করে তুলতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারন এবং বুদ্ধিজীবী মহল এক বাক্যে শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করতে বাধ্য এবং তাকে জাতীয়তাবাদী নেতা এবং স্বাধীনতার অগ্রদূত হিসেবেও স্বীকার করে নেন।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে যেমন দেখা যায়, স্বাধীনতা আনয়নের পর নেতৃত্বদানকারী দল শাসনকারী দল হিসেবে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয় না তেমনি বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের মাঝে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দলটি সুশৃঙ্খলভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দেশের জনগণের কাছে শাসক হিসেবে ওতটা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেনি।

সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ যে উদারবাদী হয়ে থাকেন তার প্রমাণ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে উৎখাত করতে পারেননি বলেই গৃহশত্রুরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফলে স্বজন-প্রীতি, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, গুপ্ত হত্যা, হাইজ্যাক প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি জনমনে আশংকার সৃষ্টি করে এবং ভুল পররাষ্ট্র নীতির ফলে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার হন তিনি নিজেই এবং তার দলীয় সদস্যরাও।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ এর নির্বাচনে বিজিত আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭১ এর ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের নিকটবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয়। শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারী শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে আসেন এবং ১১ জানুয়ারী এক অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারী করেন সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য। ১২ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন।

১৯৭০ সালে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয় একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য। উক্ত গণপরিষদ মাত্র ১ বছরের মধ্যে একটি সংবিধান রচনা করে যা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। ১৯৭২-এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকর করা হয়। "One of the great achievement of the AL regime in its first twelve months in power was the successful completion of the task of constitution making."[20]

১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈধতাদান ও সংসদীয় সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবার জন্য আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯২টি আসন পেয়ে সংসদে শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই একে এক দলের প্রাধান্যশীল সংসদীয় ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ এতে বিরোধীদল বলতে কেরল জাসদ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল। এভাবে স্বাধীনতা উত্তরকালে সংসদীয় পদ্ধতির আওতায় একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা হলেও মেয়াদপূর্তির আগেই এর সমাপ্তি হয়। এর পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করেছিল ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক জারীকৃত চতুর্থ সংশোধনী বিল।

চতুর্থ সংশোধনী কেবল সরকার ব্যবস্থাই পরিবর্তন করেনি এবং এর মাধ্যমে এক দলীয় কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করা হয়। নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়। মত প্রকাশ ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

---

[20] Rounaq Jahan, Bangladesh Politics Problems and Issues, Dhaka University Press Ltd. 1980, P–67.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক, সংকট আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং মুজিবের ক্যারিজমা রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান গঠনে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। "The leader was considered by his party faction as an institution in himself which did not help the process of reutilization, instead it widened the division with in the party.[21]

আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও এবং সুসংগঠিত দল হওয়া সত্ত্বেও ইহা এদেশের মানুষকে যে আশার বাণী শুনিয়েছিল শাসনকারী দল হিসেবে তা পূরণ করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী সফল হয়নি এবং দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটেনি। "Power which was means to an end with the nationalist elite before independence. The elite rejected parliamentary democracy and turned to an alternative model which promised it to a langer stay in power.[22]

আওয়ামী লীগ সরকার দেশে বিদ্যমান অসন্তুষ্টির কারণসমূহ অপনোদন করতে ব্যর্থ হয়। জনগণ বাকশালের সরলতার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি দেশের জনগণের বীতশ্রদ্ধ ভাব আসে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিব তথা আওয়ামী সরকারের পতন ঘটায়।

২.৩ বিভিন্ন শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা ঃ

(১) মুজিব শাসনামলে বিরোধী দল ঃ

মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতায় আসীন হয়। এ সরকারের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করার মত বা তার বিরোধিতা করার মত কোন রাজনৈতিক শক্তি তখন বাংলাদেশে ছিল না। বস্তুতঃ ন্যাপ (আঃ), ন্যাপ (ভাঃ) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং) সহ সকল দল, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক নেতাই শেখ মুজিবুর রহমানকে বৈধ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু মুজিব ক্ষমতাসীন হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে (ন্যাপ আঃ) ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বামপন্থী

---

[21] Zillur Rahman, Leadership Crisis in Bangladesh, DUPL, Red Cross Building, Motijhile Commercial Area, 1982, p–967.

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠী প্রচারণা শুরু করে। অবশ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধীতা করার অভিযোগে দক্ষিণপন্থী দল যথাঃ মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পিডিপি ইত্যাদি দল সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। ফলে তারা প্রকাশ্যভাবে সরকারের সমালোচনার অবতীর্ণ হতে পারেনি। অন্যান্য কয়েকটি দল সরকারের বিরোধিতা করে। বিভিন্ন জোটের ভূমিকা ও বিরোধী দলের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো ঃ

(ক) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ঃ

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ নেতাদের ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও প্রিয় তোষনের কারণে বিশেষত তরুন সমাজের মধ্যে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। তাছাড়া দ্রব্য মুল্য বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব। সরকার কর্তৃক ভারত তোষন নীতি গ্রহণের অভিযোগ সম্পর্কে প্রচারনা ইত্যাদি কারণেও আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মনে অসন্তোষের সঞ্চার হতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা ও পাক-বাহিনীর সাথে সহযোগিতার অভিযোগেও লীগ কর্তৃক প্রায় ৪০,০০০ ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ফলে এ সকল পরিবারের বিপুল সংখ্যক সদস্য স্বভাবত আওয়ামী লীগের উপর ক্ষুব্ধ ছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাত্র ফ্রন্টের (ছাত্রলীগ) মধ্যে একটি গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল। ডাকসু'র সহ-সভাপতি জনাব আ,স,ম আব্দুর রব এবং শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বাধীন এ গোষ্ঠী ১৯৭২ সালের মে মাসে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদীয় শাসন পদ্ধতি পরিহার করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার গঠনের দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতাগণ সংসদীয় শাসনকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন এবং বিপ্লবী সরকার গঠনের ধারণা অগ্রাহ্য করেন।

অবশেষে জনাব আ,স,ম আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজ ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে "জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল" (জাসদ) নামে একটি নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। দলের সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয় এবং জনাব রব ও মেজর

---

22 K. Ali, Bangladesh A New Nation.

Dhaka University Institutional Repository

(অবসরপ্রাপ্ত) জলিলকে যৌথ আহবায়ক করা হয়। তবে জনাব সিরাজুল আলম খানই এ নতুন দলের মূল সংগঠক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

(খ) সাত দলীয় সংগ্রাম কমিটি ঃ

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিব সরকারের প্রতি সমর্থণ জানালেও সে সমর্থন ক্ষণস্থায়ীই হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে শেখ মুজিব সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে মাওলানা ভাসানী ও সরকার বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি 'সাতদলীয় সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটির শরীক দলগুলো ছিল- ন্যাপ (ভাঃ), জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, জনাব অলি আহাদের নেতৃত্বাধীন বাংলা জাতীয় লীগ, শ্রমিক-কৃষক সাম্রাজ্যবাদী দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ সোশ্যালিষ্ট পার্টি।

সাতদলীয় সংগ্রাম কমিটি জানায় যে, আওয়ামী লীগ সরকার দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে বিশ্ববাসীর নিকট সাহায্যের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে কিন্তু দুর্নীতি পরায়ন সরকারের আবেদনে প্রয়োজনীয় সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। সরকার দূর্নীতি ও অযোগ্যতাকে ধামাচাপা দেবার জন্য, গণআন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, মশিউর রহমান, অলি আহাদসহ বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দকে আটক করে রেখেছে, ১৪৪ ধারা জারী করে মাইক ব্যবহার বন্ধ করেছে, নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে জনগণ ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করে লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচতে হলে বিদেশ হতে ব্যাপকভাবে খাদ্য আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পাচার, কালোবাজারি, মজুদদারি বন্ধ করে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে জনগণকে উৎসাহিত করে জনগণকে উৎসাহিত করে সমবণ্টনের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সাতদলীয় সংগ্রাম কমিটি আরও ঘোষণা করে যে, বর্তমানে জাতীয় সংকট একমাত্র সর্বদলীয় জাতীয় সরকারই মোকাবিলা করতে সক্ষম। তাই সর্বদলীয় ঐক্যজোটের এ সভায়

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও জাতীয় সংকট মোকাবিলা কল্পে ও মুহূর্তে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ এবং সর্বদলীয় সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

১৯৭৪ সালের ২৭, ২৮, ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ কর্তৃক উত্থাপিত এবং বৈঠক কর্তৃক অনুমোদিত রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয় যে, "দেশে গভীর সংকট বিরাজ করছে। কেবল শাসকদল আওয়ামী লীগ ও প্রশাসন যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল থেকে বর্তমানে প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মাধ্যমে সংকট মোকাবিলা করে দেশকে অগ্রগতির পথে নিতে পারছে না। তাই অনতিবিলম্বে দেশে রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা একান্ত জরুরি বলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে।

'সাতদলীয় সংগ্রাম কমিটি'র রাজনৈতিক বক্তব্য জনগণের মধ্যে খুব বেশী আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। মাওলানা ভাসানীর রুশ-ভারত বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্যই দেশবাসীর মনে দারুনভাবে আবেদন সৃষ্টি করে এবং তা আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

(গ) গণ ঐক্যজোট ঃ

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোঃ) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে তিনটি দলের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। স্বাধীনতা লাভের পর ন্যাপ (মোঃ) ও কমিউনিস্ট পার্টি কিছু কিছু বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও রাষ্ট্রীয় নীতির মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। চীনাপন্থী কমিউনিস্ট দল উপদলগুরোর সমালোচনা, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভব ও দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন, রুশ-ভারত বিরোধী প্রচারণা প্রভৃতি মোকাবিলা, অরাজকতা সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং দেশ থেকে মুনাফাখোরী, মজুদদারি, কালোবাজারি, দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রোধ করার জন্য এ দল তিনটি একযোগে কাজ করে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করে। এ পটভূমিতেই ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোঃ) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিংহ) ত্রিদলীয় গণঐক্যজোট গঠন করে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন (জাগমুই) ঃ

স্বাধীনতা লাভের পর চীনাপন্থী বামপন্থীগুলো মুজিব সরকার বিরোধী এবং রুশ ভারত বিরোধী বক্তব্যকে সামনে রেখে একটি অভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ৩ ডিসেম্বর ঢাকায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করে। এ সম্মেলনেই জন্মগ্রহণ করে 'জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন' বা 'জাগমুই' নামক একটি নতুন বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন। প্রধান বামপন্থী নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ এবং শ্রমিক নেতা- সিরাজুল হোসেন খান যথাক্রমে 'জাগমুই' এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। 'জাগমুই' এর অধিকাংশ নেতা কর্মী ছিলেন ন্যাপ (ভাসানী) এর নেতা কর্মী।

(ঙ) ইউনাইটেড পিপলস পার্টি ঃ

'জাগমুই' নেতৃত্ব সকল বামপন্থী দল-উপদলকে একত্রিত করতে পারেনি। তাদের নেতৃত্ব ও কার্যক্রমে সকল বামপন্থী দল-উপদলগুলো একীভূত হওয়ার প্রয়াস চালায়। এ প্রচেষ্টার ফলেই ন্যাপ (সুধারামী), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী) এবং ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের (মোঃ) একটি ক্ষুদ্র অংশ ১৯৭৪ সালের ১৭ নভেম্বর 'ইউনাইটেড পিপলস পার্টি' (ইউ.পি.পি) নামে একটি নতুন বামপন্থী রাজনৈতিক দল গঠন করে। এ দলের মূল নেতা ছিলেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা কাজী জাফর আহমদ। রুশ-ভারত বিরোধিতা ও বঙ্গবন্ধু মুজিব সরকারের বিরোধিতাই ছিল ইউ.পি.পি'র অন্যতম মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য।

(২) জিয়াউর রহমানের আমলে বিরোধী দলীয় রাজনীতি ঃ

বাংলাদেশের একটি বিশেষ সংকটের সময় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের কর্ণধার হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন দেশের সংবিধান স্থগিত ছিল। জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ ছিল না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত সংস্থা ছিল খুবই দুর্বল এবং সৈন্যবাহিনী ছিল বহুধাবিভক্ত। বেসামরিক প্রশাসকগণ ছিলেন অসন্তুষ্ট আর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল হতাশা ও নেতৃত্বের যুদ্ধ। এমতাবস্থায় তিনি দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে বিরাজমান অসন্তোষ দূর করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দেন। একই সাথে তিনি তাঁর ক্ষমতা বৈধকরণের বিভিন্ন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমানের পাঁচ বছর শাসনামলে তিন বছর দশ মাস একুশ দিন সামরিক আইন (১৫.০৮.১৯৭৫ হতে ০৬.০৪.১৯৭৯) প্রবর্তিত ছিল। এ সময়ে ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দলবিধি প্রণয়ন করে রাজনৈতিক দল রেজিষ্ট্রীকরণের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে ঘরোয়া রাজনীতি পরিচালনার সুযোগ দেয়া হয়। সরকার তখনো এমন কোন গণবিরোধী নীতি গ্রহণ করেনি যার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে রাজনীতির চর্চা জমজমাট হয়ে উঠেনি। উপরন্তু তখনকার রাজনৈতিক দলগুলোর গণসমর্থন ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ইতোমধ্যে ১৯৭৭ ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতির গণভোট অনুষ্ঠান, ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইন বিধিবদ্ধকরণ এবং সর্বোপরি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতা ও কার্যাবলীর রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বৈধতা ও নিরাপত্তা লাভ করেন। এ সময়ের মধ্যে জিয়া সরকারের গৃহীত কার্যাবলিতে গণবিরোধী কিছু না থাকায় বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে সরকার সম্পর্কে কোন নেতিবাচক মনোভাব দেখা যায়নি।

১৯৮০ সালের শুরুতেই জাতীয় সংসদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ সংসদের সার্বভৌমত্ব এবং সংসদ সদস্যদের অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে কতিপয় অভিযোগসহ ২৪ দফা দাবি উত্থাপন করেন। তাদের মতে, বর্তমান ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে জাতীয় সংসদকে এক ব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন রাখা হয়েছে। সংসদকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন আদেশ, অধ্যাদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। সংসদ অধিবেশনে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের কথা বলার পর্যাপ্ত সুযোগ না দেয়া, শুধুমাত্র নিজদলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গণবিরোধী আইন পাস করা হচ্ছে। এ অবস্থায় সংসদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ (৭৭+১৭ জন) এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে কতিপয় দাবি উত্থাপন করে এবং তাদের দাবির সমর্থনে ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হতে সংসদের অধিবেশন বর্জনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। তারা তাদের দাবিনামা নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথেও দেখা করেন। কিন্তু তাদের ঐক্যে ফাটল ধরার কারণে এ বিরোধীদলীয় আন্দোলনে কোন ফল হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে সরকার জাতীয় সংসদে উপদ্রুত এলাকা বিল উথাপন করেন। এ বিলে সরকারকে দেশের কোন অংশকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করে সেখানে কার্যরত বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর লোকদের নিয়োগ করার ক্ষমতা চাওয়া হয়। এ ধরনের এলাকায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোন অফিসার বা পুলিশের কমপক্ষে সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার অন্যান্য ক্ষতার মধ্যে গণশৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেআইনী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে গুলী করার ক্ষমতা লাভ করেন। বে-আইনী কার্যকলাপ বলতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখন্ডতা, নিরাপত্তা কিংবা গণশৃঙ্খলা প্রতি ক্ষতিকারক কার্যকলাপকে বুঝানো হয়েছে। উপদ্রুত এলাকায় বেআইনী কাজের জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান করা হয় এবং অপরাধের বিচারের জন্য প্রয়োজনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বিলটির পক্ষে সংসদে বলা হয় যে, অস্বাভাবিক আইনের দ্বারা সফলতার সাথে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যই এ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

উপরোক্ত বিলটি সংসদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তারা বিলটিকে মৌলিক মানবাধিকার বিরোধী বলে অভিহিত করেন এবং এটি পেশ করার প্রতিবাদে সংসদ অধিবেশন হতে ওয়াক আউট করেন। সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা বিলটিকে সামরিক আইনের চেয়েও জঘন্য বলে মন্তব্য করেন। সংসদের সমস্ত বিরোধীদলীয় সদস্যগন বিলটিকে জঘণ্য ও পীড়নমূলক বলে অভিহিত করে এবং তা বাতিলের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান। সংসদে যাতে এ বিল পাস না হয় সে জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতি আবেদন জানান। এ ভাবে উপদ্রুত এলাকা বিলটির বিরোধিতায় সমগ্র দেশটির বিরোধিতায় সমগ্র দেশব্যাপী প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন মাথাচারা দিয়ে উঠতে থাকলে সরকার বিলটিকে সংসদের একটি স্থায়ী কমিটির পর্যালোচনার জন্য প্রেরন করেন। তবে এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে সরকারের তরফ হতে আর কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি বলে বিলটি এখানে শেষ হয়ে যায়।

সুতরাং জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশে বিরোধী দলীয় রাজনীতি তেমন সাড়া জাগানো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমান ময়দানে রাজনীতির পরিবর্তে জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। নিজে সব ধরনের দুর্নীতি, দলাদলি ও অপকর্মেল উর্ধ্বে থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য সুনিশ্চিত করাই ছিল তার ঐকান্তিক আশা।

(৩) এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলীয় রাজনীতি ঃ

Following Zia, Ershad did the same job. Like many other dictators in the world he did not allow anybody who could succeed him. He held the office of the president while his wife was the first lady. He was the chairman of Jatiyo Party, head of the state and government and chief of the armed forces the bastion of power".[23]

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে এরশাদ সরকারের আমলে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন অর্থাৎ তৎকালে বাংলাদেশে বিরোধীদলীয় রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বস্তুত এরশাদের দীর্ঘ নয় বছরের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর একক এবং জোটবদ্ধ সংগ্রামের ফলেই গণতন্ত্র উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। ১৯৮২ সালের ২৩শে মার্চ ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন যে, "আমার চরম ও পরম লক্ষ্য হলো দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যথাশীঘ্র সম্ভব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।" ঐ বছরের শেষার্ধেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও যোগাযোগ শুরু হয়। তারা নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করতে থাকে। এদিকে ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সামরিক আইন লঙ্ঘন করে আন্দোলন হলে সরকার এ বিক্ষোভ কঠোর হস্তে দমন করে। অনেককে গ্রেফতার করা হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এসবের ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দুটি বিরোধী রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়। একটি জোট গঠিত হয় ১৫টি দলকে নিয়ে এবং আরেকটি জোট গঠিত হয় ৭টি দলকে নিয়ে। ১৫ দলের নেতৃত্ব দেয় আওয়ামী লীগ আর ৭ দলীয় জোটের নেতৃত্ব দেয় বিএনপি।

---

[23] Parliamentary Democracy in Bangladesh, from Crisis to Crisis- Zaglul Haider, J. Asiat Soc Bangladesh, Hum, Vol. 42, No. 1, June, 1997.

Dhaka University Institutional Repository

দুই জোট সাধারণভাবে ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এ ৫ দফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো ছিল একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে জাতীয় সংসদের নির্বাচন, সামরিক আইনের অবসান ইত্যাদি। এ দুই জোটের সাথে যোগ দেয় আরও কিছু দল যেমনঃ জামায়াতে ইসলাম। দুটি জোট আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। আন্দোলনের চাপে এরশাদ সরকার ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়া এবং নভেম্বর মাস থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে। নভেম্বর মাসে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হলে বিরোধী দলও জোট সমূহ ১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি নেয়। ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের অবস্থানকে কেন্দ্র করে দেশ চরম সংকটের মুখোমুখি হয়। তখন সরকার রাজনৈতিক তৎপরতা আবার নিষিদ্ধ করে দেয়। এ পর্যায়ে ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ১৫ ও ৭ দল এ সরকারি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে এবং সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দাবি করে। বিরোধী জোটের আন্দোলনের ফলে সরকার উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। এরপর সরকার পরিকল্পনা নেয় যে, রাষ্ট্রপতি ও সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৭ মে। বিরোধী জোট দু'টি সরকারের এ পরিকল্পনা ও প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তারা জাতীয় সংসদের নির্বাচন দাবি করে। এ বিরোধের মুখে সরকার ঘোষণা করে যে বিরোধী দলের দাবি অনুসারে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর। কিন্তু বিরোধী জোটগুলো সরকারের নির্বাচনের এ পরিকল্পনা ও বাতিল করে দেয়।

জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দেন এবং ঐসময় বিরোধী জোটের কিছু শর্ত মেনে নেন এবং ৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু এবারও বিরোধী জোটসমূহ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে রাজী হলো না। শুরু করল জোর আন্দোলন। ফলে জেনারেল এরশাদ ১ মার্চ সামরিক আইনের বিধিসমূহ কড়াকড়িভাবে পুনঃআরোপ করেন। ইত্যবৎসরে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট এবং ১৬ ও ২০ মে উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। এরশাদ তাঁর নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং জাতীয় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার গণরায় লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর মে মাসে দেশে প্রথমবারের মত উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যেই ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয় এবং ১লা জানুয়ারী থেকে অবাধ রাজনীতি চালু হয়। দশমাস পরে আবার অবাধ রাজনীতি চালু হবার সাথে সাথেই রাজনীতির আসর গরম হয়ে উঠে এবং অন্যসব কিছুকে ছাপিয়ে নির্বাচনই প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। সামরিক আইনের অবসান ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে দুই বিরোধী জোট ও জামায়াতে ইসলাম আন্দোলন তীব্রতর করার উদ্যোগ নেয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সভা, মিছিল, হরতাল ও সমাবেশের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির পথ বেছে নেয়।

এ প্রেক্ষাপটেই সরকার ঘোষণা করেন যে, ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এবারও পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয় যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা না দিলে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। এরশাদ ঘোষণা করলেন যে যদি বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তবে তিনটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এগুলো হলোঃ মন্ত্রিসভার কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর বিলুপ্ত করা হবে এবং সামরিক আদালতসমূহ তুলে নেয়া হবে। কিন্তু ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলাম রাষ্ট্রপতির ভাষণকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রস্তাবিত নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। তারা ২৬ এপ্রিলের সংসদ নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার ও সংকল্প প্রকাশ করে। ৮ মার্চ দেশে অর্ধদিবস হরতাল পারিত হয় এবং জোট মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ ২২ মার্চ সারা দেশব্যাপী হরতাল আহবান করে।

কিন্তু ১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ জেনারেল এরশাদ হঠাৎ করে জাতির সামনে এক বেতার ভাষণে বলেন যে, বিরোধী দলগুলো রাতারাতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত না নিলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুবিধার জন্য ২৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ মে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বিরোধী দলের কয়েকটি শর্তও মেনে নেয়ার কথা বলেন। এ ভাষণের পরপরই ঐ রাতেই ১৫ দলীয় জোট নেতা হাসিনা ঘোষণা করেন যে, তারা এরশাদের নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ৭ দলীয় জোট নেতা

Dhaka University Institutional Repository

খালেদা জিয়া কোন সরাসরি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। ১৫ দলীয় জোটের এ সিদ্ধান্তের ফলে রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক শুরু হয়। ১৫ দলীয় জোট থেকে নির্বাচনে ৮ দলীয় জোট অংশ নেয়। বৃহৎ দল আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য দলগুলো হলো ন্যাপ, জাসদ (সিরাজ), ন্যাপ (মোঃ), সিপিবি। ওয়ার্কস পার্টি (নজরুল), সাম্যবাদী দল (তোয়াহা) এবং গণ আজাদী লীগ এবং যারা বিপক্ষে ছিল তারা হলো জাসদ (ইনু), ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন) প্রভৃতি। তাছাড়া আরও যে সকল দল নির্বাচনের বিপক্ষে আন্দোলন করেছিল তারা হলো শাহ আজিজ বিএনপি; খন্দকার মোস্তাকের জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, অলি আহাদের নেতৃত্বে ৬ দলীয় জোট এবং অন্যান্য কয়েকটি ছোট দল।

নির্বাচনের পর জুলাই মাসে জেনারেল এরশাদ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করেন। কিন্তু ঐ অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেনি। অধিবেশন সমাপ্তির পর প্রস্তুতি চলতে থাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের। জেনারেল এরশাদ চীফ অব স্টাফ এর পদ থেকে পদত্যাগ করলে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে ১৫ অক্টোবর। প্রধান বিরোধী জোটসমূহ এ নির্বাচনেও অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তথাপিও নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ বিপুল ভোটে জয়ী হন। এরপর জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ৭ম সংশোধনী পাসের মাধ্যমে ১১ নভেম্বর সামরিক আইন তুলে নেয়া হয়। কিন্তু সামরিক শাসনের অবসান ঘটলেও বিরোধী দল ও জোটগুলো এতে সন্তুষ্ট হয়নি, কারণ তাদের প্রকৃত কোন দাবিই পুরণ হয়নি। সংসদের ৩য় অধিবেশন ডাকা হয় ২৪ জানুয়ারি, ১৯৮৭। ঠিক এর এক সপ্তাহ আগে ৭ দল ও ৫ দলের লিয়াজোঁ কমিটি ১৫ দফা দাবি ঘোষণা করে যার মধ্যে অন্যতম ছিল সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন। কর্মসূচি ঘোষণা করে। সংসদের বাইরে ঐ দুই জোট দাবি দিবস পালন করে আর সংসদের ভিতরে ৮ দলীয় আওয়ামী জোট সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণ শুরু হবার সাথে সাথে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। কিন্তু এ ধরনের মিল থাকা সত্ত্বেও বিরোধী জোটগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে পারছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭ সালের ২৯ মার্চেল ৩১ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি বিরোধী জোটের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। ১৯৮৭ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৮৭ সালের ১৭ জুন ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের লিয়াজোঁ কমিটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তথা এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে অনেকটা অভিন্ন মত পোষণ করেন। ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের ডাকে ২১ ও ৩০ অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ১৯৮৭ সালের ১২ জুলাই এরশাদ সরকার 'জেলা পরিষদ বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত করলে এবং মাত্র ৪ মিনিটে তা পাস হয়ে গেলে জাতীয় সংসদের বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, সিবিবি ন্যাপ, জাসদ (সিরাজ) এবং ওয়াকার্স পার্টির জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন। জামায়াতে ইসলাম ও জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। জেলা পরিষদ বিলের বিরুদ্ধে ১৩ জুলাই ৭ দল, ৫ দল ও জামায়াতে ইসলাম ঢাকা শহরে হরতাল পালন করে।

১৯৮৭ সালের ১৮ জুলাই ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে এক দফা দাবিতে অর্থাৎ এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে সকল জোট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়। তিনি জোটের থাকে ২২ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত ৫৪ ঘণ্টা হরতাল পালিত হয়। এ হরতাল পালনের সময় কয়েকজন নিহত ও আহত হলে ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ৩০ জুলাই রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী ঘোষণা করে। এ ঘেরাও কর্মসূচী পালনকালে ৫জন পুলিশসহ প্রায় ৩০ ব্যক্তি আহত হয়। সমগ্র দেশের জনগণ সরকারের কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ হয়। জনগণের এ ক্রমবর্ধমান রুদ্ররোষের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১ আগস্ট জেলা পরিষদ বিল। পুনর্বিবেচনার জন্য জাতীয় সংসদে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন। ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় জোট ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ। কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস ধরে তিন জোটের সংগ্রামী তৎপরতা অব্যাহত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া এক বৈঠকে বসে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন সফল করে তোলা এবং আসন্ন ১০ নভেম্বরে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। এর ফলে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এ অবরোধ কর্মসূচী ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য ৮ নভেম্বর এরশাদ সরকার ঢাকা শহরে ৭ দিনের জন্য ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। "The Al. and the BNP could not meet on the same platform. They fought separately for a common target the ousting general election and election under the caretaker government" ৯ নভেম্বর শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া আবারও বৈঠকে বসেন এবং এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার কথা ঘোষণা করেন। এরশাদ সরকার রাজধানীমুখী সকল ট্রেন, বাস, লঞ্চ, নৌকা ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলো বন্ধ করে দেন। কিন্তু জনগণ সরকারের শত বিরোধিতা ও বাঁধাকে অস্বীকার করে পায়ে হেঁটেই ঢাকা শহরে আসতে শুরু করেন। ১০ নভেম্বর সমগ্র ঢাকা শহর বিশেষ করে জিরো পয়েন্ট থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা একদিকে জাতীয় পার্টির সমর্থক ও পুলিশ বাহিনী, অপরদিকে জনগণের মধ্যে রণক্ষেত্রে পরিনত হয়। বহু পুলিশ ও জনতা হতাহত হয়। এরশাদ সরকার ১২ নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে অন্তরীন করেন। এর ফলে প্রায় সমগ্র নভেম্বর মাস ধরেই এরশাদ সরকার বিরোধী হরতাল ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষ প্রশমনের জন্য ২৭ নভেম্বর রাতে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

৩১ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিরোধী দলগুলোকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার জন্য আহবান জানান। কিন্তু বিরোধী তিন জোট এরশাদ সরকারের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আলোচনা বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা অস্বীকার করে। ৩ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী দলের সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগের ঘোষণা প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৮ ডিসেম্বর রাতে সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং ১০ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি প্রদান করেন। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। এরশাদ সরকার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী এ নির্বাচনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সভা সমাবেশ আয়োজন করতে থাকে। ২৪ জানুয়ারী চট্টগ্রামের এরূপ একটি সমাবেশে শেখ হাসিনা বক্তব্য প্রদান করতে উপস্থিত হলে জাতীয় পার্টির কর্মীগণ ও সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী জনতার উপর গুলি চালায়। ফলে বহু লোক নিহত ও আহত হয়। এ নারকীয় হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসী প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে।

১৯৮৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্থানে যে মারাত্মক সংঘর্ষ হয় তাতে বহু ব্যক্তি হতাহত হয় ও প্রাণ হারায়। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ এরশাদ সরকার জাতীয় সংসদ ও পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। জনগণ এসব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। বিরোধী জোট ও দলসমূহও এ নির্বাচন বর্জন করে। তবে এ নির্বাচনে আ,স,ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে 'একাত্তর দলীয় সম্মিলিত জোট' (কপ) ফ্রীডম পার্টি, ২৭ দলীয় ইসলামী জোট, ২৩ দলীয় জোট, জাসদ (সিরাজ), জনদল, বাংলাদেশ খিলাফত আন্দোলন প্রভৃতি দল অংশগ্রহণ করেন। এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রহসনমূলক। প্রায় সকল জনগণই এ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে রাজধানীতে ৭ জন নিহত ও প্রায় তিন শতাধিক লোক আহত হয়। ১৯৮৮ সালের ১১ মে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে সংবিধানের 'অষ্টম সংশোধনী বিল' উত্থাপিত হয়। 'ইসলামকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণার পাশাপাশি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের একটি করে স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিরোধী জোট ও দলগুলো অষ্টম সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে।

নবম সংশোধনী উত্তর বাংলাদেশের রাজধানীতে পূর্বের ন্যায় সরকারি ও বিরোধী শিবিরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ছাপ পাওয়া যায়। ৫ দলীয় ঐক্যজোট স্বৈরাচার উচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, কৃষক ক্ষেতমজুর, তাঁতীসহ গ্রামীণ মানুষের সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৯৮৯ সালের ২৯ জুলাই উপজেলায় অবস্থান ও বিক্ষোভ এবং ২১ আগস্ট দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল আহবান করে। কিন্তু ইতোমধ্যে ২ সেপ্টেম্বর সংবিধানের পূর্ববর্তী ৮ম সংশোধনী আংশিকভাবে বাতিল ঘোষিত হলে রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং বিরোধী দলগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রতিক অবস্থার ফলেই মূলতঃ এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ১৯৮৯ সালের ১১ নভেম্বর বিশাল জনসমাবেশ থেকে বিএনপি ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি দিয়ে এর পূর্বেই সরকারের পদত্যাগের দাবি জানান। ৭ দলীয় জোটের কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মুসলিম লীগ, জাগপা এবং ৬ দলীয় জোট। এর পাশাপাশি ২৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগ সকাল সন্ধ্যা হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

এদিকে বিএনপির ১৯৮৯ সালের ২৮ নভেম্বরের কর্মসূচিতে সরকারি বাঁধা দানের ফলে সকল বিরোধী দলের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিবাদে ৭ দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমাবেশ থেকেই ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ৩৬ ঘণ্টার হরতাল আহবান করেন। সে সাথে জামায়াতে ইসলামী, ৫ দল, ৬ দল, মুসলিম লীগসহ অন্যান্য জোট ও দলসমূহ হরতাল পালনের আহবান জানায়। ঢাকা মহানগর ফ্রীডম পার্টি ও ২৯ ও ৩০ নভেম্বর হরতালের ডাক দেয়। এভাবে প্রায় সকল বিরোধী দলই হরতাল আহবান করায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হঠাৎ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ২৯ ও ৩০ নভেম্বরের দেশব্যাপী হরতাল সম্পূর্ণরূপে সফল হয়। সরকারের বিভিন্নমুখী হরতাল বিরোধী প্রচারণা সফল হয়নি; তবে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বিরোধী দল ও জোট সমূহের অবস্থান ধর্মঘট ও হরতালকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে তার আঁচে সরকার বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সবকিছুই নির্ভর করে বিরোধী দল ও জোটগুলোর আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ ও সুনির্দিষ্টভাবে সরকার পতনের দিকে পরিচালিত করার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার উপর।

অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘ নয় বছর এরশাদ দেশে কতৃত্ববাদী নীতি অনুসারে দেশ শাসন করেন। অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল এবং নিজের ও নিজ দলের স্বার্থে স্বৈরতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা চর্চা করার কারণে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের মধ্যে এরশাদ বিরোধী মনোভাব জন্ম লাভ করে। ১৯৮৭-৮৯ সালে সমগ্র দেশব্যাপী সরকার বিরোধী আন্দোলন ক্রমে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ৮ দলীয়, ৭ দলীয় এবং ৫ দলীয় জোট এ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তোলে তা বাংলার রাজনীতিতে এক তাৎপর্যময় ঘটনা। ১৯৯০ সালের শুরুতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করে। ৫ দল, ৬ দল ও অন্যান্য কয়েকটি জোট একই রূপ কর্মসূচি ঘোষণা করে। অন্যদিকে ৮ দলীয় জোট ৭ দফা দাবি আদায়ের প্রস্তাব ঘোষণা করে। ৭ দলীয় জোট ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস ঘোষণা করেন।

সামনে আসে উপজেলা নির্বাচন, ডাকসু নির্বাচন। উপজেলা ও ডাকসু নির্বাচন বিরোধী আন্দোলন বিনির্মাণে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ঐ সম্ভাবনা পরিস্কার হয়ে উঠে এরশাদ সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট বিরোধী আন্দোলনে। সরকার ১৪ জুন যে নতুন বাজেট পাস করে তার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ জনপ্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে বিরোধী জোটগুলো এ প্রথমবারের মত একটি ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিরোধী ৩টি জোট বাজেট বাতিল, সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২৮ জুন দেশব্যাপী জোটগুলো ২৯ জুলাই ও ২৬ আগস্ট গণবিক্ষোভ দিবসের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

১৯ নভেম্বর তিন জোটের বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখার ঘোষণা সরকার বিরোধী আন্দোলনকে নতুন রূপ দান করে।

"On November 1990, the three alliances issued a joint statement, the declaration stated that Ershad would be forced to appoint (under article 51 of the constitution) a new vice president acceptable to the three aliances and that Ershad himself must resign and hand over power to the vice president could not act as the acting president. The acting president would then from a neutral government to hold free and fair election".

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘোষণা সাধারণ জনগণের মধ্যে বিরাট আশাবাদ সঞ্চার করে। বিরোধী দলগুলো ও ১৯৯০ সালের ২০ নভেম্বর সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালন করে। ২৫ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর ছাত্র ঐক্য আন্দোলন চরম আকার ধারন করে। ২৭ নভেম্বর বিএম এর যুগ্ম মহাসচিব

Dhaka University Institutional Repository

ডাঃ সামসুল আলম মিলনের মৃত্যুর পর দেশের সমস্ত চিকিৎসকরা অবিরাম ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ রাতেই এরশাদ সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ২৯ নভেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ৩০ নভেম্বর ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট আন্দোলনের যৌথ নির্দেশনাবলী ঘোষণা করে। ১ লা ডিসেম্বর হরতাল পালিত হয়। সাংবাদিক ইউনিয়ন, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সকলেই কর্মবিরতি ঘোষণা দেন তথা পদত্যাগ করেন। এভাবে সকল পেশার, সকল শ্রেণীর মানুষ এরশাদের পদত্যাগের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে।

গণঅভ্যুত্থানের চাপে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠে। ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা অনুসারে বিরোধী দলগুলো সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দান করে। ৬ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন। ১২ ডিসেম্বর এরশাদ ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করে গুলশানের একটি গৃহে অন্তরীণ করে। ১৭ ডিসেম্বর এরশাদের দূর্নীতি তদন্তে একটি কমিশন গঠন করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ২ মার্চে (পরে তা সংশোধিত করে ২৭ ফেব্রুয়ারি করা হয়) সংসদ নির্বাচনের তারিখে ঘোষণা করেন। ঐ সময় থেকেই বিরোধী দলগুলো নির্বাচন কেন্দ্রিক জোর তৎপরতা শুরু করে। এটা অনেকটা বিপ্লবতুল্য। অনেকের মতে ১৯৭১ সালে প্রথম বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর এটা ছিল দ্বিতীয় বিপ্লব — ৭০ এর শেষ পর্যায়ে ইরানে এবং ৮০ দশকের মাঝামাঝি ফিলিপাইনের পর বিশ্বের খুব কম দেশেই এমন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ঘটনা ঘটেছে।[২৪]

Ershad Thus had no alternative but to hand over power to the chief justice of the Supreme court, Justice Sahabuddin Ahmed (a consensus candidate of all political parties) on December 6, 1990, Justice Ahmed was given a mandat by all opposition parties to hold free and fair elections of the Jatiyo Sangsad, within 3 months of his assuming office. Thus the civil society prevailed over the armed sector of the state".[25]

---

24 অধ্যাপক এ,কে,এম শহিদুল্লাহ, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন, ১৯৯১ সম্পাদনা : অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিপ্গক চিন্তাভাবনা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

25 Talukder Moniruzzaman, Politics and Society of Bangladesh, UPL 1994, P-143.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বিএনপি-র সরকার গঠন ও এর কার্যকারিতা

৩.১ সংসদ নির্বাচন ও বিএনপির সরকার গঠন

এরশাদ সরকারের পতনের ক্রান্তিলগ্নে প্রধান রাজনৈতিক জোটগুলোর সম্মিলিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৯০ দিনের মধ্যে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অঙ্গীকার করেন। অবশেষে সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি সুপ্রীম কোর্টের তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। নির্বাচন সংক্রান্ত সকল দায়-দায়িত্ব ঐ নির্বাচন কমিশনারের উপর ন্যস্ত করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত ঘোষনানুযায়ী ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মডেল হিসাবে দেশের ভিতরে ও বাইরে প্রশংসা অর্জন করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন অনেক। নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৭৭৪ জন। ভোটদাতার সংখ্যা ছিল সাড়ে ছয় কোটির উপর, তবে ভোটদান করে ৩,৩০,৮৮,৫৬০ জন। জাতীয় সংসদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ৩০০টি আসনের (মহিলা সদস্যসহ জাতীয় সংসদের মোট আসন ৩৩০টি) এর মধ্যে ২৯৮টি আসনে (প্রার্থী মৃত্যুর কারণে ২টি আসনে নির্বাচন স্থগিত থাকে) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্ধারিত তারিখে। এ নির্বাচনে ৫২.৩৭ ভাগ ভোটদাতা ভোট দান করেন। দলগতভাবে জাতীয়তাবাদী দল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩১.৪৪ ভাগ এবং আওয়ামীলীগ শতকরা ৩১.১৩ ভাগ ভোট লাভ করে। একাধিক আসনে জয়ী প্রার্থীদের পরিত্যক্ত এবং মৃত্যুর কারণে শূন্য হওয়া ১১টি আসনে উপনির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয় ১১ সেপ্টেম্বর তারিখ। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৬৯টি আসন লাভ করে সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করে। আওয়ামীলীগ ৮৮টি আসন লাভ করে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের ৯ মার্চ সংসদের ৪টি আসনের স্থগিত কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩টিতে এবং বিএনপি ১টিতে জয় লাভ করে। ১১ মার্চ, ১৯৯১ জামায়াতের এক প্রতিনিধি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে বিএনপিকে সমর্থন দানের কথা ব্যক্ত করেন। ১৯৯১ এর ১৪ মার্চ মুন্সিগঞ্জে ৩ আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী বিজয়ী হন। নিচের সারণীর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বিভিন্নদলের প্রাপ্ত আসন দেখানো হলো ঃ

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে ফলাফল

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৪১	২৮	১৬৯
আওয়ামী লীগ	৮৮	—	৮৮
জাতীয় পার্টি	৩৫	—	৩৫
জামায়াতে ইসলাম	১৮	২	২০
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৫	—	৫
বাকশাল	৪	—	৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	১	—	১
গণতন্ত্রী পার্টি	১	—	১
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	১	—	১
ইসলামী ঐক্যজোট	১	—	১
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাঃ)	১	—	১
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এনডিপি)	১	—	১
স্বতন্ত্র	৩	—	৩
সর্বমোট	৩০০	৩০	৩৩০

পরবর্তীতে 'বাকশাল' নামক দলটি আওয়ামী লীগ যোগদান করায় আওয়ামী লীগের সদস্য হয় ৯২ জন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সাধারন সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিজয়ী হয়। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। আর সে কারণেই এর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বি আওয়ামী লীগ বিএনপির সরকার গঠনের দাবিকে অস্বীকার করে। আওয়ামী লীগ দাবি জানায় যে, বিএনপি'র সংসদীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরই কেবল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সার্বভৌম সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন। এদিকে বিএনপি সংসদীয় সরকারের প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেই সরকার গঠনের উদ্যোগ নিতে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, লাভ না করায় বিএনপির সরকার গঠনের কোন অধিকার নেই। বিএনপি সরকার গঠন করলে আওয়ামী লীগ আন্দোলন করবে বলে হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯ মার্চ ব্যাপক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকল রাজনেতিক দলগুলো জরুরী ভিত্তিতে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে সম্মত হন। ঐদিনই রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ঘোষণা দেন। তিনি বিএনপি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে ১১ জনকে মন্ত্রী ও ২১ জনকে প্রতিমন্ত্রি নিয়োগ করে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ২০ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের নবম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। মন্ত্রী পরিষদ গঠনের বৈঠকে বিরোধী দলের কোন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন না।

৩.২ অধিবেশন সমূহের আলোচনা

৫ম জাতীয় সংসদে ৫ বছরের কার্যকালে ২২ টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। একটি বাস্তাব অগ্রসরমান সংসদীয় গণতন্ত্র যেখানে সরকারী ও বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে সেখানে এই কার্যক্রম বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্ভিসন্দভের এই। অধ্যায়ের অংশে এই বিষয়ে বস্তনিষ্ট আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমেই সংসদে অধিবেশন সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করা হলো। বিএনপি সরকারের ৫ বছরের শাসন আমলে সংসদের ২২ টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর সার্বিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে সংসদের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা তথা সরকারী দল ও বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক আচরণের দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে অধিবেশন গুলি দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম সংসদ (১৯৯১-৯৬)

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট কার্যদিবস
প্রথম	৫-৪-৯১	১৫-৫-৯১	৪১	২২
দ্বিতীয়	১১-৬-৯১	১৪-৮-৯১	৬৫	৪৩
তৃতীয়	১২-১০-৯১	৫-১১-৯১	২৫	১৪
চতুর্থ	৪-১-৯২	১৮-২-৯২	৪৬	২৭
পঞ্চম	১২-৪-৯২	১৯-৪-৯৩	৮	৬
ষষ্ঠ	১২-৬-৯২	২০-৭-৯২	২০	৫১৭
সপ্তম	১০-৮-৯২	২৮-৮-৯২	১৯	১০
অষ্টম	২০-৯-৯২	২৬-১১-৯২	৩৭	২৮
নবম	২৫-১-৯৩	৪-৩-৯৩	৪০	২০
দশম	৫-৬-৯৩	২২-৬-৯৩	১৮	১৪
এগার	২৭-৯-৯৩	১৫-৩-৯৩	১৮	১৬
বারো	২-১০-৯৩	১৯-১০-৯৩	২১	১৯
তেরো	৮-১-৯৪	৩-২-৯৪	২৭	১৮
চৌদ্দ	৪-৫-৯৪	৩০-৫-৯৪	২৬	১৯
পনের	৬-৪-৯৪	১১-৭-৯৪	৩৫	২৭
ষোল	৩০-৮-৯৪	১৩-৯-৯৪	৪২	২২
সতেরো	৮-১১-৯৪	৩০-১১-৯৪	২২	১৮
আঠারো	২৩-১-৯৫	২৮-২-৯৫	২৬	১৬
উনিশ	২০-৩-৯৫	২৭-৪-৯৫	৩৮	২০
বিশ	২৭-৬-৯৫	২৮-৭-৯৫	৩১	১৭
একুশ	৬-৯-৯৪	২-১০-৯৫	২৬	২৪
বাইশ	১৪-১১-৯৫	২৪-১১-৯৫	১১	৮
			মোট কার্যদিবস	৩৯৬

সূত্র ঃ জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারী শব্দ কোষ, প্রকাশক গোলাম মঈন উদ্দিন, পাঠ্য পুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধিবেশন ঃ

১ম অধিবেশনে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার নিবার্চন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় (৫ই এপ্রিল)। আবদুর রহমান বিশ্বাসকে স্পীকার এবং শেখ রাজ্জাক আলীকে ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করা হয়। এরা দু'জনই বিএনপি এর দলীয় সদস্য ছিল। বিরোধী দলের বিরোধীতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাদের নির্বাচিত করা হয়। বৃটেনে দেখা গেছে যে, উক্ত পদ দু'টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্বীয় দলের লোককে নির্বাচনের সুযোগ থাকলেও সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সকল দলের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয়। একদল সংশোধনীর মাধ্যমে আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি হয়ে যাবার পর শেখ রাজ্জাক আলী স্পীকার ও হুমায়ুন খান পন্নী ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। আব্দুর রহমান বিশ্বাস এর এই স্পকিার ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া দু'টিই স্পীকার নির্বাচিত হন। আব্দুর রহমান বিশ্বাস এর এই স্পীকার ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া দু'টিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংসদীয় রীতি বিরোধী। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন বরিশাল শাখার শান্তি কমিটির সহ-সভাপতি, একজন রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তি কখনই সংসদ বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিতে পারে না। অপরদিকে হুমায়ুন খান পন্নীও স্বাধীন দেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন '৭৭ সাল পর্যন্ত। কাজেই ৫ম জাতীয় সংসদের সূচনা হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্বের প্রকৃত দায়কে ভুলুণ্ঠিত করে। ১৯শে নভেম্বরের ঘোষণাকে বিস্মৃত করে, নির্বাচনী ঘোষণাকে পায়ে দলে এবং সর্বোপরি সংসদীয় গণতন্ত্রের সত্যিকার স্পিরিটকে বানচাল করে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উল্লেখিত ভ্রান্তি, সংসদীয় রীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের ধরণ ভবিষ্যতে দেশে সংসদীয় সংস্কৃতির বিকাশকে নেতিবাচক অর্থেই প্রভাবিত করবে বলে মনে হয়।[২৬]

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ

দ্বিতীয় অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে (৬ই আগস্ট) সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল দু'টি অনুমোদিত হয়। একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের পূর্ব পদে প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন হয় এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর কার্যকলাপ

---

26 হাসানুজ্জামান, নবপ্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

বৈধতা পায়। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর রাষ্ট্র পুনরায় সংসদীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। যে সমঝোতা ও ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এই বিল দু'টি পাশ হয়েছিল তা ছিল সংসদীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত। কিন্তু এ ধারা পরবর্তীতে আর টিকে থাকেনি।

তৃতীয় অধিবেশন ঃ

তৃতীয় অধিবেশনই (১২ই অক্টোবর '৯১) হলো সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের পর প্রথম অধিবেশন। ২৫ দিন ব্যাপী এই অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ১৪ দিন। এতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, ৩৪টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় কিন্তু কোরামের অভাবে সেগুলির মূলতবী ঘোষণা করা হয়। এই অধিবেশনে সদস্যদের অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান মাত্র ১ দিন এবং প্রধানমন্ত্রী মাত্র ৩ দিন উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শেষ দিন জামায়াতের সংসদীয় নেতা মতিউর রহমান নিজামী এই বিষয়টি জোড়ালোভাবে উত্থাপন করে বলেন যে সংসদ কার্যকারিতার বহুলাংশে নির্ভর করে সংসদ নেতা বা নেত্রীর উপস্থিতির উপর। সরকারী দলের উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী এই মতের সাথে একাত্ম না হয়ে বরং সংসদ সঠিকভাবে কার্য পরিচালনা করছে বলে দাবী করে। স্পীকারও এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে পক্ষপাতিত্ব করেন। অথচ সংসদীয় রীতি অনুযায়ী উচিৎ ছিল সকল সদস্যই ভুল বা অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া, যেটি এই সংসদে দেখা যায়নি।

চতুর্থ অধিবেশন ঃ

চতুর্থ অধিবেশন ছিল শতীকালীন। '৯২ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে উপজেলা অধ্যাদেশ বাতিল প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক হয়। এই অধিবেশনেও দেরী করে উপস্থিত হওয়া এবং অনুপস্থিতির হার ছিল লক্ষ্যনীয়।

পঞ্চম অধিবেশন ঃ

পঞ্চম অধিবেশনে গোলাম আজম প্রসঙ্গে তর্ক বিতর্ক শুরু হলে বিরোধী দল যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে তার বিচার দাবী করে। সরকারী দল আইনানুগ পদ্ধতিতে নিস্পত্তির আহবান জানায়। এতে বিরোধী দল ওয়াক আউট করে ফলে অধিবেশন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধিবেশন ঃ

ষষ্ঠ অধিবেশনে ১২ই জুন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান জাতীয় সংসদে ১৯৯১-'৯২ সালের বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটের মাধ্যমে এই প্রথম মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট আরোপ করা হয়। যার মাধ্যমে অতিরিক্ত দু'শ ৫০ কোটি টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এটি একটি ভাল উদ্যোগ ছিল। এছাড়া এতে চলমান বিবিধ সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়।

সপ্তম অধিবেশন ঃ

সপ্তম অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, (১০ আগস্ট '৯২) বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে মোট ৭টি দল যেমন-আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, সিপিবি, গণতন্ত্রী পার্টি, ন্যাপ, ওয়াকার্স পার্টি ও জাসদ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। অনাস্থার কারণ হিসাবে বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেণ। যেমনঃ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, জনগণের যানমালের নিরাপত্তাহীনতা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা অর্থনৈতিক দুরাবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ করেন। অনাস্থা প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত ছিল। কেননা '৯২ সালে সন্ত্রাসী তৎপরতা সহ বিভিন্ন অপকর্ম বেড়ে যায়। যার জন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়ে উভয়কে দোষারোপ করে। ১২ই আগস্ট দীর্ঘ ১৭ ঘন্টা আলোচনা সমালোচনার পর অনাস্থার বিরুদ্ধে বিএনপি ১৬৮-১২ ভোটে জয়লাভ করে। একমাত্র জামাতে ইসলামী ভোটদানে বিরত থাকে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিয়ে সরকার রাজনৈতিক দুরদর্শিতার পরিচয় দেয়। প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী ভাষণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিরোধী নেত্রীর ভাষণে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীদের অযোগ্যতা, অনভিজ্ঞতা, অদক্ষতা, সিদ্ধান্ত হীনতার মন্তব্য করে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন "বিএনপি-র মন্ত্রীরা ব্যর্থ, তারা দেশ চালাতে পারে না, আমি নাম বলবো না, এখানেও অনেকেই আছেন। কিন্তু তারা অধির আগ্রহে বিএনপি তে যোগদান করতে চান। কিন্তু একটি শর্ত। ১ম শর্ত হচ্ছে আমাদের যদি ঐ জায়গাটি দেওয়া হয় ঐ সুযোগটি দেওয়া হয় তাহলে আমরা বিএনপিতে যোগদান করবো এবং বিএনটি তখন খুব ভাল হয়ে যাবে। কোন অনিচ্ছাই থাকবে না।"[২৭] প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা এখানেই সে জাতীয় স্বার্থে নয় বরং দলীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার জন্যই দলগুলি অনাস্থা আনে। এই বৈঠকে পুশইন, মেনন হত্যা প্রচেষ্টা এবং ইনডেমনিটি বিল নিয়েও আলোচনা করা হয়।

---

27 এম,এ, ওয়াজেদ মিয়া, বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধিবেশন ঃ

অষ্টম অধিবেশনে সরকারের তৎপরতায় বহুল বিতর্কিত সন্ত্রাস দমন বিল উত্থাপন করা হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর '৯২ হইতে এই অধ্যাদেশটি কার্যকর ও বলবৎ হবার পর থেকেই সকল রাজনৈতিক দল পেশাজীবী সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ছাড়া সকল ছাত্র শিক্ষক সংগঠন এর তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা করে। এর প্রতিবাদে সকল বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে। ১৬ই সেপ্টেম্বর, '৯২ তারিখে বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টির পলিটব্যুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশকে নিকৃষ্ট অধ্যাদেশ হিসাবে অভিহিত করে বলা হয় যে, যেখানে প্রচলিত আইনেই সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন সম্ভব সেখানে জাতীয় সংসদ কে পাশ কাটিয়ে এ ধরনের বিশেষ অধ্যাদেশ জারির অর্থ হলো বিশেষ ক্ষমতা আইনের চেয়েও নিকৃষ্টতম অধ্যাদেশের অক্টোপাশে দেশ ও জাতিকে আবদ্ধ করা।[২৮]

নবম অধিবেশন ঃ

নবম অধিবেশনে '৯৩ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় ২০ দিনের কার্যদিবসের একটি রেকর্ড স্থাপিত হয়। এতে ১টি বেসরকারী বিলসহ ১২টি বিল পাশ হয়। এই অধিবেশনে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে তাহলো মন্ত্রীর এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনার পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ডেপুটি স্পীকারের ডায়াসের সামনে গিয়ে মারমুখো বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এতে করে সংসদের কার্যকরী দিবসটি নষ্ট হয়ে যায়।

দশম অধিবেশন ঃ

দশম অধিবেশন মাত্র ৫ দিন স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে না যাওয়া নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উভয় দলের মধ্যে উত্তেজনা হাতাহাতির পর্যায়ে যায়। এতে আওয়ামী লীগ ও মিত্র দলগুলি বাংলামটরে ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির সমাবেশে হামলার অভিযোগে ওয়াক আউট করে।

---

28 এম,এ, ওয়াজেদ মিয়া, বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধিবেশন ঃ

একাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় '৯৩ এর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে শরৎকালীন অধিবেশন শিরোনামে এই অধিবেশনে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ কৃষি মন্ত্রী এম মজিদুল হক এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেন। উভয় পক্ষের বাত-বিতন্ডার পর দুর্নীতির তদন্তের সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু কমিটি ৭৪ দিন কাজ করার পর Terms of reference ঠিক করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা খুনের কারণে বিরোধী ও সরকারী দল সংসদে জামাত শিবির বে-আইনী ঘোষণা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গী বক্তব্য রাখে। বিরোধী পত্রিকাগুলি বিএনপির ভূমিকাকে "শাসক দলের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ শক্তির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ বলে বর্ণনা করে।"

দ্বাদশ অধিবেশন ঃ

দ্বাদশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তার এক কথিত উক্তির জন্য সংসদ অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। পরে বিরোধী নেত্রীর বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে সাংবিধানিক অথবা বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত না বরং ইগো সমস্যায় নিপতিত হয়। বিরোধী নেত্রী পদত্যাগের হুমকী দেন। পরে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। এই সময় বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ৬টি অভিযোগ আনে। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে দলীয়করণ, তথা ফেব্রুয়ারি, '৯৩ এ অনুষ্ঠিত মিরপুর ১১ আসনে ভোট ডাকাতি, প্রধানমন্ত্রীর সংসদে অনুপস্থিতি, সন্ত্রাস দমন আইন এর অপপ্রয়োগ ও মন্ত্রীদের অশালীন আচরণ।

ত্রয়োদশ অধিবেশন ঃ

ত্রয়োদশ অধিবেশন শীতকালীন অধিবেশন হিসাবে বিবেচিত হয়। '৯৪ এর জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ অধিবেশন থেকেই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সেটি শুরু হয়েছিল মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং শেষ হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সাংবিধানিক দাবী নিয়ে। তবে তাৎক্ষণিক কারণ ছিল তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদার একটি অশোভন উক্তিকে কেন্দ্র করে। ইসরাইল কর্তৃক হেবরণ হামলার বিষয়টি সংসদে উপস্থাপিত হলে তথ্য মন্ত্রী প্রধান বিরোধী দলের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে রসিকতা করলে বিপত্তি শুরুহয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদে বিরোধী দল অধিবেশনের মাঝামাঝি সময় থেকে বেরিয়ে আসে। পরে আর ফিরে যায়নি। তাদের পক্ষ থেকে ৩ দফা দাবী উত্থাপিত হয়। (১) মন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা (২) মাগুরার উপনির্বাচন বাতিল এবং (৩) সংসদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল উত্থাপন।

চতুর্দশ অধিবেশন ঃ

চতুর্দশ অধিবেশন শুরু হয় ৪ঠা মে, '৯৪ সংকট নিরসনে কোন রকম কার্যকর ব্যবস্থা না গ্রহণ করেই। মাত্র ৬ দিনের কার্যকালের পর বিরোধী দলের অব্যাহত অনুপস্থিতির মধ্যেই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। এই অধিবেশনে মাত্র তিন মিনিটে দু'টি বিল পাশ করা হয়। এর আগে ক্ষমতাসীন দলের স্ট্যান্ডিং কমিটিকে বিরোধী দলকে সংসদ ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া অভিযোগ করেন "বারবার সংসদকে অচল রেখে আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিষাক্ত করে তুলেছে। সংসদের কথাবার্তা যদি সংসদ থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে গণতন্ত্রের চর্চা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অধিবেশনের প্রথম দিন ৭ মিনিট স্থায়ী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী গ্রুপগুলিকে সংসদে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিক আহবান জানান। এর জবাবে বিরোধী নেত্রী বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ অন্তঃসার শূন্য তার ভাষণে এমন কিছু নেই যে, বিরোধীদল সংসদে ফিরে যেতে পারে।

পঞ্চদশ অধিবেশন ঃ

পঞ্চদশ অধিবেশনে ৬ই জুন '৯৪ তারিখে শুরু হয় বিরোধী গ্রুপের লাগাতার সংসদ বর্জন। এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাজেট অধিবেশন। তাই বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সংসদীয় রাজনীতি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৯ই জুন সংসদে পেশকরা হয় সরকারের ১৯৯৩-'৯৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং '৯৪-৯৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ১৯৯৩-'৯৪ বাজেটে সর্বাধিক ২২৭২৭ কোটি টাকা শিক্ষা খাতে এবং দ্বিতীয় ১৬২৪ কোটি টাকা সামরিক খাতে বরাদ্দ করা হয়। তবে ১৯৯২-৯৩ বাজেটেও এ দুটি খাতে বেশি বরাদ্দ করা হলেও দারিদ্র্য বিমোচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতে বরাদ্দের পরিমান ১৪৮১ কোটি টাকা। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এডিবিতে মোট বরাদ্দের ১৫ শতাংশ। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে শৃঙ্খলা

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচলিত কর ব্যবস্থা সংস্কারের ফলে সরকারের নিজস্ব তহবিলের অবদান বৃদ্ধি পায়। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে ধারণা করা হয় যে,সরকারী দল বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনতে জোর প্রচষ্টো চালিয়ে ব্যর্থ হয়। সরকারী দল সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিরোধী দল উথাপিত বিল উপস্থাপনার সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু বিরোধী দলের তরফ থেকে এই ধারণা হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা সংসদে ফিরে যাবে না, তবে এই বর্জন নিয়ে তাদের মধ্যে উদ্দেশ্যগত মতদ্বৈততা ছিল। জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ তখনই মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য কাজ করে। অপরদিকে জামাত, ৫ দল, গণফোরাম, ইসলামী ঐক্যজোট ইত্যাদি দলের বক্তব্য সংসদ তার কার্যকাল পুরা করুক। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল উথাপন করে ভবিষ্যতে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত বাজেট সম্পর্কে গণতান্ত্রিক পার্টির সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, "ঘোষিত বাজেট সংবিধান সম্মত নয়। একক সরকারী দলের নব্য স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রকাশ সম্বলিত একটি চাপানো বাজেট। ১১ই জুলাই ১৯৯৪-'৯৫ অর্থ বৎসরের বাজেট অধিবেশনে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জাতির ইতিহাসে এটিই ছিল ১ম ঘটনা যে ক্ষেত্রে বাজেট অধিবেশনের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিরোধী কোন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন না।

ষষ্ঠদশ অধিবেশন ঃ

ষষ্ঠদশ অধিবেশন শুরু হয় ৩০শে আগস্ট, ১৯৯৪ তারিখে। এ সংসদে বিএনপির মাত্র ৬২ জন সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর '৯৪ পর্যন্ত অধিবেশন চলে বিরোধী দলের অব্যাহত সংসদ বর্জনের মধ্যে দিয়ে। এতে ১৯৯৩ সালে কোম্পানী আইন সংশোধন বিল উথাপন এবং জামাতে ইসলামী কতিপয় সংসদ কর্তৃক ইতিপূর্বে সংসদ সচিবালয়ে জমা দেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সরকারী দলের কয়েকজন সদস্যের প্রস্তাব উথাপন ও সেগুলির উপর আলোচনা করা হয়।

সপ্তদশ অধিবেশন ঃ

সপ্তদশ অধিবেশন শুরু হয় ৮ই নভেম্বর ১৯৯৪। এই অধিবেশন শুরুর আগে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার উদ্যোগে নেওয়া হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর '৯৪ তারিখে কমনওয়েলথ মহাসচিব জেনারেল

Dhaka University Institutional Repository

এমেকা আনিয়াকু ৫ দিনের সরকারী সফরে বাংলাদেশে আসেন। তিনি বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন। নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ লক্ষ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে, নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করণ এবং উপযুক্ত নির্বাচন আচরণ বিধি প্রণয়ন এই ৩টি বিষয়কে আলোচ্য সূচী হিসাবে নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বৈঠক করার প্রস্তাব দেন এবং তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর স্যার নিনিয়ান স্টিফেনকে তার বিশেষ দূত হিসাবে নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। ১৩ই নভেম্বর তিনি ঢাকায় আসেন। দীর্ঘ এক মাস তার মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী উপনেতার মাধ্যমে আলোচনা চলে, কিন্তু এই আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সপ্তদশ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন "আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরাই সমাধানে সক্ষম, বাহিরে কোন সহযোগিতা প্রয়োজন নেই।" অপরদিকে বিরোধী দল সংসদের বাইরে থেকে তাদের সরকার বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

অষ্টাদশ অধিবেশন ঃ

অষ্টাদশ অধিবেশনের পূর্বে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অবনতি হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা, বিরোধীরা একের পর এক হরতাল অবরোধ বিক্ষোভ কর্মসূচী দিতে থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল চলে আসে রাজপথে। হাইকোর্ট তাদের অব্যাহত সংসদ বর্জন বে-আইনী ঘোষণা দেয় এবং পরবর্তী অধিবেশন ঘোষণার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ১৪৭ জন সদস্য ২৮শে ডিসেম্বর '৯৪ আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগ করে, এতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং জনমনে সৃষ্টি হয় হতাশা ও উদ্বেগ। এই প্রেক্ষিতে ২৮শে ডিসেম্বর '৯৮ তাদের পদত্যাগ সংসদ আইনের বলে ঘোষণা করে। এই অবস্থায় ২৩শে জানুয়ারী '৯৫ ১৮দশ অধিবেশনের আহবান করা হয়। ঐ দিন স্পীকার বিরোধীদের পদত্যাগের বিরুদ্ধে রুলিং জারি করেন। সংসদ ডাকায় স্পীকার আদালতের অবমাননা করেছেন বলে প্রধান বিরোধী সংসদ নেতৃবৃন্দ পৃথকভাবে মামলা দায়ের করে।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশতম অধিবেশন ঃ

'৯৫ এর মার্চে ১৯তম অধিবেশন বসে এবং ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত চলে। বিরোধী দল বিহীন নিস্প্রাণ এই অধিবেশনের কোন কর্ম তৎপরতা ছিল না। এই সময়ে এক হিসাবে সংসদ তার বৈধতা হারায়।

বিশতম অধিবেশন ঃ

২৭শে জুন ২০তম অধিবেশন বসে। এটি ছিল বাজেট অধিবেশন। ২৯শে জুন '৯৫-৯৬ অর্থ বছরের বাজেট পাশ হয়। এই বাজেটে বিদ্যমান কাঠামোকে দক্ষভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হওয়ায় রাজস্ব আয় বাড়ে। এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করের অবদান বেশি। বিরোধীদের অনুপস্থিতিতে প্রণীত এই শেষ বাজেট দেশ ও বিদেশে তীব্র অবমাননার সম্মুখীন হয়। এই অধিবেশন শেষে সংবিধানের ১০৬ ধারা মোতাবেক প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের ইতিহাসের এই প্রথম পদত্যাগকৃত সদস্যদের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা চান সুপ্রিম কোর্টের কাছে। ২৭শে জুলাই '৯৫ প্রধান বিচারপতিসহ ৫ জন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত দেয় যে, বিরোধী সদস্যদের ওয়াক আউট, বয়কট অনুমতি বিহীন অনুপস্থিত বলে গণ্য হবে এবং ঐ দিনই উক্ত সদস্যদের পদ শূন্য ঘোষণা করে। এই কারণে ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান এর বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে সাংবিধানিক সংকট দূর করার আহবান জানালে তারা যে কোন মূল্যে এই নির্বাচন ঠেকাবে বলে ঘোষণা দেয়।

একুশতম অধিবেশন ঃ

২১তম অধিবেশন ৬ই সেপ্টেম্বর '৯৫ অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ফ্লোর ক্রসিং এর কারণে ৩ জন সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় এবং প্রেসিডেন্টের পেনশন, আইসিডিডি-আরবি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত জাল উত্থাপন ও বিল দুটি বিল পাশ হয়।

বাইশতম অধিবেশন ঃ

২২তম অধিবেশনের পূর্বে রাজনৈতিক অচলতা দুর করার জন্য বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসেন। তারা উভয় পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে কোন মীমাংসায় আসতে ব্যর্থ হন। এরপর শুরু হয় পত্র যোগাযোগ। ২৮শে

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বিরোধী নেত্রীকে আলোচনার আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান। ৩০শে অক্টেবার তিনি পত্রের জবাব দেন। পর পর তিনটি পত্র বিনিময় উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য আলোচ্য সূচী নির্ধারণে ব্যর্থ হয়। নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থাকার জন্য এই যোগাযোগ কোন সমাধান দিতে পারেনি। অপরদিকে বিরোধী দলও তাদের আন্দোলন তীব্রতর করে। এ প্রেক্ষিতে ১৪ই নভেম্বর '৯৬ শুরু হয় ৫ম সংসদের অঘোষিত সমাপ্তি অধিবেশন। ২২শে নভেম্বর উপনির্বাচনের সিডিউল পুনঃঘোষিত হয়। বিরোধীদের অনড় অবস্থানের মুখে ২৪শে নভেম্বর '৯৫ প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম বেতার, টেলিভিশন বক্তৃতায় ৫ম সংসদের সমাপ্তির সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং ঐদিনই প্রেসিডেন্ট ৫ম সংসদ বিলুপ্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

উপরের বিস্তারিত আলোচনার দেখা যায় যে, ৫ম সংসদ শুরু হয় ৫ই এপ্রিল '৯১ এবং ২৮ নভেম্বর '৯৫ পর্যন্ত এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এই দীর্ঘ সময় ২২টি অধিবেশনে ৩৯৬টি কার্যক্রমে অতিবাহিত করে। তবে এই অধিবেশনগুলিই অধিকাংশই বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছাড়াই সম্পন্ন হয়। কেননা বিরোধী দল মাত্র ১৩টি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে। ত্রয়োদশ অধিবেশনের পর থেকে তারা সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে ২৮শে ডিসেম্বর '৯৪, সপ্তদশ অধিবেশন থেকে। এই ১২তম অধিবেশন থেকে ১৭তম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন ছিল ৮১টি এবং সপ্তদশ অধিবেশন পর্যন্ত কার্যক্রম ছিল ৩৪৮টি। এই অধিবেশনগুলির মান ছিল খুবই নিম্ন। কারণ ২০ মাসেরও বেশী সময় পর্যন্ত এই সংসদ বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ব্যতীত পরিচালিত হয়েছে। অপরপক্ষে সংসদের যে অধিবেশনসমূহে তারা উপস্থিত ছিল সেগুলিও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হতে পারেনি।

সংসদীয় রাজনীতিতে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সংসদের ভিতর থেকে রাজপথে হরতাল অবরোধ বা ভাংচুরের মাধ্যমে নয়। অথচ ৫ম সংসদে দেখা যায় যে, বিরোধীরা সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে সংসদের বাইরে থেকে। ফলে তাদের রাজনীতি সংসদীয় রাজনীতি ছিল না বরং সংসদ বর্জনের রাজনীতি ছিল। কারণ তারা একনাগারে সংসদ বর্জন শুরু করে ত্রয়োদশ অধিবেশন থেকে। তবে এর আগেও সংসদে উপস্থিত

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেও কোন অধিবেশনই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে দেয়নি। প্রতিদিনই ওয়াক আউট এবং বয়কটের ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী ১৩টি অধিবেশনে ওয়াক আউট করে ৯১ বার। ১৯৯১ সালে ৩টি অধিবেশনে তারা ১৩ বার ওয়াক আউট করে। উল্লেখ্য ৫ই এপ্রিল '৯১, ১ম অধিবেশনেই ওয়াক আউট ঘটে। সংসদের কার্য উপদেষ্টাদের তালিকায় বিরোধী নেত্রীর নাম ৬ নম্বরে থাকার জন্য এই ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটে। ২য় ওয়াক আউট ঘটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সেই সময় সংঘটিত সহিংস ঘটনা নিয়ে মূলতবী প্রস্তাব গ্রহণ না করার প্রতিবাদে। '৯৫ সালের ৪টি অধিবেশনে ১০ বার ওয়াকআউট হয়েছে। কারণ ছিল গোলাম আজমের বিচার দাবী, সন্ত্রাস দমন আইন বাতিলের দাবী ও ইউনিয়ন পরিষদ বিল নিয়ে। '৯৩ সালের ৫টি অধিবেশনে ওয়াক আউট হয় ২৬ বার। কারণগুলি ছিল টিভি রাউন্ড আপে বিকৃত তথ্য পরিবেশন, মিরপুর উপনির্বাচনে বিধিলংঘন ও ফলাফল নিয়ে মিডিয়া ক্যু, ৭ই মার্চ রেডিও ও টিভিতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করা নিয়ে আলোচনা কালে মাইক না দেয়া, আওয়ামী লীগ সাংসদ আওরঙ্গের আটকাদেশের প্রতিবাদে, বিধি বহির্ভূতভাবে জ্বালানী মন্ত্রীকে বিবৃতি দানের সুযোগ দানের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমাবেশে হামলার প্রতিবাদে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত দুর্নীতি তদন্ত কমিটি গঠনের দাবীতে। '৯৪ সালে ১ম অধিবেশনে ২ দফা ওয়াকআউট করে বিরোধী দল। এই দু'টি হলো সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনোত্তর বিজয় মিছিলে সহিংস ঘটনায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং হেবরনে সংগঠিত হত্যাকান্ড সম্পর্কিত বিতর্ককালে তথ্য মন্ত্রীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। সংসদীয় ব্যবস্থায় এ ধরনের কাজ স্বীকৃত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যখন তখন সংসদ বর্জন করে একে অচল করে দিতে হবে। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের যে শক্তিশালী গঠনমূলক ভূমিকা থাকে সেটি পালনে আওয়ামী লীগ সহ সকল দলই ব্যর্থ হয়েছে। ওয়াক আউট কাংখিত নয় তবু তা সদস্যদের অধিকার বলে স্বীকৃত। ওয়াক আউটের ফলে সংসদের কার্যক্রমের বাধা সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে কোন বিষয়ের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে ওয়াক আউট করা হয়। অতিরিক্ত ওয়াক আউট সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার পরিবেশ অনুপস্থিত এটাই প্রমাণ করে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য বেশী হলে ওয়াক আউট বেড়ে যায়। বাংলাদেশের ৫ম সংসদের রেকর্ড পরিমান ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটে।"[২৯]

---

29 মাহমুদ শফিক, জনগণ সংবিধান নির্বাচন, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম জাতীয় সংসদে অধিবেশন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিমান গতভাবে সফল হলেও গুণগত মান সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেনি। একথা ঠিক যে, এই সংসদ দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত রচনা করে। বিগত ৫ বছরে ৫ম সংসদে ২২টি অধিবেশনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যায়ে বিএনপি জাতীয় সংসদকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করে এবং সংসদকে সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বর্ণনা করে। কিন্তু তারা এ কাজে বিরোধী দলের আস্থা অর্জনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। বিরোধী দলের সম্মিলিত পদত্যাগের ফলে সুপ্রিমকোর্টের স্মরণাপন্ন হওয়া, বিধি মোতাবেক ব্যর্থ হয়। বিরোধী দলের সম্মিলিত পদত্যাগের ফলে সুপ্রিম কোর্টের স্মরণাপন্ন হওয়া, বিধিমোতাবেক উপনির্বাচন ঘোষণা, সংবিধানে নাই বলে বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবীর বিরোধিতা প্রভৃতি চেষ্টার পর সংবিধান মোতাবেক সংসদ বিলুপ্তির ঘোষণা ইত্যাদি ছিল ক্ষমতাসীন বিএনপির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার প্রয়াস। তাদের উচিত ছিল বিরোধী দলের পদত্যাগের সাথেই সংসদকে ভেঙ্গে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন দেওয়া। তারা জনমতকে উপেক্ষা করে স্বৈরাচার সরকারের মতই একটি অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ষষ্ঠ সংসদ গঠন করে জনপ্রিয়তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল ৫ম সংসদে উত্থাপন করা ছিল গণতান্ত্রিক সম্মত। বিশেষজ্ঞদের মতে পদত্যাগের পরবর্তী অধিবেশনের কার্যক্রমগুলি ছিল অবৈধ।

জাতীয় সংসদের সকল সদস্যদেরই কমিটি ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং ৩৩০ জন সদস্য প্রত্যেকেই অন্তত একটি কমিটির সদস্য। ৫ম জাতীয় সংসদের একটি উল্লেণখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত বিরোধী দলের উপস্থিতি আছে। আগের সংসদগুলোতে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ট্রেজারী বেঞ্চের বিশেষ সুবিধা কিন্তু বর্তমানে সংসদে ৩৩০ জন সাংসদের ১৫৭ জনই বিরোধী দলীয় এবং তারা সংসদে বরাবরই সরব থেকেছেন।

তবে বিরোধী দলের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কমিটির বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তাদের মতামত নেয়া হয় নাই। ৫ম সংসদে দেখা গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাদেশ জারী করার পর সংসদে বিল আকারে পেশ করা হয়েছে। এতে সংসদীয় সরকারের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। কারণ এতে বিরোধীদের অংশ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ ছিল না, বিরোধীরা সবচাইতে বেশী ক্ষুব্ধ হন ট্রেজারী বেঞ্চের বিরুদ্ধে যখন বিশেষ কমিটিতে বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় সন্ত্রাস দমন বিলটি সংসদে পাশ করা হয়। এভাবে উক্ত অধ্যাদেশ জারী সংসদ এবং সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা খর্ব করার সমান এবং সংবিধানের নীতির পরিপন্থী বলে ব্যাপক সমালোচনা করা হয়, বিরোধীরা অভিযোগ করেন যে, সংসদীয় কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন এতে নেই বলে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলি কার্যকরী হতে পারছে না। এবং স্বয়ং স্পিকার ও মন্ত্রীরা এর প্রধান হওয়ায় নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হয়েছে। ৫ম সংসদে কমিটি ব্যবস্থায় লক্ষনীয় ছিল কমিটির বৈঠকে সরকারী দলের সদস্যদের এমনকি বিরোধীদেরও সংসদে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা কার্য উপদেষ্টার মত গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য ছিলেন এবং স্পীকার ছিলেন এর সভাপতি। অথচ এই বৈঠকে তাদের উপস্থিতির হার ছিল খুবই নগন্য।

৩.৩ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ

সংসদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সৃষ্ট মতবিরোধ তথা ১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের কার্যক্রম সম্বন্ধে এই অভিসন্দর্ভে প্রশ্নমালায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে মতামত জরিপ করা হয়। কিছু প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত এই জরিপের মাধ্যমে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে দেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিফলন। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে প্রশ্নমালা ও এর উত্তর একে একে দেখানো হলো ঃ

টেবিল–১

প্রশ্ন	হ্যাঁ (%)	না (%)	আংশিক (%)	মন্তব্য (%)
৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বছর পর ৫ম জাতীয় সংসদে যে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সরকার কি দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল?	৩৯.৪১	৫২.৯৪	১৭.৬৫	
এখানে সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা সংসদীয় রীতি সম্মত ছিল কি না?	৫.৮৮	৭৬.৪৭	১১.৭৬	

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে আঃলীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল কি না?	৫.৮৮	৭৬.৪৭	১১.৭৬	অধিকাংশ ৫.৮৮%
বিএনপি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দুটি উপনির্বাচন যেমনঃ মিরপুর ও মাগুরা উপনির্বাচনে ভোট কারচুপি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ অবাধ নির্বাচন হয়নি। বিরোধী দলের এই অভিযোগ কি সঠিক?	৮৮.২৪	৫.৮৮	৫.৮৮	
৫ম জাতীয় সংসদে বিরোধী আন্দোলনের মূল দাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য তাদের লাগাতার সংসদ বর্জন, হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট প্রভৃতি কর্মসূচী যুক্তিসঙ্গত ছিল কিনা?	৩৫.২৯	৫৮.৮২		অধিকাংশ ৫.৮৮%
এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সঠিক ও কারচুপি বিহীন হবে। এই কথাটি সঠিক কিনা?	৫২.৯৪	৪১.৪৮		সম্ভাব্য ৫.৭৮%
বিরোধীরা পদত্যাগের পর সংসদে অনুষ্ঠিত অধিবেশন গুলি কি বৈধ ছিল?	৩৫.২৯	৩৪.৭১		
বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল ৫ম জাতীয় সংসদে পাশ না করে একটি অগ্রহণযোগ্য ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে পাশ করে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কথাটি কি সঠিক?	৮২.৩৫	১১.৭৬	৫.৮৮	
৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কি বৈধ ছিল?	২৯.৪১	৭০.৫৯		
যদি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ অবৈধ হয়ে থাকে তবে উক্ত সংসদে পাশ কৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটিও অবৈধ। কথাটি কি সঠিক?	৪১.১৮	৪৭.৬		প্রযোজ্য নয় ৫.৮৮%

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল–২

প্রশ্ন	সরকারী দল	বিরোধী দল	উভয়ের	মন্তব্য
যদি দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা পালন করতে না পারে তবে সেই ব্যর্থতার দায়ভার কার বেশী?	৫.৮৮%	৫.৮৮%	৭৬.৪৭%	উত্তর দেয় নাই ৫.৮৮%
				প্রযোজ্য নয় ৫.৮৮%
যদিতাদের পদত্যাগে সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়ে তবে এর জন্য দায়ী কে ছিল?	১১.৭৬%	৫.৮৮%	৮২.৩৫%	

টেবিল–৩

প্রশ্ন	সম্পূর্ণ	আংশিক	একেবারেই পারেনি
'৯০ এর গণ-অভ্যুত্থানের ৩ জোটের কাকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সরকার গঠন করার পর সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা কতটুকু কাজ করতে পেরেছিল?		৮৮.২৮%	১১.৭৬%

উপরের টেবিল সমূহে প্রদত্ত মতামত, জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৫৬ বৎসর পর ৫ম জাতীয় সংসদে যে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সরকার কি দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল?

এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বেশীরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যম দীর্ঘ ১৬ বছর পর ৫ম জাতীয় সংসদে যে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সরকার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সক্ষম

Dhaka University Institutional Repository

হয় নাই। মাত্র ২৯.৪১% উত্তরদাতা এক্ষেত্রে হ্যাঁ বোধক জবাব দেন। বাকী ১৭.৬৫% মনে করেন ১৯৯১-'৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সরকার এক্ষেত্রে আংশিক সফলতা লাভ করেছিল।

"রাজনীতিতে যে সহাবস্থান প্রয়োজন, বিরোধীদলকে বা সরকারী দলকে যে গ্রাহ্য করার মানসিকতা-তা আমাদের দেশে নাই। আর নেই বলেই দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও সংসদ এখানে পরিপূর্ণভাবে কাজ করছে বলা যাবে না।"

উত্তরদাতাতের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যদি দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা না পালন করতে পারে তবে সেই ব্যর্থতার দায়ভার কার বেশী?

'৯০ এ গণঅভ্যুত্থানের পর নির্বাচিত সরকারের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার দায়ভার (৭৬.৪৭%) বেশীরভাগ উত্তরদাতা মতে সরকার এবং বিরোধী উভয় দলের উপর বর্তায়। এক্ষেত্রে কৌতুহল উদ্দীপকভাবে ৫.৮৮% উত্তরদাতা সরকারী দলকে এবং একই সংখ্যক উত্তরদাতা বিরোধী দলকে দায়ী করেন।

এখানে সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা সংসদীয় রীতি সম্মত ছিল কিনা?

সরকার ও বিরোধীদলের ভূমিকা সংসদীয় রীতি সম্মত ছিল না, ব্যাপারে (৭৬.৪৭%) অধিকাংশ উত্তরদাতা না বোধক উত্তর দেন যা বাস্তব সম্মত মনে হয়। মাত্র ৫.৮৮% উত্তর দাতা সরকার ও বিরোধীদলের ভূমিকা সংসদীয় রীতি সম্মত ছিল বলে মনে করেন। আর মাত্র ১৭.৬৫% উত্তরদাতা সরকার ও বিরোধী উভয়ের ভূমিকাকে আংশিক ভাবে সংসদীয় রীতি সম্মত বলে মনে করেন।

সরকার গঠনকারী প্রতিটি দলই (আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, বিএনপি) ব্যক্তির ইমেজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বিধায় ব্যক্তিকেন্দ্রীক দল হয়ে উঠে। সকলের মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে নেতা বা নেত্রী যা বলেন সেটাই দলের সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হয়। '৭২ সালে আওয়ামী লীগ নেতা হিসাবে শেখ মুজিব এর ক্যারিজমেটিক নেতৃত্ব দলের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বাঁধার সৃষ্টি করে। ফলে দলটি সংসদীয় সরকার পরিচালনায় ব্যর্থ হয়। ১৯৭৮ সালে

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি ও ১৯৮২ সালে জাতীয় পার্টি যথাক্রমে জিয়া ও এরশাদের ইমেজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। একইভাবে '৯১ সালের সংসদয়ি ব্যবস্থায় সরকারী দল বিএনপি এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ খালেদা জিয়া ও হাসিনার ব্যক্তিগত ইমেজ থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। দলের ভেতর গণতন্ত্রের চেতনা থাকায় তারা সংসদীয় সরকার পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তেই রাষ্ট্র পরিচালনা হতো, সংসদের মতামতের প্রাধান্য দেয়া হতো না। তিনি রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে নয় বরং দলের চেয়ারপার্সন হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব খাটাতেন। এভাবে সবকিছুতেই দলীয়করণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারী করে সংসদের বাইরে থেকে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সাহস কারও ছিল না। দল হিসাবে আওয়াম লীগের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত মজবুত থাকলে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে হাসিনার ইমেজকে বড় করে দেখা হয়। '৯১ এর নির্বাচনে "ভোট ডাকাতি ও সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে" নেত্রী শেখ হাসিনার এ কথার প্রতিবাদ করলে দলের প্রধান সদস্য ড. কামাল হোসেনকে দলের সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ঠিক একইভাবে তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদাকেও বিএনপির সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় দলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য। এভাবে দেখা গেছে যে প্রধান দলগুলি তাদের নেতা কর্মীকে বহিস্কার করছে দলের বাইরে কথা বলার জন্য। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ উল্লিখিত নীতির জন্যই দলগুলি গণতান্ত্রিক না হয়ে স্বৈরাচারী ভূমিকা পালন করছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্র কার্যকর হওয়া না হওয়া নির্ভর করে বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিচালনা ও কার্যক্রমের উপর। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো আমাদের সংবিধানে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন রেজিস্ট্রেশন করায় বিষয়ে কোন শর্ত নাই। শুধু আমাদের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে একটি রেফারেন্স আছে। এখানে বলা হয়েছে কোন নির্বাচনে কোন দলের প্রার্থী রূপে মনোনীত হয়ে কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে উক্ত দলের বিরুদ্ধে ভোট দান করেন তাহলে তার আসন শূন্য হবে। আমাদের সংবিধান এক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেছে, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলির জন্ম, বিকাশ অথবা ধ্বংস, রাজনৈতিক দলের নিজস্ব গতিশীলতা ও রাজনৈতিক সংস্থার উপর নির্ভর করে।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য ছিল কি না?

এ প্রশ্নের উত্তরে ৬.৪৭% উত্তরদাতা শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল না বলে মরেন করেন। এক্ষেত্রে ১১.৭৬% উত্তরদাতার মতে আংশিকভাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ৫.৮৮% এর মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল।

রাষ্ট্রপতি সরকারের সমর্থক সামরিক শাসকের অধীনে জন্ম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংসদীয় সরকারের পক্ষে রায় দিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৮২ সালের পর আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলের ইমেজ তৈরি, কর্মী সমর্থক গড়ে তোলার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। যার জন্য '৯১ এ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে জয় লাভ করে এবং এর মাধ্যমে সামরিক ছাউনিতে জন্ম গ্রহণকারী দলের গ্লানি মুছে ফেলার স্বীকৃতি লাভ করে। বিএনপি অনেকগুলি অর্জনকে ঝুলিতে নিয়েই নব্বই এর দশকে প্রবেশ করেছে এবং দেশের চলতি রাজনৈতিক দলের ধারায় প্রবাহিত স্রোতে মিশে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে '৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিএনপি নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করে। ক্ষমতাসীন হবার পর বিএনপিকে অধিকাংশ আয় ব্যয় করতে হয়েছে সরকার পরিচালনায়। যার জন্য সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি সময় দিতে পারেনি। নেত্রীসহ অনেকেই প্রথমবারের মত সরকারী দায়িত্ব পালন করায় বিরোধীরা বিকল্প কর্মসূচি কি হবে বা তারা কিভাবে এতে অংশগ্রহণ করবে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট ছিল না। থানা ও জেলা পর্যায়ে তাদের নেতৃত্বের সংকট দেখা যায়। নতুন বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুক্ত বাজার ও মুক্ত বিনিয়োগে আগ্রহী হয় কিন্তু তাদের গঠনতন্ত্রে ছিল মিশ্র অর্থনীতির কথা এবং সংসদীয় সরকার তাদের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। এ জন্য '৯৩ তে কাউন্সিল অধিবেশনে এ সবদিক লক্ষ্য রেখে তাদের নীতি ও গঠনতন্ত্রে আমূল পরিবর্তন করে।

এ সবই ছিল সরকারী দলের কিছু ভাল উদ্যোগ, কাউন্সিলের সমাপনী ভাষণে দুর্নীতি ও দলীয় কোন্দল সম্পর্কে হুশিয়ারী করে দেন প্রধানমন্ত্রী এবং '৮২ দুর্নীতির অভিযোগে নির্বাহী কমিটির সভায় ৫২ জনকে

Dhaka University Institutional Repository

বহিঃস্কারের কথা স্মরণ করেন। তবে তাদের কে সঠিক কাজ করতে না দেওয়ার জন্য দেওয়ার জন্য প্রধান দল আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন।

অপরদিকে দেখা যায় যে, সংসদীয় সরকারের আজন্ম সমর্থক হয়েও আওয়ামী লীগ যে কোন মূল্যে এই সংসদকে কাজ করতে দিতে চায়নি। গত ৮ই অক্টোবর (১৯৯১) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় দেখা গেছে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল বিএনপিকে বিনা চ্যালেঞ্জ কোন কিছু করতে দেবে না। প্রথম পর্যায়ে আওয়ামী লীগ অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে আলোচনা না করে জাতীয় ঐক্যমতের প্রার্থী হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এই মনোনয়নের বিরোধীতা করেছিল জাতীয় পার্টি, জামাতে ইসলাম ও ওয়াকার্স পার্টি। কোন কোন পর্যবেক্ষকের মতে, "রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নিজেকে অন্যান্য বিরোধী দলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেনি।[৩০] আওয়ামী লীগ কৌশলগত কারণে সংসদীয় সরকারের পক্ষ নিয়েও সংসদ ভেঙ্গে দেবার আন্দোলনে নামে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে। এই আন্দোলনে প্রধান বিরোধী দল আঁতাত করে ৯০ এর স্বৈরাচারী দল জাতীয় পার্টি এবং ৭২ এর ঘাতক দালাল জামাতের সাথে। জামাতের সাথে আঁতাত করার জন্য আওয়ামী লীগ সমর্থক নিলীমা ইব্রাহিম বলেন যে, "আপনাদের কাছে বিনীত নিবেদন ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের সাথে রক্ত দিতে হলে বাঙ্গালী দিবে কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী হত্যাকারী, ধর্ষনকারীদের হস্তপূর্ণ করতে বলবেন না। ক্ষমতায় আসা বড় কথা না টিকে থাকাটাই বড় কথা।"

বিএনপি জামাতের সহযোগিতায় সরকার গঠন করলে আওয়ামী লীগ জামাত বিরোধী আন্দোলনে নামে যদিও তারা এর পূর্বে জামাতের সাথে আঁতাত করেছিল আন্দোলনের ভিত মজবুত করার জন্য। তাদের চাপে পড়ে সরকার গোলাম আজমকে গ্রেফতার করে। দেখা যায় যে, এখানে নীতি বা আদর্শ বড় কথা নয়, বড় কথা হলো ক্ষমতা। স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের জন্য যেহেতু এই সংসদ দায়ী ছিল তাই জাতীয় পার্টি এই সংসদকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে দিনে চায়নি। যার জন্য তারা প্রথম থেকেই প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সরকারী দলের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ

---

30 সামসুর রহমান, রাজনৈতিক যেন সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রম না হয়, বাংলার বাণী, ঢাকা, ৩রা নভেম্বর ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

করে। অপরদিকে জামাত প্রথমে সরকার গঠনে বিএনপি কে সাহায্য করলেও পরবর্তীতে নিজেদের স্বার্থগত কারণে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সাথে যোগ দেয়।

১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের ৩ জোটের কাছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সরকার গঠন করার পর সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা কতটুকু কাজ করতে পেরেছিল?

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত ৩ জোটির কাছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার বলে অধিকাংশ (৮৮.২৪%) উত্তরদাতা মনে করেন। অপর পক্ষে মাত্র ১১.৭৬% উত্তর দাতা মনে করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকার গঠন করার আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একেবারেই কাজ করতে পারে নাই।

১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় দলগুলি প্রথম দিকে কিছুটা গঠন মূলক ভূমিকা পালন করলেও পরের দিকে তাদের ভূমিকা ছিল গতানুগতিক। তিন জোটের কাছে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিশ্রুতি ছিল, যেগুলির প্রয়োগ হয়নি। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারী দলের কেবল বিরোধিতা করার জন্য নয় বরং সরকারকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য। "Attack upon the government and individual ministers are the function of the opposition. The duty of the opposition is to oppose..... that duty is the major check which the constitution provides upon corruption and defective administration"[31] পাশাপাশি সরকারী দলের প্রয়োজন বিরোধী দলের সমালোচনার প্রতি সহনশীল হবার। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে ঐক্যমতে পৌঁছলেও সরকার প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে প্রধান দল দু'টির মধ্যে প্রচন্ড মতবিরোধ দেখা যায়। পারস্পরিক অবিশ্বাস, দলীয় কর্তৃত্ব, লাগাতার হরতাল, বিরোধী দলকে গ্রহণযোগ্যতায় না আনা প্রভৃতি কারণে সংসদ অচল হয়ে পড়ে। বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য বাংলাদেশ এডিটরস কাউন্সিল আয়োজিত "গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা" শীর্ষক এক মুক্ত আলোচনায় বলেছিলেন, "সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য সরকার ও বিরোধী দলকে

---

[31] Ivor Jennings, Cabinet Government, Cambridge University Press, 1961, Page, 61.

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বশীল, সময়োতাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।" নেতা নেত্রীরা দ্বিতীয় সংসদীয় সরকার কার্যকরি করার জন্য বড় বড় বক্তৃতা দেন কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। "রাজপথ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। আর সংসদীয় গণতন্ত্রকে রাজপথে নিয়ে গেলে সেটা ব্যর্থ হতে যাবে।" রাজপথ আমরা কাউকে ইজারা দেইনি। বিএনপিকে আমরা গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো এ ধরনের বক্তব্য উস্কানিমূলক গঠন মূলক নয়। সংসদে বিরোধী দলের পেশকৃত বিল না হলেই রাজপথে নামতে হবে সরকারের পতন ঘটাবার জন্য এই ধরনের কালচার সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত নয়। বৃটেন, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার দিকে তাকালেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। "বিরোধী দল সে যেই হোক আজকের বিএনপি বা গতকালের আওয়ামী লীগ এদের কাছে প্রত্যাশা একটাই শুধু বিরোধিতার খাতিরে যেন সবকিছুর বিরোধিতা না করা হয়। বিরোধী দলেরও একটা স্বচ্ছ ও আদর্শ নীতি থাকা দরকার যাতে করে মানুষ সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।"

বিএনপি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দুটি উপনির্বাচন যেমনঃ মিরপুর ও মাগুরা উপ-নির্বাচেন ভোট কারচুপি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ অবাধ নির্বাচন হয়নি। বিরোধী দলের এই অভিযোগ কি সঠিক?

বিএনপি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দুটি উপনির্বাচনে যেমন-মিরপুর ও মাগুরা উপনির্বাচনে "ভোট কারচুপি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।" বিরোধী দলের এই অভিযোগের প্রতি অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮৮.২৪%) হ্যাঁ বোধক উত্তর দেন। মিরপুর ও মাগুরা উপনির্বাচেন ভোট কারচুপি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলের এই অভিযোগের প্রতি না সূচক উত্তর আসে মাত্র ৫.৮৮%।

১৯৯২ সালের ১৪ নভেম্বর বিএনপির সংসদ সদস্য হারুন মোল্লা মারা যান। তিনি ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেনকে ২,৪০০ ভোটে পরাজিত করে মিরপুর (ঢাকা-১১) এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী এই আসনে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল মজুমদার।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক সংবাদ এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, মিরপুরের উপ-নির্বাচনে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উত্তেজনা, সংঘর্ষ-সংঘাত, ভোটারদের হয়রানি এসব ছাড়াও বেশ কিছু জাল ভোট দেয়া হয়। ভোট দিতে এসে ফিরে গিয়েছেন অনেক ভোটার। আবদুল আজিজ (ভোটার নং-১২২৩) ও ফজলুর রহমান (ভোটার নং ১০৭০) ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখতে পান, তাদের ভোট কে বা কারা দিয়ে গেছে। ..... এছাড়া আরও বহু অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- গাবতলী স্কুল-কেন্দ্রে একজন আনসার কমান্ডার বিএনপির ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রচারনা চালান। প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করে ফল হয়নি। শাহ আলী কেজি স্কুল কেন্দ্রে একজন পুলিশকে (আওয়ামী লীগের) নৌকা-মার্কা স্লিপধারী মহিলা ভোটারদের হয়রানি করতে দেখা যায়। শাহ আলী গার্লস স্কুল কেন্দ্রে নৌকার প্রতীক সম্বলিত পোস্টার ছিড়ে ফেলা হয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে রেডিও টেলিভিশনে মিরপুর উপ-নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ আহুত সন্ত্রাসী তৎপরতা, সংসদের বিরোধী দলের চীপ হুইপ মোহাম্মদ নাসিমকে নির্দয়ভাবে প্রহারের মধ্য দিয়ে সরকারের অগণতান্ত্রিক চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। গণতন্ত্র বিএনপির হাতে নিরাপদ নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিশু-গণতন্ত্র পরিচর্যার অভাবে বিকলাঙ্গ ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্র কিভাবে লালন করতে হয়, বিএনপি তা জানে না।

মিরপুর উপ-নির্বাচনের পরই বিএনপি সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয় বলে আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে।

২০শে মার্চ ১৯৯৪-এ মাগুরা-২ আসনে উপ-নির্বাচনে মিরপুরের লজ্জাজনক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। বিএনপি সরকার মনে করেছিলেন মাগুরা উপ-নির্বাচনে পরাজিত হলে তারা জনগণের আস্থা হারাবে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার শিখর থেকে বিচ্যুত হবে। অতএব, এই উপ-নির্বাচনে বিজয়ের প্রশ্ন তাদের কাছে জীবন মরণ সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। দৈনিক "ভোরের কাগজ" এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচনে বিভিন্ন স্থানে ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট-বাক্স ছিনতাই, ভোট কারচুপি, এজেন্টদের বের করে দেয়। সকাল ৯টার দিকে চান্দ্রা কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ কামাল ও ঋষি সম্প্রদায়ের রামপদকে মারধর করা হয়। সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে চতুর বাড়িয়া কেন্দ্র এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর হামলার ছবি তুলতে গেলে বিএনপি সমর্থকরা চিত্র সাংবাদিকদের হুমকি দেয়।

দৈনিক "সংবাদ" এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মাগুরা উপনির্বাচনটি ছিল প্রায় সব বিরোধী দলের চোখের প্রধানমন্ত্রীসহ ক্ষমতাসহ ক্ষমতাসীন বিএনপি'র মন্ত্রী, এমপি, প্রশাসন, পুলিশ বাহিনী, সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র ক্যাডার, মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের এক যৌথ অভিযান। অভিযানের লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে জয়ী হওয়া, যার ফলাফল সম্পর্কে বিএনপি ঢাকা থেকে নীতি নির্ধারণ করে গিয়েছিল।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী আন্দোলনের মূল দাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য তাদের লাগাতার সংসদ বর্জন, হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট প্রভৃতি কর্মসূচী যুক্তিসঙ্গত ছিল কিনা?

বেশীরভাগ উডত্তরদাতা মনে করেন (৫৮.৮২%) পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী আন্দোলনের মূল দাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য লাগাতার সংসদ বর্জন, হরতাল, অবরোধ ধর্মঘট প্রভৃতি কার্যাদি যুক্তিসঙ্গত ছিল না। কম সংখ্যক উত্তর দাতা মনে করেন যে বিরোধী আন্দোলনের মূল দাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এবং এর জন্য তাদের লাগাতার সংসদ বর্জন, হরতাল, অবরোধ প্রভৃতি কর্মসমূহ যুক্তিসঙ্গত ছিল। মাত্র ৫.৮৮% উত্তরদাতা মনে করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত দাবী ও দাবীর পক্ষে আন্দোলন যুক্তিসঙ্গত ছিল।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী আন্দোলনের মূল দাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য এদের লাগাতার হরতাল, সংসদ বর্জন এগুলো যুক্তিযুক্ত ছিল কারণ সরকারী দল তখন তাদের এই দাবীর প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করেনি। উপরন্তু সরকারী দল সর্বদাই বলছিল যে, তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বোঝে না এবং এই ধরনের সরকারের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তারা বারংবার এই কথা বলে আসছিল এবং বিরোধী দলগুলির দাবীর প্রতি কর্ণপাত করেনি। যার ফলে তারা বাধ্য হয়ে এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। যদিও এটা সার্বিকভাবে মঙ্গলজনক ছিল না। কিন্তু বাধ্য হয়েছিল দাবী আদায়ে এ ধরনের কর্মসূচী দিতে।

Dhaka University Institutional Repository

এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সঠিক ও কারচুপি বিহীন হবে। এই কথাটি সঠিক কিনা?

বেশীর ভাগ উত্তরদাতা (৫২.৯৪) মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সঠিক ও কারচুপি বিহীন হবে। এর কমসংখ্যক উত্তরদাতা (৪১.১৮%) মনে করেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সঠিক ও কারচুপি বিহীন হবে না। এর সম্ভাব্য উত্তর দিয়েছেন মাত্র ৫.৮৮% ।

বিরোধিতারা পদত্যাগের পর সংসদে অনুষ্ঠিত অধিবেশন গুলি কি বৈধ ছিল?

বিরোধীরা পদত্যাগের পর সংসদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলি বৈধ ছিল না বলে বেশীরভাগ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৬৪.৭১% মনে করেন। অপরদিকে ৩৫.২৯% উত্তরদাতা মনে করেন যে বিরোধীরা পদত্যাগের পর সংসদের অধিবেশনগুলি বৈধ ছিল।

যদি তাদের সংসদ অকার্যকর হয়ে পরে তবে এর জন্য দায়ী কে ছিল?

বেশীরভাগ উত্তরদাতা (৮৭.৩৫%) মনে করেন যে বিরোধী দলের পদত্যাগে সংসদ অকার্যকর হয়ে যায় এবং এর জন্য সরকারী ও বিরোধী দল উভয় দায়ী। ১১.৭৬% উত্তরদাতা সংসদ অকার্যকর হয়ে যাবার জন্য সরকারী দলকে দায়ী করেন। অপরদিকে মাত্র ৫.৮৮% উত্তরদাতা এজন্য বিরোধী দলকে দায়ী করেন।

বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পঞ্চম জাতীয় সংসদে পাশ না করে একটি অগ্রহণযোগ্য ষষ্ঠ সংসদের পাশ করে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে।

অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮২.৩৫%) মনে করেন যে বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পঞ্চম জাতীয় সংসদে পাশ না করে একটি অগ্রহণযোগ্য ষষ্ঠ সংসদে পাশ করে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। ১১.৭৬% উত্তরদাতা মনে মনে করেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল ষষ্ঠ সংসদে পাশ করে অবশিষ্ট কাজ করেছে। মাত্র ৫.৮৮% উত্তরদাতা মনে করেন আংশিক স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কি বৈধ ছিল?

বেশীলভাগ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৭০.৫৯% মনে করেন যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ বৈধ ছিল না। অপরক্ষে কম সংখ্যক উত্তরদাতা অর্থাৎ ২৯.৪১% মনে করেন যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ বৈধ ছিল।

যদি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ অবৈধ হয়ে থাকে তবে ঐ সংসদে পাশকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটিও অবৈধ।

০.৬% উত্তরদাতা মনে করেন যেহেতু ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ অবৈধ তাই উক্ত সংসদে পাশকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটিও অবৈধ। পাশাপাশি প্রায় একই সংখ্যক উত্তরদাতা ৪১.১৮% মনে করেন যে ষষ্ঠ সংসদে পাশকৃত তত্ত্বাবধাকীয় সরকার বিলটি বৈধ এবং বাকী ৫.৮৮% উত্তরদাতা মনে করেন যে প্রশ্নটি প্রযোজ্য নয়।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ অবৈধ ছিল, কারণ নির্বাচন সার্বজনীন ছিল না। এর ফলাফলও ছিল হাস্যকর। কিন্তু ঐ সংসদে তত্ত্বাবধাকীয় সরকারের যে বিল পাশ হয়েছিল তা বৈধ ছিল। কারণ এই দাবীটি সার্বজনীন ছিল এবং বিলটি পাশ করার ব্যাপারে সকল বিরোধী দলগুলোর ঐক্যমত ছিল। ফলে বিলটিকে বৈধ বলা চলে। '৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেয়। এর মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ বিরোধী দল হিসাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেয়নি। বিএনপি সরকারও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেয়নি। যেহেতু ৫ম জাতীয় সংসদে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি সেহেতু ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ছিল নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল তাই এ প্রক্রিয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল বৈধ ছিল।

এছাড়া বিরোধী দলগুলোর পদত্যাগই কি ছিল একমাত্র পথ? এর ওপর জরিপে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাদাতের মধ্যে ৪৪% ইতিবাচক মতামত প্রদান করে এবং ৫৬% নেতিবাচক তথ্য দেন যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

গণসংখ্যা

উত্তরের ধরন	সংসদ সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	১৪	৯	১০	৩৩	৪৪
না	১১	১৬	১৫	৪২	৫৬

আর একটি বিষয় জরিপ করা হয় তা হলো বিরোধী দলগুলোর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কি গণতান্ত্রিক?

গণসংখ্যা

উত্তরের ধরন	সংসদ সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	১৮	১৬	২৩	৫৭	৭৬
না	৭	৯	২	১৮	২৪

অপর একটি জরিপে পাওয়া উত্তরগুলো এ রকম পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলগুলো কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে–

গণসংখ্যা

উত্তরের ধরন	সংসদ সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
সম্পূর্ণ	১	৮	১	১০	১৩.৩৩
অধিকাংশ	৮	৫	৯	২২	২৯.৩৩
আংশিক	১০	৩	১১	২৯	৩৮.৬৬
মোটামুটি	২	৮	৪	৯	১২
মোটেই না	৪	-	-	৪	৫.৩৩
জানি না	০	১	-	-	১.৩৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বিএনপি বা সরকারী দলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এর রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমত পোষণ করেন যে, উন্নত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। "Political development as the political prerequisties of economic development"[32] ১৯৯১ সালে গঠিত দ্বিতীয় সংসদীয় সরকারের পূর্বে দীর্ঘ ২০ বৎসরের ৩টি শাসনামলে (মুজিব, জিয়া ও এরশাদ) গড়ে উঠে নতুন মুনাফাকারী ও লুটেরা শ্রেণী। মুজিব শাসনামলে রাষ্ট্রীয় ও ব্যাংকিং সেক্টর এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহে চোরাকারবারী ও লুটপাট শুরু হলেও জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনামলে তার প্রকটতা বৃদ্ধি পায়। একদিকে এসব মুনাফাকারী শ্রেণী তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স গড়ে তুলে অপরদিকে শাসক শ্রেণীও তাদের সহায়তায় কিছু আমলা, শিল্পপতি ও বুর্জোয়ারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। ফলে অবকাঠামোগত ভাবে কোন উন্নতি হয়নি এবং দেশ চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে যায়। '৯১ জানুয়ারী মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ এবং সাধারণ নির্বাচনের পর নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রী এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ্যে এ কথা স্বীকার করেছেন।

৪.১ কৃষি ব্যবস্থা ঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড গড়ে ওঠে কৃষিকে ভিত্তি করে। অথচ জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কৃষির অবদান ক্রমেই হ্রাসমান। ১৯৮৫-৮৬ সালের যেখানে কৃষির অবদান ছিল ৫২.৪ ভাগ সেখানে ১৯৯০-৯১ সালে ৪৮.৯ ভাগ। খাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষিখাতকে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি। কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ দিন দিন কমেছে। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদ সহ মওকুফ করলেও সমবায়ী কৃষকদের কৃষি ঋণ মওকুফ করেনি। "জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সত্ত্বেও কৃষি খাতে ঋণ দানের হার কমেনি। ৯০-৯১ ও ৯১-

---

[32] Lucian pye, Aspect of Political Development, Little Brown and Company inc boston 1966 P-68.

Dhaka University Institutional Repository

৯২ সালে কৃষিখাতে ঋণদানের হার ছিল যথাক্রমে ৩ ও ৪ ভাগ। অর্থাৎ ৯০-৯১ সালে ৫৯৫ কোটি টাকা এবং ৯১-৯২ সালে ৭৭৪ কোটি টাকা। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বছর গুলিতে কৃষিঋণের পরিমান উক্ত দু'বছরের তুলনায় দেড় থেকে দু'গুণ বেশী ছিল।"

এই সময়ে চাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায় এবং সার সংকট সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সার সংকট সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন খরব প্রকাশিত হয়। ২৩শে মার্চ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রতি বস্তা ইউরিয়া সার ১১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। একই তারিখে নওগাঁ ও তার আশে পাশের এলাকায় প্রতি বস্তা সার ১০০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অথচ ২১শে মার্চ সারের দাম ছিল ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ ১৯৯১-৯৫ সালের বিভিন্ন সময়ে ১২ হাজার টন ইউরিয়া সার ভূয়া কাগজ পত্রের মাধ্যমে মিলের বাইরে পাচার করা হয়।

৪.২ শিল্প ব্যবস্থা ঃ

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরই শিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করে ২২শে জুলাই ৯১ জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে বেরিয়ে এসেছে যে, সরকারী ব্যাংকের ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের সম্পদ পাচার করে বেসরকারী ব্যাংক গড়ে উঠেছে।

বিএনপি সরকারের আমলে প্রায় ৪ হাজার শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সরকার বিভিন্ন সময়ে ৫৮টি বৃহত্তর শিল্প এবং ১৪টি বৃহৎ শিল্পের ৪৯% মালিকানা বিক্রি করেছে। সরকারের এই শিল্প বিরোধী নীতির ফলে বেসরকারী পর্যায়ে ২৬০টি ছোট বড় শিল্প কারখানা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। একটি সময়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ১৫ শতাধিক শিল্প কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সূত্র জানায় ৫ বৎসরে বিএনপি সরকারের বিক্রি করা সরকারী বৃহত্তর শিল্পগুলির মধ্যে ১৩টি পাট, সুতা কল ১৮টি ও অন্যান্য শিল্প ২৩টি। এই ৫৮টি বৃহত্তর শিল্পের যাবতীয় সম্পদ ও সম্পত্তির মূল্য হবে ১৬শ কোটি টাকা, পনির মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে ৫৮০ কোটি টাকা। বিক্রিত সম্পত্তি থেকে সরকার

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যন্ত পেয়েছে মাত্র ২৭০ কোটি টাকা। বাকি ৩১০ কোটি টাকা ক্রেতারা এখনো পরিশোধ করেনি। এই বিপুল অংকের সরকারী শিল্প কারখানা ও সম্পদ যাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ বিএনপি'র মন্ত্রীবর্গ ও নেতাদের আত্মীয় স্বজন।

দেশে ক্রমাগত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মুজাফফর আহমদের মতে শিল্পায়নের গতি নেই বলে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ টাকা পড়ে আছে এবং অর্থনৈতিক তৎপরতা নেই বলে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ এত কম। মুদ্রাস্ফীতির রোধে বিএনপি সরকার ১ম ৩ বৎসর সাফল্য দেখালেও ৪র্থ বৎসরেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিএনপি আমলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাট ও বস্ত্র শিল্প। ২৯শে আগস্ট, ৯৩ সরকার বাংলাদেশ পাট শিল্প অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমের বিশ্ব ব্যাংকের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, এই কারণ দেখিয়ে এর বিলুপ্তি ঘোষণা করে।

এই সময়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইলস মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি) ৫৩০ কোটি ৩৪ লাখ ৩৯ হাজার টাকা লোকসান দেয়। সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। হিসাব অনুযায়ী সংস্থা ২৩ বৎসরে লোকসান দিয়েছে ৭৪ হাজার ৪৪ কোটি ৮৫ লাখ ২৩ হাজার টাকা। অর্থাৎ বিএনপি সরকারে শাসন আমলের পূর্বে ১৮ বছর সংস্থা গড়ে লোকসান দিয়েছে ১৪ কোটি ৬০ লাখ ৮৪ হাজার টাকা।

দেশ স্বাধীন হবার পর সংস্থা ৪১টি শিল্প নিয়ে থানা শুরু করে। বিএনপি আমলে মিলগুলি রেকর্ড পরিমাণ লোকসান দেয়ায় সরকার ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে ১০টি এবং ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ১টি মোট ১১টি লে-অফ ঘোষণা করে পরবর্তীতে পানির দামে ব্যক্তি মালিকানার হস্তান্তরিত করে। ফলে ১০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এরপর আরও ১১ হাজার শ্রমিক ছাটাই করা হয়। তাতে তাদের পরিবার পথে বসে যায়। বিটিএমসির অব্যাহত লোকসানের জন্য ওয়াকিবহাল সংশ্লিষ্ট মহল প্রচলিত সরকারের বিকল্প নীতিকে দায়ী করে থাকেন। উক্ত মহল একই মাসে মিলের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) মতে বিএনপি সরকারের আমলে যে পরিমান প্রকল্প সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র এক চতুর্বিংশ ব্যয় করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সংক্রান্ত বিভাগের সূত্রে জানা যায় যে ১৯৯১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৫ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ৪ বছর ৩ মাসে বিশ্বব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৪ হাজার ৯১৪ কোটি ৫৮ লাখ ৩০ হাজার টাকা-এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৭০ কোটি ৩৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিএনপি সরকার ১৯৯১ সালের ২৫শে জানুয়ারী ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহারে খালখনন কর্মসূচী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন শতকরা ৭৫ ভাগ স্বেচ্ছাশ্রমে এবং বাকিটা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় শুরু করেন। সমাজের বিভিন্ন স্ত রের মানুষ ঐ স্বেচ্ছাশ্রম কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে সেই কাজে সফল হয়েছিল। খালেদা জিয়া সরকার এই কাজে তেমন সফল হতে পারেনি। বরং খাল খনন কর্মসূচীর নামে খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা, যেটি ছিল রাষ্ট্রের একটি বিরাট অপচয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকার এই ব্যর্থতার কথা স্পীকার করে এমপিদের কাছে লেখা চিঠিতে বলেন যে, "বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে স্বেচ্ছাশ্রমের অংশ কমিয়ে শতকরা ৫০ ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বিগত বছরে এই কর্মসূচীতে সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরা সম্ভব হয়নি। জন প্রতিনিধিদের সহযোগিতা ছাড়া খাল খনন কর্মসূচী সফল করা সম্ভব নয়। খাল খনন কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক। গণজারণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে আপনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন এবং আপনার সক্রিয় সহযোগিতায় আপনার এলাকায় এই কর্মসূচী সফল হবে।

বিএনপি খালকাটা কর্মসূচির জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্যের সংস্থান করে বেকার সমস্যার সমাধান করলেও দারিদ্র দূরীভূত হয়নি বরং এজন্য রাষ্ট্রের অনেক অর্থ অপচয় হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী প্রচুর টাকা খরচ করে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। অথচ ঐ কাজ একজন ডিসি এসপি বা চেয়ারম্যান ও করতে পারতো।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপির ৫ বৎসরে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। ঋণ প্রবৃদ্ধি স্পীকার হয়ে আর্থিক খাত এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। কলমানি মার্কেটিং ব্যাংক রেট ২০-২৫ শতাংশে উঠেছে। ভুয়া কাগজপত্র ও নামে বেনামে ঋণ নেওয়ার ঘটনা এরশাদ আমলের চেয়ে বেশী ঘটেছে। এরশাদের ৮১-৮২ অর্থ বছর থেকে ৯০-৯১ অর্থ বছর পর্যন্ত ১০ বছরে ঋণ স্থিতিশীল ছিল ২৪ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা। আর্থিক ঋণ প্রবৃদ্ধির পরিমান ছিল ২০ হাজার ৬শ ২০ কোটি টাকা। অপরদিকে ৯১-৯২ অর্থ বছর থেকে ৯৪-৯৫ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪ বছরে ঋণ স্থিতি ২৪ হাজার ৪শ ৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৯ হাজার কোটি টাকা। আলোচ্য ৫ বছরে ঋণ প্রবৃদ্ধির পরিমান ১৪ হাজার ৫শ ২৫ কোটি টাকা। পরবর্তী ৯৫-৯৬ অর্থ বছরের শুরু থেকে বিদায়ের আগ পর্যন্ত এ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৩৫০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিএনপির ৫ বছরে ১৮ হাজার কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু শিল্পায়নে তার ছাপ পাওয়া যায়নি। ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর খাতা কলমে ঐ পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা কোথায় কিভাবে ব্যয় হয়েছে, রিটান কি এসব হিসাব কমই আছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। বিতরণকৃত ঋণের সিংহ ভাগই ব্যাংক তহবিলে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। '৯১ সালে ক্ষমতায় এসে সরকারের অর্থমন্ত্রী এরশাদের শাসন আমলে ব্যাংকিং খাতে লোপাটের বিরুদ্ধে হুংকার দেন। ঋণ খেলাপীদের নামের তালিকা প্রকাশ করে পত্রিকায়। আইন কানুন কঠোর করা হয়। অর্থ ঋণ আদালতও গঠন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ করা হয় নাই।

বিএনপি সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণে '৯৪-৯৫ অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করে ২০ কোটি টাকা কিন্তু সংশোধিত বাজেটে তা দাঁড়ায় মাত্র ৫ কোটিতে। বিশেষজ্ঞদের মতে বেগম জিয়ার ডাল ভাতের প্রতিশ্রুতি পুরণ করতে হলে প্রবৃদ্ধির হার করতে হবে ৯ শতাংশ এবং জাতীয় আয়ের ৩৬% করতে হবে বিনিয়োগ। বেকারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটির উপরে। তাদের কর্মসংস্থানের তেমন কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। বরং গোল্ডেন হ্যান্ড শেকের নামে ৩৫টি পাটকলের ১ লাখ শ্রমিককে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয় অতিরিক্ত এই অজুহাতে। এই শ্রমিক ছাঁটাই এর প্রভাব পড়ছে অর্থনীতির "Asia development outlook (ADO) '৯২ তে বলা হয়েছে Enormous national

Dhaka University Institutional Repository

economic loss in terms of economic opportunities forgone due to lengthy delays interm of economic decisions in project implementation" রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দলীয় কোন্দলের জন্য ৫ম সংসদের প্রথম দিকে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয়। "Try as it midht the government of prime minister Begum Khalada Zia is still struggling to boost investment, analysis blame this partly on appartment lack of policy coordination, pointing to contradictions with in verious ministers on ts measues, trade reforms, export incentives an cuthas in public sector enterprieses" ১৮ই জানুয়ারি ৯৩ ঢাকায় দেশী বিদেশী বিনিয়োগ কারীদের উপস্থিতিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম ডি মাইলাম বলেন যে Investment policies are still not conbucive to domestic investment not to mention of foreign investment তার মতে এই বিনিয়োগের প্রধান প্রতিবন্ধকতা আমলাতন্ত্র ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি।[৩৩]

৪.৩ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

বিএনপি সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন না আনতে পারলেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং মেয়েদের জন্য এই শিক্ষা ফ্রি করা হয়। প্রাইমারী পর্যন্ত খাতা কলম স্কুল থেকে দেবার ব্যবস্থা করা। "বিআইডিএস এর ১৯৯৫ সালে ৬২টি গ্রাম পুনঃজরিপ তথ্যে জানা যায় যে, ১৯৯০-৯৫ সালে ৬-১০ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ৫৬ থেকে ৭০ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্র ছাত্রীর বৈষম্যের হার ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৫ সালে নেই বললেই চলে। অবশ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ততটা বাড়েনি, যা মাত্র ২% ধরা যায়। ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি এ পর্যায়ে পূর্বের মতই ব্যাপক।"[৩৪]

দ্বিতীয় সংসদীয় সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় করা হয় এবং প্রতিটি বাজেটে এখাতে বেশী ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা লাভবান হয় নাই। কেননা ক্যাডেট কলেজ গুলিতে ও মাদ্রাসা

---

33 আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, গণতন্ত্র ও নেতৃত্ব ও উন্নয়ন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষায় ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির যে কথা আগে বলা হতো এবং বিএনপি সরকারও সেই কথা বলছে, তা মূলত ব্যয় হয়েছে একদিকে ধর্মশিক্ষা অপরদিকে ক্যাডেট কলেজ, মডেল কলেজ ইত্যাদির খাতে। মাদ্রাসা মসজিদ ইত্যাদির সংখ্যা স্বাধীনতার পর থেকে বৃদ্ধি পাচেছ এবং এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি চলছে। এতে আধুনিক কারিগরি বা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বিকাশে গুরুত্ব রাখে না। বর্তমানে ছাত্র শিবির ও জামাতে ইসলামীর যে শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে তার মুলে আছে শিক্ষাখাতে সরকারের এই ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি। এই ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক জীবনের এবং গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার বিকাশের সাথে সম্পর্কিত ভাবে কোন শিক্ষার বিস্তার ঘটে না এবং এই পরিস্থিতিতে দেশের জনগণ সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও লাভবান হন ধনীক শ্রেণীর লোকেরা এবং তাদের আন্ত র্জাতিক রক্ষক সাম্রাজ্যবাদ।" বিশ্বব্যাংকের মতে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ করা হলেও এই খাতে সেবার মান বাড়েনি। শিক্ষা খাতের সমীক্ষায় বলা হয়েছে ৫ শতাংশ শিক্ষকই অনুপস্থিত থাকেন এবং ১০০ জনের উপস্থিত থাকেন ১ জন শিক্ষক, এই সময় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কমেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাস দূর করার জন্য সংসদে প্রস্তাব আনার পর সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয় সরকারী দলের তালিকা বিরোধী দল তৈরি করবে আর বিরোধী দলের তালিকা সরকারী দল তৈরি করবে। এই প্রস্তাবের পর সেই কমিটিকে আর কাজ করতে দেওয়া হয় নাই।

৪.৪ গোলাম আযম প্রসঙ্গ ঃ

১৯৯১ সালে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রশ্ন রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে তোলে। ১৯৯১ সালের ২৯শে নভেম্বর গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামী দলের আমীর নির্বাচিত করা হয়। তবে তিনি প্রায় একযুগ ধরে জামাতে ইসলামীর অঘোষিত আমীর ছিলেন। এই প্রথম তিনি ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। এক মাত্র জামাতে ইসলামী বাদে সবগুলি বিরোধী রাজনৈতিক দল গোলাম আযমের বিচাররে দাবীতে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। আওয়ামী লীগ আর পক্ষ

---

[34] ১-৩-১৯৯৪ তারিখে সংসদে প্রশ্নোত্তর দানকালে শিক্ষামন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে। দৈনিক সংবাদ, ২রা মার্চ, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বলা হয় যে, গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিস্কার না করে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধীর অভিযোগে বিচার করতে হবে। আওয়ামী লীগে দুজন সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাক– গোলাম আজমকে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, গণহত্যা, বুদ্ধিজীবি হত্যা, নারী ধর্ষণ এবং স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সংগঠক হিসাবে অভিযুক্ত করে বলেন, 'তিনি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বের দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে জামাতের সংসদ সদস্য শেখ আনসার আলী বলেন, "গোলাম আজমকে আমীর পদে নির্বাচন করে জামাত কোন ভুল করে নাই।"[৩৫]

৪.৫ ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ঃ

বেশীর ভাগ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতার ভৌগলিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে নিকটতম রাষ্ট্র বা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আচরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের চতুপার্শ্ব ভারতের অবস্থান হওয়ায় ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ ইস্যু হিসাবে দেখা দেয়।

১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার বিএনপি যেহেতু এর প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও নীতির উপর গড়ে উঠে তাই জিয়া অনুসৃত বৈদেশিক নীতি তারা অনুসরণ করে। নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এএসএম মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেছিলেন যে বর্তমান বিএনপি সরকার জিয়াউর রহমান সরকার অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবে। ১৯৭৫ সালের পর জেনারেল জিয়া রাজনীতিতে এসে মুজিব অনুসৃত বৈদেশিক নীতির ব্যাপক পরিবর্তন করেন। এ সময় ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতি দেখা দেয়। এটা হয়তো জেনারেল জিয়া কর্তৃক বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেবার জন্য ও সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজনের জন্য। "Mujibs foreign policy ..... sutied India" becuse it was in conformity with one fo the mjaor thrusts of India's foreign policy in the

35 শাহরিয়ার কবির, গণআদালতের পটভূমি, দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

South Asian region..... Zia on the other hand atleast innitailly, was anti Indian as he declared his determination not to "accept expansionism and hegemony"., একইভাবে বেগম জিয়ার সময়েও ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি হয়। তবে খালেদা জিয়া ভারতের সাথে মুজিব আমলের মতো হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক না হলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। যার জন্য তিনি ক্ষমতায় এসেই ২৪শে মে ১৯৯১ রাজীব গান্ধীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নয়াদিল্লী যান। এরপর ১৯৯২ সালের মে মাসে পুনরায় ভারতে যান দুদেশের কূটনেতিক সম্পর্ক জোড়দার করার জন্য।

আলোচিত সময় কালে ক্ষমতাসীন বিএনপি ভারতের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা হলো (১) তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তর (২) অবৈধ অভিবাসী হস্তান্তর (৩) বাণিজ্য চুক্তি প্রভৃতি। এছাড়াও ফারাক্কা বাধের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জিয়া জাতিসংঘ ভাষণ দেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন বাস্তব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না। অপরপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্মরণার্থী ইস্যু ভারতের সৃষ্টি এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মহল বিশষ করে বিএনপির মধ্য থেকেও কথা উঠে। যদিও এ ব্যাপারে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। আন্তসীমান্ত চোরাচালন, বাণিজ্য ঘাটতি প্রভৃতি বিষয়ও বাংলাদেশের রাজনীতিতেও ভারতের অবস্থানকে একটি বিতর্কিত অথচ অপহিরার্য ইস্যুতে পরিণত করে।

৫ বৎসরের শাসন আমলে অবৈধ মাল পাচারের এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটে। এছাড়া এ সময় ভারতে নারী শিশু পাচারের ঘটনা ঘটে। ১৯৯৩ এর প্রথম তিন মাসে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে পুলিশ ও বিডিআর পাঁচ শতাধিক শিশু কিশোরকে উদ্ধার করেছে। এদের সকলকে ভারত অথবা ভারতের অন্য কোথাও পাচার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই সময় চোরাই পথে আসা ভারতীয় ছাপা শাড়ীতে দেশের বাজার দখল করে। প্রতি বৎসর ৬ কোটি পিস ভারতীয় শাড়ী বাংলাদেশে এসেছে। সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও আমদানীকৃত মালামালের উপর অধিক শুল্ক ভ্যাট আরোপের ফলে দেশের ছাপা শাড়ী বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকেনি। এর ফলে ৯০ ভাগ দেশী কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লোকসান দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ঃ

দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর ১৯৯১ সালে সামরিক শাসনের অবসান হয়ে আর একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সকলের প্রত্যাশা ছিল যে পার্বত্য সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান হবে। এই সময়ে অলি কমিটি ও মেনন কমিটির মাধ্যমে মোট ১৩টি বৈঠক হয় এই সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু এই বৈঠকগুলি আলোচনার মধ্যে সীমিত ছিল, কোন সমাধান দেওয়া হয় নাই। শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতীয় কোঠা প্রবর্তন করা হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলকার জন্য তারা বৈষম্যের স্বীকার হয়েছে। শেখ মুজিব আমলের সময়ে উপজাতিদের সংসদে প্রতিনিধিতড়র ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া সরকারের সময় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পার্বত্যবাসীদের কোন প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়নি। সামরিক বাহিনীতে কমিশন পদে কোন উপজাতীয়কে নিয়োগদান করা হয়নি। উপরন্তু যোগ্যতা সম্পন্ন কোন পাহাড়ীকে জেলা প্রশাসন পদে নিয়োগ করা হয়নি। ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অলিখিত বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়।

৪.৭ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঃ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও একটি সুশৃঙ্খল জাতি হিসাবে আজও গড়ে উঠতে পারেনি, পারেনি সমাজে আইনের শাসন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন করতে। সরকার এসেছে আবার চলে গেছে। পুনরায় আর এক সরকার এসেছে। এবাবে ক্ষমতার বহু হাত বদল হয়েছে। কিন্তু কোন সরকারই এ ইক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেনি বরং অসৎ ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেদের স্বার্থে সমাজে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসকে লালন করছে। ১৯৯১ সালে গঠিত ২য় সংসদীয় সরকারও এর ব্যতিক্রম ছিল না। In the face of escalating social and economic problems the failures of our civil leaders to act with urgency could progressively undermine our enfeebled democratic structures and put the polity into a phase of mounting anarchy manifastion of which are only to evident today in the progressive degeneration in the state of law and order in civil society.[36]

---

[36] Dr. Nazrul Islam, Ibid, Page 8/9.

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী ও বিরোধী দলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ৫ম জাতীয় সংসদকে কার্যকর করে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রক্রিয়া দরকার তা থেকে অনভিজ্ঞতা প্রসূত পদক্ষেপের দ্বারা প্রতিনিয়তই ব্যাহত হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখ করা যেতে পারে। সরকার ও বিরোধী দলের সমন্বিত প্রচেষ্টা, যা জাতীয় সংসদের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব, যা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তার পরিবর্তে বিভিন্ন দমন মূলক আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টার দ্বারা সরকার একক ভাবেই সন্ত্রাস দমনে ব্রতী হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সন্ত্রাস দমন আইন ১৯৯২ এর কথা উল্লেখ করা যায়। অপরপক্ষে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের বহুল আকাঙ্ক্ষিত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স রদের জন্য প্রয়োজনীয় সংসদীয় প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়ে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ বিলম্বিত করেছে।

সন্ত্রাস দমন বিল '৯২ ঃ

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে ক্ষমতাবলে সন্ত্রাস দমন বিল নামে এক অধ্যাদেশ জারি করেন এবং ঐ তারিখ হতেই অধ্যাদেশটি কার্যকর ও বলবৎ করা হয়। অধ্যাদেশটি প্রকাশিত হবার পরই একমাত্র বিএনপি বাদে সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী সহ সকল পেশাজীবী ছাত্র সংগঠন এর তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা করে। বিরোধী নেত্রী হাসিনা এই অধ্যাদেশের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, "বিরোধী দলকে দমন করার জন্যই বিএনপি সরকার জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে নৈরাজ্য মূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ জারী করেছে। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর স্টান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "যেখানে প্রচলিত আইনে অপরাধী ও সন্ত্রাস দমন সম্ভব সেখানে জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে এ ধরনের বিশেষ অধ্যাদেশ জারী অর্থ হলো বিশেষ ক্ষমতা আইনের চেয়েও নিকৃষ্টতম অধ্যাদেশের অক্টোপাশে দেশ ও জাতিকে আবদ্ধ করা। প্রকৃতপক্ষে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে দুর্নীতি ক্ষমতাসীন দলের তাবেদারী থেকে মুক্ত করা গেলেই প্রচলিত ফৌজদারী আইনেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব।"

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় যাবার পূর্বের সকল অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী অধ্যাদেশ গুলি বাতিল না করে বরং জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে অতি জরুরী বিত্তিতে ৯২ এর ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে সন্ত্রাস দমন অধ্যদেশটি জারী করে জঘন্যতম একটি কাজ করেছে। অধ্যাদেশ জরুরী ভিত্তিতে জারী করার পর ২৭শে সেপ্টেম্বর ৯২ তারিখে সংসদে অনুমোধনের জন্য পেশ করে। অর্থ্যাৎ অধ্যাদেশ আগে জারী করা হয়, পরে সংসদে উস্থাপন করা হয়, যেটি সংসদীয় রীতি সম্মত ছিলনা। বিলটি তারা প্রথমেই (অধ্যাদেশ জারী পূর্বে) সংসদে প্রস্তাব আকারে উপস্থাপন করতে পারতো, অধ্যাদেশ জারী করার পর আইনে পরিনত করার জন্য সংসদে উস্থাপন করা হয় এবং অন্যান্য দলগুলি এতে বাধ সাধলে সরকারী দর ১৯শে নভেম্বর ৯২ নিজেদের কণ্ঠভোটে বিলটি পাশ করিয়ে নেয়। এতে করে সরকারী দলের স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সন্ত্রাস দমনের জন্য দলগুলির সদিচ্ছাই যথেষ্ট ছিল। বড় দলগুলি সন্ত্রাসীদের লালন করে এবং তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়। সরকার যদি মনে করে থাকে যে সন্ত্রাস দমনের জন্য কঠোর আইনের প্রয়োজন তাহলে তাদের যুক্তিকে মেনে নেওয়া যায় এই অর্থে যে সমাজের অশুভ শক্তিকে দূর করার জন্য একমাত্র কঠোর আইনও তার প্রয়োগেই সম্ভব। এর প্রমান পাওয়া যায় এসিড নিক্ষেপের ঘটনায়। এক সময় দেশে এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন আইন হরা হলো যে এর জন্য মৃত্যু দন্ড পর্যন্ত সাজা ভোগ করতে হবে তখন থেকেই এর প্রবনতা কমে যায়।

কিন্তু সন্ত্রাস দমনের জন্য বিএনপির সন্ত্রাস দমন বিলটি প্রনয়নের প্রক্রিয়া যেমন সাঠক ছিলনা তেমনি প্রয়োগেও স্বৈরাচারী নীতি অবলম্বন করে। বিরোধীদের মতে এই আইনটি কেবল তাদের উপর প্রয়োগ হয়েছিল। কিন্তু বিরোধীদের দমন করার জন্যই এই আইনটি প্রয়োগকরা হয়। ১লা জুলাই ৯৪ বাংলাদেশ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয় "বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের শত শত সমালোচক ও বিরোধীকে আটক করা হয়েছে।পুলিশী হেফাজতে নির্যাতনের ফলে কমপক্ষে ৪ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেছে। সরকার বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হাজার হাজার লোক আহত হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে শত শত লোক। সেপ্টেম্বর নাগাদ নিরাপত্তা বাহিনী ও

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদের সংঘর্ষে ৩০ জনের বেশী ছাত্র নিহত হয়েছে। ৩২,২৫০ জন আহত হয়েছে। সাবেক সরকারের সদস্যদের বৈঠক অব্যাহত রয়েছে। দুর্নীতির দায়ে সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল মমতাজ উদ্দিন আহম্মদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জুনে আইন মন্ত্রী আইন সংস্কারের জন্য আইন কমিশন গঠনের ঘোষণা দেয়, কিন্তু বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা গঠন করা হয়নি। যার জন্য দেখা যায় যে, যে উদ্দেশ্যে আইনটি প্রণীত হয় হিতে তার বিপরীত হয় অর্থাৎ সন্ত্রাস কমেনি বরং আরো বৃদ্ধি পায়। ৯৪ সালে অনুষ্ঠিত দুটি উপনির্বাচনে (মিরপুর ও মাগুরা) ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতা এর প্রমাণ বহন করে। ১৯৯৫ সালে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনায় ১৩ জন ছাত্র নিহত হয়। এর মধ্যে রয়েছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্র, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, আভ্যন্তরীন কোন্দল, রাজনৈতিক মতবিরোধ, চাঁদা ও টেন্ডার সম্পর্কিত বিরোধ এবং ছাত্রাবাসে হামলা ও সিট দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সন্ত্রাসী ঘটনায় প্রাণ হারাতে হয় এসব ছাত্রকে। কয়েকটি মামলার তদন্ত ভার পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার হাতে দেয়া হলেও তথ্যানুসন্ধান দেখা গেছে তদন্ত কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি। কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হলেও পরবর্তী পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে।[৩৭]

সমাজে সন্ত্রাস দমন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কঠোর আইনের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাস দমন আইন ছিল সঠিক। কারণ যে সব সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য এই আইনটি তৈরি হয়েছিল সেগুলি দমন করা ছিল খুবই জরুরী। সন্ত্রাস দমন বিলের ২নং ধারায় এর ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে হয়েছে। যা ইচ্ছা তাই করাকেই গণতান্ত্রিক অধিকার বলা যায় না। চাঁদা বাজি করা, নারী নির্যাতন করা, হরতালের নামে যানবাহনের ক্ষতি করা, ভাংচুর করা, অবরোধ সৃষ্টি করা, জনগণকে হয়রানি করা প্রভৃতি হলো স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। বরং এখানে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বিপন্ন করা হয়। তবে এই আইনটি সকলের মতামতের ভিত্তিতে পাশ করা উচিত ছিল। এতে কিছু অগণতান্ত্রিক বিধি বিধান এর সংযোজন করা হয়েছিল, যেগুলি পরিবর্তনের কথা বিরোধীদলগুলি বলেছিল। কিন্তু তার কোন পরিবর্তন না করে সংসদে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করিয়ে

---

[37] সাপ্তাহিক জনমত, লন্ডন, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

নেয়। সন্ত্রাস দমন বিলের মাধ্যমে যে বিচার ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয় সেটি সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। যেমন প্রত্যেক জেলায় একটি ট্রাইব্যুনাল থাকবে যেখানে সরকার কর্তৃক বিচারক নিযুক্ত হবেন। অর্থাৎ এখানে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা হরন করা হয়। অথচ আইনের শাসন ও সন্ত্রাস দমনের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা। এছাড়া বিধিতে আছে যে, সরকার প্রয়োজন বোধে একজন সেসন জজ কে অতিরিক্ত সেসন জজের দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে কোন ট্রাইব্যুনালে বিচারক নিযুক্ত করতে পারবেন। এতে প্রমানিত সরকার সন্ত্রাস দমন বিলের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেন তাদের দমন করার ব্যবস্থা করে। এতে করে সরকারের স্বেচ্ছাচারের পথ সুগম হয়। সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল না করে দুই বৎসরের মাথায় আর একটি অধ্যাদেশ জারী করে যেটি ছিল সকলের কাছে অপ্রত্যাশিত। দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পর প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় সরকার কেবল কাঠামোগতভাবেই গণতান্ত্রিক ছিল কিন্তু কার্যকারিতার দিক থেকে ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনই অগণতান্ত্রিক রীতিনীতির মাধ্যমে চলতে পারে না। ১৯৯২ সরলের ৬ই নভেম্বর সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ৯৪ পর্যন্ত এই আইনের অধীনে ১৩৯৪টি মামলা হয়েছে। ৩৯২টি মামলার মোট ২৬০৭ জন আসামী খালাস পেয়েছে।

পুলিশের হিসাবে সাল ভিত্তিক অপরাধের সংখ্যা হলোঃ

১৯৯১ সালে ৭৮,০১০টি

১৯৯২ সালে ৭৮,২১৭টি

১৯৯৩ সালে ৭৯,১০১টি

১৯৯৪ সালে ৭৯,৪০৯টি

১৯৯৫ সালে ৮০,০০৫টি

১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২১১০৪টি

উপরের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, অপরাধের সংখ্যা পূর্বেল তুলনায় পরবর্তী ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। খালেদা জিয়ার ৫ বৎসরের শাসন আমলের অপরাধ সংগঠিত হয়েছে ৪ লাখ ১৬ হাজার ৮শ ৩৬টি। এর মধ্যে খুন হয়েছে ১৩ হাজার ২শ ৭৬ জন, রাজনৈতিক হত্যাকান্ড হয়েছে ১ হাজার জনের বেশী। ডাকাতি ছিনতাই হয়েছে ১০ হাজার ৪০২টি। দাঙ্গা হাঙ্গামা রাহাজানি ৪০ হাজার। সন্ত্রাস দমন আইনে নারী নির্যাতনের জন্য বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। অথচ এই আইন পাশের পর নারী নির্যাতন আরও বৃদ্ধি পায়। নিম্নে পরিসংখ্যানে হিসাব দেওয়া হলো ঃ

১৯৯৩ সালে দেশে ৮৪০ জন নারী নির্যাতনের শিকার হন

১৯৯৪ সালে দেশে ১২৪০ জন নারী নির্যাতনের শিকার হন

১৯৯৩ সালে দেশে ২২৭ জন নারী ও শিশুর শ্লীলতাহানি ঘটে

১৯৯৪ সালে দেশে ৩৩০ জন নারী ও শিশুর শ্লীলতাহানি ঘটে

১৯৯১ সালে নারী ও শিশু অপহরণ ও পাচারের সংখ্যা ৫২ জন

১৯৯২ সালে নারী ও শিশু অপহরণ ও পাচারের সংখ্যা ৩৪১

১৯৯৩ সালে নারী ও শিশু অপহরণ ও পাচারের সংখ্যা ৩০০ জন

১৯৯৪ সালে নারী ও শিশু অপহরণ ও পাচারের সংখ্যা ৩১৯ জন।

১৯৯৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ৫২৩টি ধর্ষনের ঘটনা ঘটে এবং ২ হাজার ২৯টি নারী নির্যাতনের মামলা দায়ের করা হয়। এর সংখ্যা ১৯৯৪ সালের চেয়ে ৫শ বেশী। বিএনপি আমলে ৪ বৎসরে বিভিন্ন সংঘর্ষে কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাধিকবারসহ প্রায় ৫০০ বার নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট চাপের জন্য বন্ধ ছিল। ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রায় ১০০ বার। ১৯৯ সেপ্টেম্বর ৯৩ ছাত্র শিবিরের ঘাতকরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ঘুমন্ত ছাত্রদের হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয়। ঘটনা স্থলেই একজন ছাত্র মারা যায়। এ সময় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ৯৫ এর এমএ পরীক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী না পাওয়ায় ১৪ই অক্টোবর ৯৫, একদল ছাত্র নিয়ে গিয়ে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ব্যাপক ভাংচুর করে। ২৬শে নভেম্বর ১৯৯৫ চট্টগ্রাম বিআইটি দখলের জন্য সশস্ত্র অভিযান চালানোর সময় পুলিশ ছাত্রদের ৫ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমান অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বিআইটি ছাত্র সংসদের ভি.পি. মেজবাউদ্দিন আহমেদ, সাবেক জি.এস. নিয়ামত হাসান মুকুল, বিআইটি ছাত্র দলের সভাপতি মমতাজুল ইসলাম টুকু, সদ্য ছাত্রদলে যোগদানকারী জাহাঙ্গীরুল ইসলাম ও বহিরাগত সন্ত্রাসী পুসকিন। তাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিল থ্রিনট থ্রি রাইফেল ১টি, রিভলবারের গুলি ৪৬ রাউন্ড, বন্ধুকের গুলি ৩৫ রাউন্ড, এসএমজি ম্যাগনিজ ১টি ৭ই ডিসেম্বর ভোর রাতে ছাত্রদলের কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল হতে ছাত্র

Dhaka University Institutional Repository

লীগের কর্মীদের মারধোর করে বের করে দিয়ে দখল নিয়েছে। তারা কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর ও টাকা লুট করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এই বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যায় যে, বিএনপি আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সর্বত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সন্ত্রাসী হলো ছাত্রনামধারী বহিরাগত বেকার যুবক যারেদ রিজার্ভ সোলজার হিসাবে ব্যবহার করেছে প্রতিষ্ঠিত দলগুলি। এই সন্ত্রাসের জন্য কম বেশী প্রত্যেকটি দলই দায়ী ছিল। ড. মিলন হত্যাকারী অভি-নিরু গোষ্ঠীকে বিএনপি বহিস্কার করলেও আওয়ামী লীগ তাদের দরীয় সংগঠনে আশ্রয় দিয়েছে। এরা সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মাঝে মধ্যে দলীয় শৃঙ্খলার অভিযোগে তাদের দলের নেতাকর্মীদের বহিস্কার করে কিন্তু দলীয় সন্ত্রাসী বা আর্মস ক্যাডারদের বহিস্কারের ব্যাপারে তাদের যত বাধা ছিল। এই সন্ত্রাস বন্ধে সংসদে অনেক উত্তপ্ত আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক হয় এবং এ ব্যাপারে একটি সংসদীয় কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু নিজস্ব দলীয় ছাত্র সংগঠনের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কেউই পদক্ষেপ নিতে রাজী নয় বলে ঐ কমিটি কোন ঐক্যমতে পৌছাতে ব্যর্থ হয়।

বিএনপি আমলে সংবিধান নির্দেশিত পথে নয় বরং হরতাল, অবরোধের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খোজায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দারুন অবনতি হয়। এই সময় হরতালের রেকর্ড পূর্বের সকল রেকর্ডকে ভঙ্গ করে। একনাগারে ১৯০ ঘণ্টা পর্যন্ত হরতাল করা হয়। হরতাল মানেই রেল লাইন উপড়ে ফেলা, গাড়ী ভাংচুর করা, অফিস আদালতে হামলা ও আতংক সৃষ্টি করা। তাই হরতাল ভয়তালে পরিণত হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নয় বাধ্য হয়েই মানুষ হরতাল পালন করে।

অর্থাৎ কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফলকে সরকারী দলের অনুকূলে নেওয়া হয়। ১লা জানুয়ারী ১৯৯৩ মিরপুর উপনির্বাচন ও পৌরসভা নির্বাচন নিয়ে জাতীয় সংসদে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ও উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। এ প্রসঙ্গে বির্তকের সূত্রপাত করেন আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ। তিনি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। মিরপুর উপনির্বাচনের আগে এই

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় ১৫০টি মসজিদের প্রত্যেকটির জন্য সারে ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জাতীয় পার্টির নেতা এবং বিএনপি প্রার্থীর বাবা এমএ খালেক মসজিদে এই চেক বিলি করেছেন। তোফায়েল সাহেব আরো বলেন, মিরপুরের নির্বাচনে বিএনপি সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। এরশাদ যেভাবে নির্বাচন করেছে বিএনপি সেভাবেই নির্বাচন করেছে।

মিরপুর উপনির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ৬ ও ১০ই ফেব্রুয়ারী সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। এই নির্বাচনে ১৪ মাস পর ২০শে মার্চ ১৯৯৪ মাগুরা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সরকার মনে করেছিল মাগুরা উপনির্বাচনে পরাজিত হলে তারা জনগণের আস্থা হারাবে এবং এতে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুতি হবে। তাই এই উপনির্বাচনে বিজয়ের প্রশ্ন তাদের কাছে জীবন মরণ সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। এতে বিএনপি সরকার স্বৈরাচারী স্টাইলে যেভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় তাতে তাদের মুখোস জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়। মাগুরা উপনির্বাচনটি ছিল বিরোধী দলের চোখের সামনে প্রধানমন্ত্রী সহ ক্ষমতাসীন বিএনপির মন্ত্রী, এমপি, প্রশাসন, পুলিশ, বাহিনী, সর্বহারা পার্টির, সশস্ত্র ক্যাডার মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের এক যৌথ অভিযান। অভিযানের লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে জয়ী হওয়া, যার ফলাফল সম্পর্কে বিএনপি ঢাকা থেকে নীতি নির্ধারক করে নিয়ে ছিল। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে আওয়ামী লীগ ২১শে মার্চ মাগুরায় অর্ধ দিবস হরতাল, ২২শে মার্চ রাজধানীসহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল এবং ২৩শে মার্চ সারা দেশে হরতাল পালন করে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় বিরোধী দলগুলি সরকারের উপনির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে হরতাল পালন করে। তাদের এই কর্মসূচীর পিছনে যুক্তি থাকলেও হরতাল অবরোধের নামে যে বিশৃঙ্খলা পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং জনগণকে বাধ্য করে হরতাল পালন করতে সেটি কোন মতেই গণতন্ত্র সম্মত ছিল না। মাগুরা উপনির্বাচনের পর থেকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দারুন অবনতি হয় এবং সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক দাকুমড়ায় পরিণত হয়। এই অবস্থায় একটি সংসদীয় সরকার পরিচালনা করা খুবই কঠিন। কেননা সংসদীয় সরকার পরিচালনার পূর্ব শর্তই হলো সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বন্ধুসুলভ ও সহযোগিতা মুলক মনোভাব। এরপর বিরোধী দলগুলি বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের দাবীতে লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ কর্মসূচীর ঘোষণা দেয়। বিরোধী দলের এই কর্মসূচীর জবাবে সরকারী দলও সন্ত্রাসী তৎপরতার আশ্রয় নেয়। ১৯৯৪ সালের ২৮শে নভেম্বর ঢাকায় শাপলা চত্বরে ছাত্রদলের মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, হরতাল, অবরোধ, পদত্যাগ ও অচল করে দেয়ার হুমকি দেখিয়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে সরানো যাবে না। জনগণের প্রতি আস্থাহীনতায় যারা এমন প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনাদের পরাস্ত করতে ছাত্রদলই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রীর উক্ত বক্তব্যে ছাত্রদলকে সন্ত্রাস ও মারামারি করার জন্য উস্কানি দেওয়া হয়েছে যেটি দলের নেত্রী ও দেশের নেত্রীর জন্য ছিল সম্পূর্ণ বেমানান। এই অবস্থায় সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কাজ। কেননা বড় বড় বক্তৃতা দিলেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয় এজন্য প্রয়োজন সে অনুযায়ী কাজ করা।

বিএনপি সরকারের আমলে দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতিকে বেশ প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এই সময় বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, দলীয় সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বহু অভিযোগ পাওয়া যায়। দুর্নীতি দমন ব্যুরো সূত্রে প্রকাশ সবচেয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, ডাক ও টেলিফোন যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ডিভিশন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, শিক্ষা,স্বরাষ্ট্র, স্থানীয় সরকার, বেসামরিক বিমান ও চলাচল এবং নৌ পরিবহন এই ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে।

বহুক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া যায়নি বলে তদন্ত কাজে অগ্রগতি হয়নি। বিএনপি আমলে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ৩টি ঘটনা যেমন–(১) কৃষি মন্ত্রী ও তার মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ (২) সার সংকট এবং (৩) প্রধানমন্ত্রীর পরিবার পরিজনের অবৈধ পথে টাকা উপার্জন বেশী আলোচিত হয়েছে।

যার ফলে সংসদীয় সরকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ গড়ে পারেনি। বরং এই সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়। সরকার পূর্বের স্বৈরাচারী অধ্যাদেশ গুলি বাতিল না করে নতুডন নতুন অধ্যাদেশ জারি করে সন্ত্রাস আরও বৃদ্ধি করে। সরকার বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা আইনটি বাতিল না করে নতুন নতুন অধ্যাদেশ জারি করে সন্ত্রাস আরও বৃদ্ধি করে। সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইনটি বাতিলের প্রতিশ্রুতি করলেও এটি বাতিল করেনি বরং এই আইন প্রয়োগ করে বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়। হাইকোর্ট বিশেষ ক্ষমতা আইনে ডিটেনশনের ৮০% আদেশ অবৈধ বলে ঘোষণা করে। ৯৪ এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারী হিসাবে ৬৬৩ জনকে সন্ত্রাস দমন আইনে আটক করা হয়। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১,৪৯৮ জনকে আটক রাখা হয়। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এর সঠিক রিপোর্টে বলা হয় ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে সংসদ বর্জন করে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক আখ্যায়িত করে তাদের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে। বিরোধী দল এবং ইসলামী দলগুলি ক্রমাগত প্রতিবাদ মিছিলের কারণে রাজনৈতিক সহিংসতা অনেক বেড়ে যায়।

ডিসেম্বর মাসে সবগুলি বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে আইন সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষণা দেওয়া হলেও বছরের শেষ নাগাদও তা গঠন করা হয়নি। মৌলবাদীদের হুমকির স্বীকার লেখক, সাংবাদিক এবং এনজিও কর্মীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সরকারকে বার বার অনুরোধ জানায়।

আইন-শৃঙখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, সন্ত্রাস দমন অপরাধ আইন ১৯৯২ জারী করার পর সন্ত্রাসী মূলক অপরাধ হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে এই ধারণাকে ভুল প্রকাশ করে দিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই সময় বিভিন্ন ধরনের অপরাধ যেমন, চাঁদাবাজি, চোরাচালান, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের প্রসার ঘটে। কলম্বোতে সার্ক সম্মেলন বাতিল হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ৩ কোটি টাকা ব্যয় করে সে দেশ সফর করেছেন অথচ তার কোন হিসাব সংসদকে দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রীর অফিসের আপ্যায়ন ভাতা, মন্ত্রিদের ভাতা, এমনকি সংসদ সদস্যরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করে। এ ব্যাপারে সরকার বা বিরোধী দলের কোন দ্বিমত হয়নি। অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তারা সকলেই এক পক্ষ। দলীয় করণের ফলে প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থার অরাজকতা সৃষ্টি হয়। প্রশাসনে দলীয় তন্ত্র কায়েমের উদ্দেশ্যে বিএনপি সরকার অবসর প্রদান সংক্রান্ত আইনের ব্যাপক অপপ্রয়োগ করে। ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি সরকার ৫ বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় দপ্তর ও সংস্থায় ৩৮৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর প্রদান করে। দলীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রশাসনের সকল পর্যায়ে ব্যাপক রদবদল হয়। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যারা শত কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সংসদ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

"আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের অনেকের আচার আচরণে শিক্ষনীয় কিছুই নেই। ভারতে সরকারী ও বিরোধী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলায় কোট থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা হয়। আমাদের দেশে রাজণেতিক নেতা, নেত্রী ও কর্মীরা আইন আদালত মেনে চলেন না। প্রেসার গ্রুপ সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের ফিকিরে থাকলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অনীহা থাকবেই।"

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকারী দলের কার্যক্রম ও বিরোধীদল হিসাবে আওয়ামী লীগ এর ভূমিকা

৫.১ ১৯৯১ এর নতুন সম্ভাবনা ও গ্রহণযোগ্যতা ঃ

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যেই জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ৫ এপ্রিল আহবান করেন। নির্ধারিত তারিখে সংসদে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশন তিনি অতি শীঘ্র রাষ্ট্রপতি দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথম অধিবেনে বিএনপি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস স্পীকার পদে এবং শেখ রাজ্জাক আলী ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচিত হন। সংসদ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে জাতীয় সংসদে নবনির্বাচিত সকল সদস্য সংসদ ভবনে শপথ গ্রহন করেন। সংসদের প্রথম অধিবেশন প্রায় ৪১ দিন স্থায়ী হয়। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকেই সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সংশোধন বিলের নোটিশ দেয়।

১১ জুন থেকে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ঐ অধিবেশনের শুরুতেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তার পদ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়ার অনুরোধ জানান। ২০ জুন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ঈদের পর ২৯ জুন সংসদে সরকারি পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য বিল পেশ করা হবে। সংসদীয় পদ্ধতি চালু হলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তার পদ থেকে অব্যাহতি পাবেন। ২ জুলাই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সরকার পদ্ধতি পরির্বতন সংক্রান্ত দ্বাদশ সংশোধনী বিল সংসদে উপস্থাপন করেন। ঐদিনই আইন ও বিচার মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ রাষ্ট্রপতির পূর্বপদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত একাদশ সংশোধনী বিল উপস্থাপন করেন। ২ দিন পর ৪ জুলাই বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ও সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বিল উস্থাপন করা হয়। উভয় দলের প্রস্তাবে কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকায় সমঝোতার ভিত্তিতে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। ২৮ জুলাই বাছাই কমিটি বিলটি সংসদে পেশ করে। সমঝোতার মাধ্যমে বাছাই কমিটি বিলটি উপস্থাপন করলে ও ঐ বিল পাসের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কারণ একই সাথে আওয়ামী লীগ ইনডেমনিটি আইনটি উস্থাপন দাবি জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে সকল রকম বাঁধা, সংশয়, দ্বিধা ও মতবিরোধের অবসান ঘটিয়ে ৬ আগস্ট দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। জাতীয় সংসদে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সাড়ে ১৬ বছর পর বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। একই সাথে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ পূর্বপদে ফিরে যাওয়ার বিধান সম্বলিত একাদশ সংশোধনী বিলটিও পাস হয়। দ্বাদশ সংশোধনী বিলে ৩০৭ জন উপস্থিত সংসদ সদস্যের মধ্যে সবাই একমত হয়ে ভোট দেন। একাদশ সংশোধনী বিলে জাতীয় পার্টি ও এনডিপি ভোটদান থেকে বিরত থাকে। এ দু'টি বিল পাসের মধ্য দিয়ে পঞ্চম সংসদের প্রথম সফলতার বীজ বপন করা হয়। "The passage of the 12th constitutional amendment bill was the culmination of protracted and painstaking movement for restoration of democracy."[38]

একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী পাস হওয়ার ফলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ৮ অক্টোবরের ঘোষণা করা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ। বিএনপি-র পক্ষ থেকে আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে মনোনয়ন দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দেয় সাবেক বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে। ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে ১৭২-৯২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ৩৩০ জন সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মোট ২৬৪ জন সংসদ সদস্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সুপ্রিম কোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের কাছে শপথ গ্রহণ করেন।

আব্দুর রহমান বিশ্বাস আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর পূর্বপদ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর ফলে তিন জোটের রূপরেখা বা যুক্ত ঘোষণা অনুযায়ী সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর পূর্বপদ ফিরে পান।

---

[38] Mohammad A. Hakim, The Shahbuddin Interrognun, UPL, Dhaka, 1993.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ সংশোধনী বিলে সংবিধানের ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৯২ (ক) ধারার কোন কোন বিধান সংশোধন হয়েছে বলে এ ব্যাপারে সাংবিধানিক গণভোটের প্রয়োজন দেখা দেয়। নিয়মানুযায়ী দ্বাদশ সংশোধনীর চেয়ে পাসকৃত বিলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেবেন কিনা তা জানার উদ্দেশ্যে ৭ দিনের মধ্যে গণভোটের তারিখ ঘোষণার জন্য নির্বাচন কমিশনকে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ প্রদান করেন। ভোটারগণ দ্বাদশ সংশোধনী বিলের পক্ষে রায় দিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ বিলটি অনুমোদন করবেন বিধায় ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সারাদেশে গণভোটের দিন ধার্য হয়। এই সাংবিধানিক গণভোট হ্যাঁ সূচক ভোট পরে শতকরা ৮৪.৪২ ভাগ এবং 'না' সূচক ভোট পড়ে শতকরা ১৫.৫৮ ভাগ। ৬ কোটি ভোটারের মধ্যে ৩.৫ শতাংশ লোক ভোট দেয়। সমগ্র দেশে হ্যাঁ ভোট পড়ে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৮২টি। না ভোট পড়ে ৩৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭১৫টি। ভোট বাতিল হয় ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪০৮টি। ১৮ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ বিলে সম্মতি প্রদান করেন। সংসদীয় সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯ সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ করেন।

মাঝখানে অক্টোবর মাস থেকে উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষের খবরপত্র পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ২০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী করেন দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাগুলোর খবর সত্য নয়। ২৩ অক্টোবর জাতীয় সংসদে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উপর পাল্টাপাল্টি বক্তব্য প্রদানকালে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেন।

২১ জুলাই ১৯৯১ সালে প্রথম দেশে হরতাল পালিত হয়েছিল। এই হরতালের ডাক দেয় উপজেলা চেয়ারম্যানের বিএনপি সরকারী উপজেলা পদ্ধতি বাতিলের উদ্যোগ নিলে এরশাদ আমলে নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানরা এই হরতালের ডাক দেয়। ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচার পতনের দিবসে আওয়ামী লীগের সমাবেশে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ৮ ডিসেম্বর ৮ ঘণ্টা হরতাল ডাকা হয়। পরদিন ৯ ডিসেম্বর উপজেলা চেয়ারম্যানরা ঢাকা ছাড়া সারাদেশে হরতালের ডাক দেয়। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি শাসনামলে ১৯৯১ সালে এই তিনদিন মাত্র হরতাল পালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এরই মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে আসছিল। পাটকল শ্রমিকরা ১৯ ডিসেম্বর থেকে ৭২ ঘন্টা অবরোধ ডাক দেয়। কিন্তু ২৯ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী তাদের দলের প্রধান হিসেবে গোলাম আজমের নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করায় রাজনীতিতে নতুন উপসর্গের সূচনা হয়। উল্লেখ্য গোলাম আজম তখন পর্যন্ত পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে বহাল ছিলেন।

ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের একটি চিঠি লিখে পাঠান যাতেতিনি দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তাদের হস্তক্ষেপ কামনা কনেন। উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, "বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসাবে আমি উন্নয়নের সহযোগী ও দাতা সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট কিছু গুরুতর ঘটনা অবহিত করার প্রয়োজন বোধ করছি। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরন করতে পারেন সে লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একান্ত গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি। দুর্ভাগ্যশবশত আমাদের দলীয় কর্মীরা বিভিন্ন সমাবেশে দৈহিক হামলার শিকার হচ্ছেন এবং তাদের নিরাপত্তা ও গুরুতর হুমকির সম্মুখীন।

সরকার এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত। এ জাতীয় কর্মকান্ডে যারা লিপ্ত তারা ক্ষমতাসীন দলের রাজনেতিক সহযোগী এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের কণ্ঠরোধ করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে বলে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এ ধরনের হুমকির মুখে সম্ভাব্য নিরাপত্তা বিধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের দলীয় কর্মী ও ছাত্রলীগ সদস্যরা নানা ধরনের ভয়ভীতির শিকার হচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এমনকি তাদের আত্মীয় স্বজনরাও সরকার দলীয় কর্মীদের হয়রানির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। বাংলাদেশে এখন এ ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল ঘটনা এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের প্রতি গুরুতর হুমকির সৃষ্টি করেছে। আমি আমার দলীয় কর্মীদের উপর হামলার কয়েকটি ঘটনা এতদ্‌সঙ্গে উল্লেখ করছি। দেশে গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে এ ধরনের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা বর্তমান সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিলে আমরা খুশী হব।

শেখ হাসিনার এ চিঠির প্রতিলিপি ২৩শে নভেম্বর, ১৯৯১ দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়। তারপর হতেই দেশব্যাপী নিন্দা আর সমালোচনার ঝড় শুরু হয়। দীর্ঘদিন চলে পক্ষ বিপক্ষের পাল্টা বিবৃতি।

১৯৯১ এর নির্বাচন তথা পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় গণতন্ত্রের অনুশীলন। আরও প্রয়োজন ছিল সরকার ও বিরোধীদলকে সেই অনুশীলনের শর্ত হিসেবে সুস্থ রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রথম দিকে বিএনপি এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দলের ঐকমত্য ভিত্তিক উত্তরনের মধ্য দিয়ে এ রকম একটি সুন্দর সম্পর্কই বের হয়ে এসেছিল। জনগণের ও সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল এ ধরনের ঐক্যমত্যের ধারাবাহিকতার মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের জন্য "ছায়া সরকার" বা 'ছায়া কেবিনেট' গটন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারত। কেননা এ ধরনের সরকারের ধারণা আধুনিক গণতন্ত্রে স্বীকৃত বিষয়। সরকারের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা মত প্রধান বিরোধী দলটিরও দায়িত্ব প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ থাকেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মন্ত্রীর কর্মপরিকল্পনার পাশাপাশি তিনিও বিকল্প প্রস্তাবনা পেশ করেন। এভাবে 'ছায়া সরকার' প্রকৃত সরকারের পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। পার্লামেন্টে একটি সরকারের নিয়মতান্ত্রিক পতনের পর সেই 'ছায়া-সরকার' ক্ষমতা গ্রহনের জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার যথাযথ কার্যকারিতার জন্য সরকার ও বিরোধী দলসমূহের মধ্যে সুস্থ রাজনৈতিক সম্পর্ক একটি অপরিহার্য শর্ত। বিরোধী দলকে সরকারের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা রাখতে হবে। সরকারকেও সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নিচে বিরোধী দল প্রস্তাবিত আওয়ামী লীগের ছায়া সরকারের কাঠামো তুলে ধরা হলো ঃ

ছায়া সরকার কাঠামো

প্রেসিডেন্ট আব্দুস সামাদ আজাদ
প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোহাম্মদ নাসিম	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আব্দুল জলিল
অর্থ মন্ত্রণালয় ড. মোশাররফ হোসেন	কৃষি মন্ত্রণালয় মতিয়া চৌধুরী
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমির হোসেন আমু
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সাজেদা চৌধুরী	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় আব্দুর রাজ্জাক
আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সুধাংশু শেখর হালদার	পূর্ত মন্ত্রণালয় তোফায়েল আহমেদ
খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্নেল শওকত আলী	ভূমি সংস্কার ও ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয় রাশেদ মোশাররফ

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ঐকমত্যের সরকার গঠন এবং ছায়া সরকার গঠনের যৌক্তিকতাকে ব্যর্থ করে দেয়।

403559

এরই মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর '৯১ গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাম আজমকে জামাতের আমীর ঘোষণার প্রতিবাদে সমাবেশ ও মিছিল করে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে প্রেসক্লাবের সামনে, দাহ করা হয় কুশপুত্তলিকা। সমাবেশে দাবী ওঠে গোলাম আজমের বহিস্কারের।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ ১৯৯২ এর পরিক্রমায় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ঃ

স্বাধীনতার পর ১৯৯২ সাল ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বছর। বাংলাদেশের আরেক নতুন যাত্রার কাল শুরু হয়েছে ১৯৯২ থেকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ সবসময়ই প্রিয় বিষয়। আর এই মুক্তিযুদ্ধের সাথে একটি বিরুদ্ধবাদী পক্ষ রাজাকাররা জড়িত। এ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্নজন ভিন্ন মত দিয়েছেন এ সময় (১৯৯২)। কেউ বলেছেন দীর্ঘদিন পর রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা কোন ভেদাভেদ নেই, সবাই এক। আবার কেউ এদের পার্থক্য খুঁজছেন কেয়ামত পর্যন্ত। এসব নানা টানাপোড়েন ছাড়া 'গণতন্ত্র' ছিল রাজনীতির অন্যতম বিষয়। রাজনীতির অন্যতম বিষয় দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশ ও ভারসাম্যে ও 'গণতন্ত্র' বিষয় হিসেবে ছিল সকলের মুখে মুখে।

'দৈনিক ইত্তেফাক' এর ভাষ্যকার "গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম" শীর্ষক প্রতিবেদন উল্লেখ করে– "ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদের মধ্যে অবিশ্বাস ও দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সরকার ও বিরোধী দল সকলেই একটি অভিন্ন কথা বলেছেন ঃ তারা প্রত্যেকেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। পূর্ববর্তী বছরে অভাবিত ঐক্য ও সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় গণতন্ত্রে অগ্রযাত্রা ১৯৯২ সালে বাঁধাগ্রস্ত হয়। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি বরং গণতন্ত্রকে নস্যাৎ এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য সরকারি ও বিরোধী দল পরস্পরকে দায়ী করে বক্তৃতা বিবৃতি অব্যাহত রাখে। জাতীয় কোন ক্ষেত্রেই তেমন অগ্রগতি হয়ীন। বিরোধী এবং সরকারি দলগুলো যেমন নিজেদের অভ্যন্তরীন কোন্দলে জেগে তেমনি জাতিকে সঠিক কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারেনি।

দুস্কৃতকারীদের গুলিতে সংসদ সদস্য ওয়াকার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন গুলিবিদ্ধ ও কমিউনিস্ট নেতা রতন সেন নিহত হন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় সর্বহারাদের কর্মকান্ড উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরের অর্থনৈতিক স্থবিরতা গতবছরও কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। কৃষকরা পাট, ধানের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

উগ্রহিন্দু মৌলবাদীদের দ্বারা ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজধানী ঢাকা, ভোলা, সুনামগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আগুনে ডিসেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়

Dhaka University Institutional Repository

কাটে অশান্তি ও উত্তেজনায়। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে উঠে সর্বদলীয়-সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কমিটি। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় জাতীয় পার্টির সমাবেশ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। জাতীয় প্রেসক্লাবে পুলিশী হামলা, সাংবাদিকদের বেধড়ক পিটুনি, যুব কমান্ডের মিছিলকারীদের ধাক্কায় রেলের নীচে কাটা পড়ে ফটো সাংবাদিক নিহত হওয়ার ঘটনায় সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করেছে। পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তির জন্য দায়ী তথাকথিত শান্তি বাহিনীর সাথে আলোচনা শুরু প্রক্রিয়া সরকারের কৃতিত্ব হিসেবে বিবেচিত।

১৯৯২ সালের জুন মাসের প্রথম থেকেই দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন নতুন গতিবেগ নিয়ে আরম্ভ হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সরকারী দলকে উদ্দেশ্য করে এক বিবৃতিতে বলেন, বিএনপিকে তিনজোটের অভিন্ন কর্মসূচী অমান্য করে চলার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে। সরকারী দমন নীতি ও নির্বিবাদে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

ইতোমধ্যে বহুল সমালোচিত গোলাম আযম ইস্যুটি দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করে তোলে। জাতীয় সংসদে সরকারি দল গোলাম আজম ইস্যুতে কোনরূপ ছাড় দেয়নি। ফলে বিরোধী দল সেই অধিবেশন থেকে সাময়িক বিচ্ছিন্নতা ঘটায়। বিরোধী দলকে সংসদের বাইরে রেখে সরকারী দল কণ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নিয়ে বিরোধী দলের রাজপথে নামার পূর্বেই রাজপথের দখল নিতে থাকে সরকারী দল।

গণআদালতের উদ্যোক্তাদের ২৪ জনের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকায় অর্ধ দিবস হরতাল কর্মসূচীও আহবান করা হয়। এই কর্মসূচীর প্রতি আওয়ামী লীগ, ৫ দলীয় জোট, বাম পন্থীদলসহ অন্যান্য ছোট দলগুলোও সমর্থন জানায়।

সংসদের সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে গোলাম আযম ইস্যুতে উত্তপ্ত বিতর্ক চলে। গোলাম আযম প্রশ্নে আলোচনাকালে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য দেয়ার চেষ্টা করলে সরকারী দলের এমপিরা একযোগে হৈচৈ শুরু করে। ফলে আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির দল ও দু'জন স্বতন্ত্রী প্রার্থী সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। এই অধিবেশনে বিরোধী দল আর সংসদে ফিরে যায়নি। এরপর শুরু হয় বাজেট

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন। বিরোধী দল তাদের অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখেন। বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে বিরোধী দল সরকারের কাছে ৪ দফা দাবি পেশ করে। উক্ত দাবিগুলো সরকার মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদে ফিরে যেতে সম্মতি প্রদান করে।

চারদফা দাবি নিম্নরূপ ঃ

১। দেশের প্রচলিত আইন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন (ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩) অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের বিচার করতে হবে।

২। গণ আদালতের উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট ২৪ জন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩। রাজনৈতিক মতপার্থক্য নির্বিশেষে প্রতি দলের সভা-সমাবেশসহ গণতান্ত্রিক আচার আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪। বিরোধী দলীয় নেত্রীর মাইক কোন অবস্থাতেই বন্ধ করা যাবে না ও সকল সংসদ সদস্যের মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

এ ৪ দফা দাবি নিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা ৪ দফা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য কয়েকটি বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে। শেষ পর্যন্ত ৩০ জুন সংবিধান সম্মতভাবে প্রচলিত আইনে গোলাম আজমের বিচার ও গণ আদালতের ২৪ জনের মামলা প্রত্যাহারসহ ৪ দফার ভিত্তিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে বাজেট পাসের দিন আওয়ামী লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টি, সিপিবি ও ন্যাপ সংসদ থেকে আরেকবার ওয়াক আউট করে।

১৯৯২ সালের ১৫ই জুলাই বিএনপি সরকার বিশেষ নিরাপত্তা ফোর্স আইন পাস করে। আওয়ামী লীগ, ৫ দল এ বিলের বিরোধিতা করে। ১৯৯২ সালের ১২ আগস্ট বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করে। সংসদের অনাস্থা

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব ১৬৮-১২২ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। এটাই প্রথম বারের মত বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের আইনের ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা। ১৯৯২ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে হত্যার বিচারের দাবিতে আওয়ামী লীগ অর্ধ দিবস হরতাল পালন করে। বিরোধী দলের অনেকেই অভিযোগ করতে থাকে যে এ সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা হারিয়েছে। বিরোধী দলের আন্দোলন চরমে উঠলে সরকার ১১ই অক্টোবর সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ সংসদে পেশ করে। এর সাথে সাথেই আওয়ামী লীগ ও এর মিত্র দলগুলো সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। সব বিরোধের শেষে ১লা নভেম্বর অধ্যাদেশটি পাস হয়ে যায়। ঐদিন জামায়াতে ইসলামী দলও ওয়াক আউট করে। এরূপ অবস্থায় ৬ নভেম্বর সংসদ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এদিকে ১৪ই অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সম্মুখের রাস্তায় আয়োজিত বিরাট সমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রথম বারের মত জামায়াত শিবির-ফ্রীডম পার্টিসহ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী জানান। তাদের এ দাবিতে কয়েকটি অর্ধ দিবস ও পুর্নদিবস হরতাল পালিত হয়েছে। সমন্বয় কমিটির আন্দোলনের মুখে সংসদে গোলাম আজম ইস্যু নিয়ে আদালতের মত সওয়াল জবাবের বিতর্ক হয়। কিন্তু বিতর্কের পর স্পীকার কোন সিদ্ধান্ত না দিলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জামায়াত ছাড়া বিরোধী দলগুলো অধিবেশন বর্জন করতে থাকে। পরে আবার সরকারের সাথে বিরোধীদের ৪ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিরোধী দল সংসদে যোগদান করে। যার মধ্যে ছিল সংবিধান সম্মতভাবে গোলাম আজমের বিচার, ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী সামলা প্রত্যাহার এবং বিরোধীদলের সভা সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করা। আওয়ামী লীগ বলে দিয়েছে ইনডেমনিটি প্রত্যাহার না করলে তারা আন্দোলনে যাবে।

এমন অনেক ঘটনা যা বিরোধী দলকে বিরোধ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। আর এসবের সূত্র ধরেই আস্তে আস্তে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হতে থাকে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তথা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন সাপেক্ষে বিরোধী দলের ভূমিকা কেমন ছিল তা নিম্নে দেয়া হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

"দৈনিক আজকের কাগজ" এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯২ সালের মুল্যায়ন উল্লেখ করা হল ঃ

শুরু থেকে পুরো বছর জুড়ে রাজনীতি আলোড়িত হয়েছে গণ আদালত কেন্দ্রিক আন্দোলনকে ঘিরে, আর এ সুযোগ হাতছাড়া করেনি প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। সাথে সাথে অন্যান্য দলগুলোও যেমন জাসদ, সিপিবি, পিডিএফ, ৫ দল, গণতন্ত্রী পার্টি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটসহ বাম গণতান্ত্রিক দলগুলো সরাসরি আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান চূড়ান্ত করে নিয়েছিল। মূল ইস্যু ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, গনরায়ে গোলাম আজমের ফাঁসি কার্যকর করা এবং ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি। এসব ইস্যুতে সংসদের অধিবেশন হয়েছিল উত্তপ্ত। সভা সমাবেশ মিছিল মিটিং আর হরতালে উত্তপ্ত ছিল রাজপথ। এ ইস্যু রাজনীতির অনেকটা স্থায়ী মেরুকরণ প্রক্রিয়াকে করেছে জোরদার।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ শক্তিতে অবস্থান নিয়েছিল জামায়াত, ফ্রীডম পার্টি, মুসলিম লীগসহ চরম গণপন্থী দলগুলো। সরকার চূড়ান্ত অবস্থান নেননি। কখনো কখনো ঝুলে পড়েছেন প্রতিপক্ষ শক্তির দিকে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির ওপর নির্যাতনের অভিযোগ প্রবল।

আওয়ামী লীগে ড. কামাল গ্রুপ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। নতুন দল গঠনে তারা তৎপর। মেরুকরণ এবং তার অভ্যন্তরীণ প্রভাব বিরোধী দলের জন্যে ছিল বড় সংকট। বছর শেষ ধাপে বাবরী মসজিদ ইস্যু, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি, চুরি, ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস, মস্তানী আর চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এ সবকিছু দেশকে প্রায় অচল করে দিয়েছিল।

সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সরকার, সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন আইন পাস করেছেন ১ নভেম্বর। বিরোধীদের আপত্তি ছিল তাদের দমনেই এ আইন ব্যবহৃত হবে।

দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকায় বলা হয়েছে – আওয়ামী লীগ প্রধান বিরোধী দল হিসেবে পুরো বছর কয়েক দফায় সরকারের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। সংসদে একদফা অনাস্থা প্রস্তাব ও আনা হয়েছিল সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু সরকার অনাস্থার বিরুদ্ধে হেসেখেলেই

Dhaka University Institutional Repository

জেতে। পুরো বছর আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। বছরের শুরুতে জানুয়ারি ৯ তারিখে দলের আন্তঃকোন্দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হন ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান বাদল। এই ঘটনা আওয়ামী লীগকে নাজুক অবস্থায় ফেলে দেয়।

সেপ্টেম্বরে কাউন্সিল অধিবেশনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ আবার নতুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পুরো বছর আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বড় সাফল্য রাজবাড়ি, গৌরিপুর এবং ভোলার উপনির্বাচনে জয়লাভ। অবশ্য এই তিনটি নির্বাচনই হয়েছে আওয়ামী দলীয় সংসদ সদস্যের মৃত্যুজনিত শূন্যপদে।

দৈনিক সংবাদে বলা হয়েছে– সংসদে ১২ই এপ্রিল সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে সংসদ সদস্যদের মধ্যে এ ব্যাপারে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। বিতর্ককালে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা গনরায় কার্যকর করার দাবি জানায়। ১৪ই এপ্রিল গোলাম আযমের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানানো হয়। ১৬ এপ্রিল স্পকিার শেখ রাজ্জাক আলী কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়াই আলোচনা শেষ হওয়ার ঘোষণা দিলে সংসদ সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তার প্রতিপক্ষের প্রতি ফাইলপত্র ছুঁড়ে মারেন। এক পর্যায়ে বিরোধী দলীয় সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। অবশেষে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতেই ১৯ শে এপ্রিল সংসদে সাধারন আলোচনার পর গোলাম আযম সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাস হয়। ১৮ জুন সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। কিন্তু বিরোধী দল নির্মূল কমিটির ৪ দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

৫.৩ ১৯৯৩ এর আলোকে সরকারী দল ও বিরোধী দল ঃ

১৯৯৩ সালের প্রথম থেকেই ক্ষমতাসীন সরকার ও সরকারী দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক কর্মকান্ডে সীমিত হয়ে পড়েন। সরকারী দলের বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা বিরোধী দলের আন্দোলনের পথকে আরও সুগম করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

হালিশহরে হত্যাকান্ড ঃ

বছরের প্রথম দিনের একদিন পর অর্থাৎ ২ ও ৩ জানুয়ারি চট্টগ্রামের হালি শহরে এক মর্মান্তিক অমানবিক ঘটনা ঘটে। এদিন নৌবাহিনীর কতিপয় উশৃঙ্খল সদস্য বন্দরটিলায় এক অপ্রীতিকর ঘটনার সাথে যুক্ত হয় এবং নিরীহ মানুষের উপর নির্যাতন চালায়। নৌবাহিনীর কয়েকজন সদস্য একজন মহিলাকে উত্যক্ত করায় স্থানীয় জনগণ প্রতিবাদ করলে নৌবাহিনীর সদস্যরা সদস্য বলে সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালায়।

পরে হালিশহর ও বন্দরটিলায় ১৭টি লাশ উদ্ধার করা হয়। প্রায় ৫০৯ জনকে নিখোঁজ পাওয়া যায়। অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ঘটনার এক সপ্তাহ পরে বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন ও ব্যারিস্টার সিগমা হুদার নেতৃত্বাধীন মানবাধিকার কমিশন তদন্ত চালিয়ে ঘটনার নাটকীয় দিক উদঘাটন করে।

১২ জানুয়ারি চট্টগ্রামে এর প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। পরে এক সমাবেশে বক্তারা প্রতিরক্ষা বাহিনীর কতিপয় সদস্যের এই মামলাকে একটি নজিরবিহীন লজ্জাজনক ঘটনা বলে অভিহিত করেন।

মধ্য জানুয়ারি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে নৌবাহিনীর ১৯ জনকে বরখাস্ত করা হয় এবং ১৩ জনের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালের কথা বলা হয়। হালিশহর ও বন্দরটিলার ঘটনা নিয়ে ১৮ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ সরগরম হয়ে উঠে। বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন ঃ

"সরকার বলছেন তদন্ত চলছে। কিন্তু তদন্তের আগেই তো তারা রায় দিয়েছেন। ঘটনার ১৫ দিন পর প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে গিয়ে বললেন, পরাজিত বিরোধী দল ঘটনা ঘটিয়েছে। তাহলে তো আর তদন্তের দরকার নেই। সরকার নিজেদের ব্যর্থতা, অদক্ষতা, অযোগ্যতা ঢাকা দেবার জন্য বিরোধী দলের ওপর দায় চাপাতে চাইছেন। তিনি বলেন, হালিশহর বন্দরটিলায় ৪২ জন মানুষ মারা গেছে, ২ শত এখনো নিখোঁজ। সেখানে লাশ কুকুরে খেয়েছে, ফ্রীজে লাশ পাওয়া গেছে। এই ঘটনা সরকার এড়িয়ে যেতে পারেন না। শেখ হাসিনা বলেন, তদন্ত কমিটি অনেক হয়েছে, কিন্তু শাস্তি হয়নি।"

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী নেত্রী ঃ

৫ জানুয়ারি এক সমাবেশে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জাতীয় সংসদ থেকে জামায়াতে ইসলামীর সাংসদদের বহিস্কার দাবি করে।

৬ জানুয়াররি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সিলেটের বিয়ানীবাজারে অভিযোগ করেন যে, একটি রাজনৈতিক দল সংসদ অচল করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে প্রকৃতপক্ষে স্বৈরশক্তির সঙ্গে এক হয়ে উন্নয়ন ব্যাহত করার চেষ্টা করছে।

একইদিন বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা একাত্তর ও পঁচাত্তরের ঘাতকদের একই সাথে বিচার করা হবে বলে ঘোষণা দেন।

একদিন পর শেখ হাসিনা যান সিলেটের হবিগঞ্জে এবং কুমিল্লার ব্রাহ্মণরাড়িয়ায়। তিনি অভিযোগ করেন, মরহুম জিয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও এদেশের মানুষের সাথে বেঈমানি করেছে। বর্তমান সরকার বাবরী মসজিদের ব্যাপারে লং মার্চে মদদ দিয়েছে, আবার গুলি করেও নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে।

৯ জানুয়ারি ঢাকায় চিকিৎসা শেষে ফিরে আসেন ১৯৯২ সালে সন্ত্রাসীদের হাতে গুলিবিদ্ধ জননেতা রাশেদ খান মেনন। সেদিন ঢাকায় শেখ হাসিনা বলেন, বিদেশী প্রভুদের ইঙ্গিতে শ্রমিক ছাটাই করা হচ্ছে। আবার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী যখনই সংগঠিতভাবে রাজপথে নেমেছে, তখনই শাসকদের মসনদ কেঁপে উঠেছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় আয়োজিত এক সমাবেশে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন। সরকার দেশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে।

১২ জানুয়ারি রাজবাড়িতে শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে মানুষের নয়, সরকারের মন্ত্রীদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে।

১৫ জানুয়ারি শেখ হাসিনা বলেন, কলকারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি বলেন, সরকার দলের লোকদের কাছে এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিক্রি করছে এবং তারা তা লুটপাট করে খাচ্ছে, এদিকে শ্রমিকরা না খেয়ে মরছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭ জানুয়ারি থেকে জাতীয় সংসদে ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পরবর্তী দেশীয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা উঠলে বিরোধী দলের সদস্যরা এক শ্রেণীর গুন্ডা কর্তৃক দেশে মন্দিরে হামলার নিন্দা করে। তবে সরকারি দলের সদস্যরা দাবি করেন, এখানে তেমন কিছুই ঘটেনি।

১৭ জানুয়ারি জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমাবেশে চলতি সংসদ অধিবেশনই জামাত নেতা গোলাম আযমের বিচারের ঘোষণা দাবি করেন। একই দিনে প্রধানমন্ত্রী কুষ্টিয়ার এক জনসভায় বলেন, যারা জাতীয় অগ্রগতি চায় না, তারা আবার ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছে।

১৯ জানুয়ারি বিরোধী নেত্রী যান ঢাকার দোহারে। তিনি সেখানে এক জনসভায় বলেন, বিএনপিকে ভোট দিয়ে মানুষ অনেক খেসারত দিয়েছে।

২১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী সিরাজগঞ্জে বলেন, জনগণকে বুঝতে হবে কারা তাদের বন্ধু, আর কারা তাদের শত্রু। একইদিন শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্বোধন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, শিশু-কিশোরদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে দেওয়া হচ্ছে না।

২৩ জানুয়ারি শেখ হাসিনা বলেন, স্থায়ী শ্রমনীতির অভাবে কারণেই শিল্পে নৈরাজ্য বাড়ছে। ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম যান। সেখানে লালদিঘী ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার প্রাক্কালে সশস্ত্র একদল গুন্ডা শেখ হাসিনার প্রাণ নাশের চেষ্টা চালায়। তিনি অক্ষত থাকলেও মোট ২৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়। একই দিন পুলিশ মীরেরসরাই (চট্টগ্রামে) জামায়াতে ইসলামীর অফিস ঘেরাও করে বিপুল পরিমান অস্ত্র উদ্ধার করে এবং ১১ জনকে গ্রেফতার করে।

পরদিন শেখ হাসিনা এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন, সরকারি মদদ ছাড়া সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের ব্যবহার করতে পারে না। এদিন শেখ হাসিনার প্রাণ নাশের অপচেষ্টার প্রতিবাদে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। জানুয়ারি শেষ সপ্তাহে ঢাকার মিরপুরের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতির আসর প্রবলভাবে জমে উঠে। ২৯ জানুয়ারি শেখ হাসিনা এক নির্বাচনী সভায়

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার নামের আগে লেখেন 'আপোষহীন'। আজ আপোষ ফাঁস হয়ে গেছে। জাতীয় পার্টির সাবেক এমপির ছেলেকে তিনি মনোনয়ন দিয়েছেন। পর্দার আড়ালে তাদের মধ্যে আপোষ যে কতটা গভীর তা আজ স্পষ্ট।

মিরপুর উপনির্বাচন ঃ

ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন গরম হয়ে ওঠে ঢাকার মিরপুরের উপনির্বাচনে ঘোষিত ফলাফল নিয়ে। বিএনপি সাংসদ হারুন মোল্লার মৃত্যুতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারি এখানে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভোট গ্রহণ চলাকালেই বাংলাদেশ টেলিভিশনের রাত ১০টার ইংরেজী খবরে বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মহসিনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিরোধী আওয়ামী লগি এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে ঘেরাও করলে কমিশন ফলাফল সরবরাহের কথা অস্বীকার করে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিএনপি প্রার্থীকে সরকারিভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। এদিন প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে ওয়াক আউট করে এবং ১৩টি কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন দাবি করে। ৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে এর প্রতিবাদে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় এবং ১০ ফেব্রুয়ারি সারাদেশেই হরতাল পালিত হয়।

আওয়ামী লীগের উপর্যুপরি আন্দোলনের মুখে ১৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন মিরপুর আসনের সকল ফলাফল বাতিল বলে ঘোষণা করে এবং ভোট পুনরায় গণনার নির্দেশ দেয়। সরকারি দল বিএনপি নির্বাচন কমিশনের এই আদেশের বিরোধিতা করে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ভোট পুনরায় গণনা হলে ফলাফল অপরিবর্তিত থাকে এবং রাজনীতিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে আসে। ১২ ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনা বলেন, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে জাতীয় সংসদ থেকে তিনি এবং তার দল পদত্যাগ করবে।

ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে দেশের রাজনীতি জামায়াত নেতা গোলাম আযমের বিচার ও নাগরিকত্ব প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদে ২ মার্চ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় কৃষক সমাজের সাম্প্রতিক সমস্যাবলীর আলোচনায় অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য মতিয়া চৌধুরী বলেন, "আমাদের কৃষকদের অবহেলা করা হয় কারণ তারা রাজপথ, রেলপথ অবরোধ করতে পারে না। এমন একদিন আসবে যখন কৃষক অবরোধ করবে পুরো ঢাকা শহর।"

৩রা মার্চ শেখ হাসিনা তথ্য প্রকাশ করে বলেন, মেজর ডালিম ও মেজর পাশা প্রমুখরা জিয়া হত্যার সাথেও জড়িত ছিলেন ৩ মার্চ শহীদ জননী জাহানারা ইমাম অভিযোগ করেন, সরকার গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দেয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, গোলাম আযম এ দেশের নাগরিক কি অনাগরিক তাতে দেশের মানুষের কিছু যায় আসে না, সে যুদ্ধ অপরাধী এবং তার বিচারের রায় কার্যকর হবে।

৫ মার্চ বিদ্বেষমূলক জাতীয় রাজনীতিতে চমক সৃষ্টি করেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। এ দিন তিনি বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনার দাওয়াতে ইফতার পার্টিতে যোগদান করে সুস্থ রাজনীতির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

৭ মার্চ সংসদে আওয়ামী লীগের সদস্যরা রেডিও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষন প্রচারের দাবি করেন। বিতর্কে অংশ নিয়ে তোফায়েল আহমদ বলেন, গত ১৭ বছর যাবৎ এই দিনকে নিয়ে শুধু অপপ্রচার করা হয়নি অবমাননাও করা হয়েছে। বিএনপির মশিউর রহমান আলোচনার সূত্রে বলেন, ৭ মার্চের ভাষন গুরুত্বপূর্ণ তাতে দ্বিমত করি না।

৯ মার্চ সংসদে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুষ্ঠানের সরকার প্রধান অনুপস্থিত থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির ইফতার পার্টিতে প্রধানমন্ত্রী যাননি কেন? তিনি কি রাষ্ট্রপতিকে বয়কট করেছেন? আজ সংসদের শেষ দিনেও প্রধানমন্ত্রী অনুপস্থিত।

১০ মার্চ জাতীয় সংসদে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। হেয়ার রোডের বাড়ি ও সাইপেম কোম্পানী সম্পর্কিত দুটি দুর্নীতির অভিযোগ সংসদে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। স্পীকার বিরোধী দলকে আলোচনার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নী সভাপতিত্ব করতে এসে বিরোধীদলকে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে মন্ত্রীকে জবাব দানের আহবান জানালে সংসদে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের সদস্যরা ডেপুটি স্পীকারের দিকে প্রায় তেড়ে আসেন এবং 'তুই রাজাকার' 'তুই রাজাকার' ধ্বনি দিতে থাকেন। এই সময় সংসদে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে বিষয়টি মীমাংসিত হলেও সংসদের ইতিহাসে দুঃখজনক দিন হিসেবে তা চিহ্নিত হয়ে থাকে।

১৩ মার্চ ময়মনসিংহ জুট মিল লে অফ ঘোষণার প্রতিবাদে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আহত লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি পালন করায় জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে।

১৫ মার্চ থেকে 'শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ' ৪৮ ঘন্টা ধর্মঘট শুরু কেল। ২৬ মার্চ ছিল গণ আদালতের প্রথম বর্ষপূর্তি ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন দিবস। জাতীয় সমন্বয় কমিটি এই উপলক্ষে ঢাকায় সমাবেশের আয়োজন করলে পুলিশ সমাবেশ স্থলে প্রায় 'কারফিউ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, বিভিন্ন সড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে মিছিলে বাঁধা দেয়। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে বহু লোক আহত হয়। পুলিশের বর্বরোচিত হামলায় শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মারাত্মকভাবে আহত হন।

এই তারিখে সরকার সমন্বয় কমিটির আহবায়িকা জাহানারা ইমাম। কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুর রাজ্জাকসহ অনেক নেতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ফৌজদারি দন্ডবিধির ৮ ধারায় মামলা দায়ের করে।

৩১ মার্চ আওয়ামী লীগ ঢাকা-১১ আসনে নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের আবেদন করে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করে।

২২ এপ্রিল বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী গোলাম আজমের নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশ অবৈধ ঘোষণা করেন।

২৫ এপ্রিল গোলাম আজমের নাগরিকত্ব মামলায় হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য সরকার সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ১টি আবেদন পত্র পেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এদিন প্রধানমন্ত্রী বরং বিরোধী দলকেই আক্রমন করে বসেন। লক্ষীপুরের রায়পুরে এক জনসভায় ভাষনদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিরোধী দল আজ শুধু সরকার বিরোধী নয়, গণবিরোধীও।"

তবে এদিন বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন, "বিএনপি এরশাদের চেয়েও বর্বরোচিত আচরণ করছে।"

১০ মে জাতীয় সংসদ অচল হয়ে পড়ে সরকারিও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি ও ধস্তাধ্বস্তির কারণে। ডেপুটি স্পিকার হুমায়ুন খান পন্নীর একটি পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তে সংসদে এই অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। সংসদ সদস্য আজিজুর রহমান, মনিরুল হক চৌধুরী, আসম ফিরোজ, জয়নাল আবেদীন ফারুক, বরকতউল্লাহ ভুলু, সাখাওয়াত হোসেন বকুল প্রমুখ অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে সংসদের ভাবমূর্তি নষ্ট করেন।

১৫ মে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরোধী দল সরকারকে সহযোগিতা করছে বলে যে দাবি করা হয় তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ঘন ঘন হরতাল ডাকাকে সহযোগিতা বলা যায় না।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি আবর্তিত হয় সংসদে কেন্দ্র করে। ৬ জুন সংসদে তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় স্পীকারের কাছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে। ২৬ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মক্কা যান হজ্জ পালন উপলক্ষে। সংবিধান অনুযায়ী স্পীকার আপনা-আপনি তখন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। এই অধিবেশন শুরু হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি দেশে ফিরে না আসায় স্পীকার তখনও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ফলে তিনি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে পারেন না।

সরকারি দল এর জবাবে যথাযথ কোন বক্তব্য হাজির করতে পারেনি। ফলে বিরোধী দলের কূটনীতি ও আইনের কাছে সরকারি দল আবারও একবার মার খায়।

Dhaka University Institutional Repository

৭ জুন সংসদেও আগুনঝরা ব্যাপার ঘটে যায়। সংসদের কার্যধারা নিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ প্রতিবেদন 'রাউন্ড আপ' প্রচারিত হতো। এতদিন তা বিশিষ্ট সাংবাদিক রকিব সিদ্দিকী করে আসছিলেন। কিন্তু এইবারের নতুন অধিবেশনে রকিব সিদ্দিকীয় চুক্তি বাতিল করে বিএনপি পন্থী সাংবাদিক দলের নেতা শওকত মাহমুদকে দেওয়া হয়।

শওকত মাহমুদ প্রথম দিনেই পক্ষপাতমূলক অসত্য প্রতিবেদন টেলিভিশনে প্রচার করেন। ফলে পূর্বদিনের রাউন্ড আপ নিয়ে পরদিন ৭ জুন তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, বিরোধী দল 'ওয়াক আউট' করে। পরে সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে অচলাবস্থার অবসান ঘটে শওকত মাহমুদের অপসারনের মধ্য দিয়ে। বলা চলে, টিভি রাউন্ড আপ লিখতে এসে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে বিদায় ঘটে শওকত মাহমুদের।

মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রীদের দূর্নীতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জুন মাসে সংসদে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বছরের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে। এরপর শুরু পূর্তমন্ত্রী দিয়ে। হেয়ার রোডের মন্ত্রী পারার একটি বাড়ি পুনঃসংস্কারে কোটি টাকার খেলাপী নিয়ে এই বিতর্ক শুরু হয়।

তবে মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রী সম্পর্কিত সংসদীয় বিতর্কে ভালোভাবেই জড়িয়ে পড়েন কৃষি মন্ত্রী মেজর জেনারেল এম মজিদ উল হক (অবসরপ্রাপ্ত)। সংসদে সাইপেক্স ঘটনায় জ্বালানী মন্ত্রী এবং অন্যান্য দুর্নীতির প্রশ্নে বাণিজ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিরোধী দল কর্তৃক প্রশ্ন উথাপিত হয়।

কিন্তু জবাব দিতে এসে বিপদে পড়েন কৃষি মন্ত্রী। সংসদে কৃষি মন্ত্রী যেভাবে বিপদে পড়েন তাকে মনে হয়, সরকারি দলের অনেকেই ভেতরে ভেতরে উৎসাহী ছিলেন, এমনকি স্বয়ং স্পীকার এই ব্যাপারে বিরোধী দলের পক্ষে জড়িত আছেন এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দৈনিকে এ বিষয়ে প্রতিবেদন চলে আসে।

পরে এ নিয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের জেদাজেদিতে একটি সংসদীয় কমিটিও হয়। কিন্তু কমিটি দূর্নীতি তদন্তের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত, এর রেশ পরবর্তী বছরেও এসে চলতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১২ জুন দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী নুরুল হুদা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

মধ্য জুন জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য কর্নেল আকবর হোসেন এক অবাক তথ্য দিয়ে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ কাঁপিয়ে তোলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙালী শহীদ হয়নি, হয়েছে ৩ লাখ, রাজাকার সম্প্রদায়ের এই বানীই ধ্বনিত হয় কর্নেল আকবরের মুখে ১৫ জুন।

১৬ জুলাই সংসদে ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত দুর্নীতির অভিযোগ পর্যালোচনায় সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। এদিন সংসদ উপনেতা কমিটির টার্মস অব রেফারেন্সের ব্যাপারে বিরোধীদলের দাবি পরিপূর্ণভাবে গ্রহন করে স্পীকারকে ১৫ সদস্যের কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে প্রস্তাব করে বলেন, 'গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষায় আমরা পরীক্ষিত এবং উত্তীর্ণ হতে চাই।' প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বিরোধীদলের ভারপ্রাপ্ত নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, 'আমি অভিভূত' সকলে মিলে আমরা গণতন্ত্রের বাঁধা অপসারণ করেছি।'

জামাতে ইসলামী নেতা গোলাম আজম আদালতের রায়ে ১৫ জুলাই জেল থেকে মুক্তি পান। মুক্তির দিন জেল গেটে জামায়াত কর্মীদের তৎপরতার উপর দৈনিক প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১৬ই জুলাই দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বসে বসে ১৫টি রাজনৈতিক দল। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে আন্দোলন সংহত করতে হবে। ১৯ জুলাই ১৫ দলের ডাকে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

আগস্টে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও নাজুক অবস্থায় চলে আসে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হরতাল পর্যন্ত পালিত হয়। পয়লা আগস্ট যশোরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সারাদেশে হরতকাল পালন করে। রাজধানীতে এই হরতালকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। প্রতিবছরের মত এবারও পঁচাত্তরের খুনী গোষ্ঠী ১৫ আগস্ট উস্কানীমূলক কর্মসূচী অব্যাহত রাখে এবং দৈনিক বাংলার মোড়ে সভা ডাকে। স্বাভাবিকভাবেই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠে এবং সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এরপর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর জন্যে শোককারীদের সভা এবং দৈনিক বাংলার মোড়ে অবস্থানকারীদের সভা দু'টোই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা জারি করে।

২০ আগস্ট দৈনিক 'ভোরের কাগজ' দেশের রাজনীতির উপর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে মন্তব্য করে ঃ

বিএনপির কাউন্সিল হচ্ছে, আর আওয়ামী লীগ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, জাতীয় পার্টিতে দেখা দিয়েছে ভাঙ্গনের সুর। জামাতে ইসলামে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বেড়েছে বাম রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা।

২৩ আগস্ট ঢাকায় ছাত্র যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে তরুন যুবকরা গোলাম আজমের ৩০ ফুট উঁচু কুশপুত্তলিকা দ্রাহ করে।

পয়লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে দেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদদের স্মরণ করার সময় শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ও উচ্চারণ করার রাজনৈতিক মহলে বেগম জিয়ার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়। এই প্রথম বিএনপির সভায় বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

সংবাদপত্রে খবর বের হয়, বিরোধী দলের নেত্রীরও এই সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। মন্ত্রিপরিষদের সদস্য কর্নেল আকবর হোসেন দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে বিএনপি তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টায়।

৮ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সারাদেশে 'কৃষক বাচাঁও, দেশ বাঁচাও' দাবি দিবস পালন করে। বিরোধী দলের নেত্রীর নামে ১১ দফা নিয়ে একটি স্মারকলিপিও এই দিবসে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২০ সেপ্টেম্বর সংসদে জামায়াত ইসলামী, সরকারি দল ও বিরোধী দলের মিলিত আক্রমনের শিকার হয়। এই প্রথম বিএনপি ও বিরোধী দলের সাথে জামায়াত বিরোধী ভূমিকা পালন করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের হাতে ছাত্রদলের কর্মীদের মার খাওয়ার ঘটনা থেকে বিএনপির এই বোধ জাগ্রত হয়।

১৪ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিক পত্রিকা তার আঞ্চলিক প্রতিনিধির প্রতিবেদন উদ্বৃত্ত করে জানায়, এক মাসে চট্টগাম মহানগরীতেই ২টি খুন, ৩৫টি ছিনতাই এবং ১৪টি সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে।

১০ অক্টোবর আওয়ামী লীগের আহবানে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার সন্ত্রাস দমন আইন বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

এদিকে, একই দিন ফেনীতে হুইপ মাহবুবুল আলম তারার গাড়ির উপর আওয়ামী লীগ পন্থী ছাত্রলীগের কর্মীরা হামলা করে। হামলায় ১০ জন আহত হয়। পরে ১৩ অক্টোবর এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে আওয়ামী লীগ নেতা, সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারী প্রকাশ্য জনাব তারার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ফেনীতে অব্যাহত উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

৩০ অক্টোবর গোলাম আজমের বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহবানে দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

১০ নভেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি দিয়েছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। কিন্তু সরকার এতে বাঁধা দেয়। পরে আওয়ামী লীগের কর্মীদের সাথে তাদের সংঘর্ষ ঘটে। শতাধিক ধর্মঘটি এদিন পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয় এবং ১১৩ জন গ্রেফতার বরন করে।

১৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগ রাজধানীতে অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। হরতাল সফলভাবে পালিত হয়। সুযোগ সন্ধানী জাতীয় পার্টিও আওয়ামী লীগের হরতালকে সমর্থন করে।

Dhaka University Institutional Repository

২৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনীত অধিকার প্রস্তাব স্পীকার গ্রহণ করলে সংসদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। শেখ হাসিনা স্পিকারের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গ্রহণ না করা হলে সংসদ থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন।

৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র দিবস স্মরণে রাজধানীতে এক জনসভায় বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা সংবিধান সংশোধন করে সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তারাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেবে।

কিন্তু পরদিন ৭ ডিসেম্বর প্রায় একই স্থানে আয়োজিত অপর জনসভায় সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিধান নেই।

১০ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সরকারি বিজ্ঞাপন ব্যবহারের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিয়েছেন বললেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সংবাদপত্রগুলোকে বিজ্ঞাপন না দিয়ে তাদের কণ্ঠরোধ করতে চায়।

১৫ ডিসেম্বর যশোর আদালতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করা হয়। দৈনিক আজকের কাগজের সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমদ মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর ছোট ভাই কাজী মইনুল হোসেনকে হত্যার দায়ে গোলাম আযমসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে এই ৩ মামলা দায়ের করেন।

এরপর কাদিয়ানীদের নিয়ে জামায়াতে ইসলামী শুরু করে নতুন রাজনীতি।

ঘন ঘন আওয়ামী লীগের ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়ে। দূর পাশ্চাত্যের জনপ্রিয় গণমাধ্যম বিবিসির প্রচারিত প্রতিবেদনও বলা হয় ঃ

বিরোধী দলের কর্মীদের সাথে পুলিশের যে মারপিট হয়, বোমাবাজি চলে, কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়, ঐ অঞ্চলে সে সব দেখে একটা কথা মনে হয়েছে যে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসব কার্যকলাপ খুব একটা সমর্থন করেনি। তার কারণ দেখা গেছে ৫০ গজ দূরে যেখানে পুলিশ লাঠিচার্জ করছে,

Dhaka University Institutional Repository

কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ছে, তার ঠিক ৫০ গজ দূরেই জনগণ স্বাভাবিকভাবে কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। রিক্সা চলাচল করছে। এমনকি কিছু গাড়ি ও চলাচল করছে দেখা গেছে, সেসব গাড়ির ২/৪ টা পরে কর্মীরা ভেঙ্গে দেয়। তাছাড়া আরো একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, এই গোলমালের এক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেছে যে, জীবন যাত্রা ঐ অঞ্চলে স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং ওখানে যে কোন ধরনের গন্ডগোল হয়েছে সে কথা দেখে মনেই হয় না। দেখা যাচ্ছে পুলিশ এক জায়গায় বসে গল্প করছে কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। লোকজন যার যার কাজ কর্ম করছে। আর দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে কথা বলে আরো যে বিষয়টা পরিস্কার হয়ে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, লোকজন জিজ্ঞাসা করছে দেশ কোথায় যাচ্ছে? তার কারণ, এক, দিকে তারা বলছে যে সরকার কিছু করছে না, অন্যদিকে, তারা বলছে যে আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য বিরোধী দল যে সমস্ত কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে যেমন আজকের ধর্মঘট এবং অন্যান্য বোমাবাজি, তাছাড়া পুলিশের সাথে মারপিট এসব করে একমাত্র জীবন যাত্রা ব্যাহত ছাড়া অন্য কিছুই আর হচ্ছে না। এতে কি হবে? কাজেই কোন দলই যে খুব একটা কিছু হয়েছে বা খুব একটা কিছু করতে পারবে সেটা সম্পর্কে জনগণের মনে বেশ সন্দেহ রয়েছে। এটা যেমন গ্রামে তেমন শহরেও।

এভাবে বলা চলে, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল ঘটনা বহুল। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ঘটনার টানাপোড়নে রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়েছে, আবার আলাপ-আলোচনার কূটনীতিতে রাজনৈতিক নমনীয় ধারাও অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক বিতর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমিত থাকায় রাজনীতিতে সংসদের কর্তৃত্ব যেমন বেড়েছে, তেমনি সুস্থ্য রাজনীতির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজনৈতিক কর্মী আটক ও রাজনৈতিক মামলা পুরোদমেই অব্যাহত ছিল। একটি বেসরকারি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক রিপোর্ট উদ্ধৃত করে বলা হয়, বর্তমান সরকারের আমলে ৭ হাজার রাজনৈতিক কর্মী আটক রয়েছে ও ১২ হাজার রাজনৈতিক মামলা ঝুলানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিবেদনে বাংলাদেশ—১৯৯৩ ঃ

প্রতি বছরের মতো ১৯৯৩ সালে ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সচেতনতা এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে 'বাংলাদেশ-পরিস্থিতি' গুরুত্ব পেয়েছে সমানভাবে। প্রতিবেদনে, পুলিশ বাহিনী ও বিডিআর বাহিনীর হাতে নির্যাতনের সুনির্দিষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়।

মানবাধিকার কমিশন প্রতিবেদন ঃ

এদিকে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন গত বছরের কারাগার ও থানা হাজতে পুলিশী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে এতে মোট ১৬ জন প্রাণ হারিয়েছে। একজন মহিলাসহ ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে কারাগারের অভ্যন্তরে।

মার্কিন সরকারের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ১৯৯৩ ঃ

প্রতি বছরের মতো ১৯৯৩ সালেও মার্কিন সরকার বাংলাদেশ পরিস্থিতির উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্র দফতর এই প্রতিবেদনের রচয়িতা প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু আছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান বেগম খালেদা জিয়া এ সরকারের প্রধান। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচনে তার দল বিএনপি অনেকগুলো আসন লাভ করে এবং সংরক্ষিত আসনসমূহে মহিলা সংসদ সদস্যদের মনোনয়ন দানের মাধ্যমে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। আওয়ামী লীগ, সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচএম এরশাদের জাতীয় পার্টি ও জামাতসহ বিরোধী দলগুলো সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে, দেশের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রাথমিক দায়িত্বটি তাদের ওপরই বর্তায়। ১৯৯৩ সালে এক ন্যাক্কারজনক ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর সদস্যদের আক্রমনে ১১জন প্রাণ হারায়। ২শ জন আহত হয় এবং শত শত বাসগৃহ ও দোকানপাট ধ্বংস হয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে নৌবাহিনীর বেশ কিছু সদস্যকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং অনেককে সামরিক আদালতে শাস্তি দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। অস্ত্র বিরতির সুবাদে ১৯৯২ সালের তুলনায় ১৯৯৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংস ঘটনা কম ঘটেছে। যদিও উত্তেজনা বরাবরই তুঙ্গে ছিল। নভেম্বর মাসে উপজাতীয়দের একটি বিক্ষোভ মিছিলে অ-উপজাতীয় বসতি স্থাপনকারীরা হামলা চালালে নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হলে নিয়ারচর শহরে ব্যাপক সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। এই রক্তাক্ত সংঘর্ষে ২৭ জন উপজানি নিহত এবং ১০০জন আহত হয়।

৫.৪ ১৯৯৪ এর আবর্তে রাজনীতির হালচাল ঃ

১৯৯৪ সালে বহুবিধ রাজনৈতিক সংকট ও টানাপোড়নে গোটা জাতি ছিল বিভক্ত। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ঠাণ্ডা ও উত্তপ্ত পরোক্ষ লড়াই, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন, সংসদ ও অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার তৎপরতা সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এর বাইরে সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী পরিচালিত হয় বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন, সংগ্রাম, প্রতিবাদ, বিবৃতি ইত্যাদি মাধ্যমে।

বছরের প্রথম দিনই ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশ নিন্দা ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ঢাকা মহানগরীর মেয়র নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ হানিফের বিজয় মিছিলে গুলিবর্ষণ ও ছয়জনের নিহত মর্মান্তিক ঘটনায়। পয়লা জানুয়ারি এর প্রতিবাদে ঘটনাস্থল লালবাগ এলাকায় হরতাল পালিত হয় এবং নিহতদের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ এতে অংশ নেয়।

৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের ১৩তম অধিবেশন শুরু হয়। বরাবরের মত এবারও বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের ভাষনের সময় ওয়াক আউট করে।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে দুর্নীতি নিয়ে সরকারি ও বিরোধী দল তুমুল বাকযুদ্ধ শুরু হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারি দল বিএনপি অভিযোগ করে, বিরোধী দল সংসদকে অকার্যকর করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে অন্য কোনো ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি নিয়ে আলোচনার সুযোগ না দেয়ার প্রতিবাদে বিরোধী দলের ওয়াক আউটের সঙ্গে সঙ্গে সংসদের বৈঠক মুলতবি হবার পর সংসদ উপনেতার পক্ষে আহুত এক প্রেস ব্রিফিং এ দলের নেতৃবৃন্দ এ অভিযোগ করেন।

ব্রিফিং-এর শুরুতে তথ্যমন্ত্রী ও বলেন, আপনারা দেখছেন সংসদে কি হচ্ছে, কিভাবে অহেতুক ইস্যু সৃষ্টি করে সংসদকে অকার্যকর করা হচ্ছে। এতে কারা লাভবান হবে সবাই তা বোঝে। ব্যারিস্টার সালাম তালুকদার বলেন, সংসদে কথা বলার অধিকার সবারই আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা প্রতিদিন অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করবে। সম্পুরক প্রশ্নের নামে যখন তখন পয়েন্ট অব অর্ডারের নামে সময় নষ্ট করে সংসদকে আমরা যেদিক নিয়ে যাচ্ছি তা জনগনের প্রত্যাশ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি বলেন, চলতি অধিবেশনে অনির্ধারিত বিতর্কের কারণে এ পর্যন্ত একটি বিলও পাস করা হয়নি।

মন্ত্রী আরো বলেন, দুর্নীতি মানুষই করে। আমরা কেউ অন্য গ্রহ থেকে আসিনি। তবে শুধু মন্ত্রী হিসেবেই নয়, বিরোধী দলে থেকেও কেউ দুর্নীতি করতে পারে। দুর্নীতি নিয়ে সংসদে আলোচনা ও হতে পারে। তবে অবশ্যই তা ডকুমেন্টের ভিত্তিতে হতে পারে।

৩রা মার্চ বিএনপি মহাসচিবের একটি বিবৃতির প্রতিবাদ করে পাল্টা বিবৃতি দেন আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ নাসিম। জাতীয় সংসদে দেয়া শেখ হাসিনার একটি বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার যে বিবৃতি দেন, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম তাকে অশালীন ও অশোভন বলে নিন্দা করে।

নাসিম বলেন, সংসদের চলতি অধিবেশনে দুর্নীতির আলোচনার এক পর্যায়ে সরকারি দল আলোচনায় রাজি হয়েও নিজেদের থলের বেড়াল বেরিয়ে যাওয়ার ভয়ে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী এই বিষয়গুলোই উল্লেখ করেছিলেন মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে জগন্নাথ কলেজে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে পুলিশের দারোগা ফরহাদ নিহত হলে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে জগন্নাথ কলেজের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, এ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, বর্তমান সরকারের হাতে জনগণের জানমাল নিরাপদ নয়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে রাজধানীতে আয়োজন করা হয় এক ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠানের। ১৯৭১ সালে এই দিনটিতে বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের যে স্থানটিতে বিশাল জনসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতার, সেই ঘোষনাস্থলে ৭ মার্চ দেশের কয়েকজন তরুন কবি পুষ্পমাল্য অর্পণ ও কাব্য পাঠ করেন হৃদয়ের সকল অর্গল খুলে দিয়ে। স্বাধীনতার ঘোষণাস্থলে দাঁড়িয়ে কবিরা ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে প্রতিবছর ৭ মার্চ এই ঐতিহাসিক ঘোষনাস্থলে বেলা সোয়া তিনটায় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও কবিতা পাঠ করা হবে। শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে যেভাবে গড়ে উঠেছিল ঐতিহ্য। তেমনি ৭ মার্চের ঘোষণা মঞ্চকে কেন্দ্র করে আবার আরেকটি ঐতিহ্য গড়ে উঠবেই।

২০ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় মাগুরা ২ আসনের উপনির্বাচন। এ নির্বাচনে বিএনপি ব্যাপক কারচুপি করেছে বলে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দল অভিযোগ করে। পুনঃনির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ ২১ মার্চ মাগুরায় হরতাল পালন করে।

২২ মার্চ দিনব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ স্মরণ উৎসবে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার লালন এবং নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের সঠিক ধারায় সম্পৃক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এর আগে মুক্তিযুদ্ধ স্মরণ উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার ২২ বছর পরও জাতিকে সঠিক ইতিহাস জানতে দেয়া হচ্ছে না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাঙালি জাতির বীরত্ব গাথা নতুন প্রজন্ম জানতে পারছেনা।

২৩ মার্চ মাগুরা ২ আসনে পুনঃনির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগের আহবানে দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও ৩ নভেম্বর জেল খানায় চার জাতীয় নেতার হত্যাকান্ডের পর থেকে স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য কালো টাকা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে।

ক্ষমতাসীন দল বিএনপি'র ১৬ জুন সংসদ সদস্য ২৪ মার্চ সংবাদপত্রে এক যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের একাংশের প্রতিবাদে করেন এবং তাকে সংযত হওয়ার জন্য আহবান জানান।

বিবৃতিতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্পর্কে শেখ হাসিনার বক্তব্যকে মিথ্যা ও অনভিপ্রেত কটুক্তি বলে মন্তব্য করে বলা হয়। সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা শুধু মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতই নয় বরং কুরুচিপূর্ণ ও মানহানি কর। বিবৃতিতে এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে অভিযোগসমূহ প্রত্যাহারের দাবি করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয় সংসদের ভেতরে বাইরে বিরোধী নেত্রী প্রায়ই নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মর্যাদা রক্ষার কথা বলে থাকেন। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এমন মান হানিকর মিথ্যা, অবাস্তব অপবাদ আরোপ করেছেন যা তার পদ ও পরিচয়ের সাথে পুরোপুরি অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের সচিবালয়ের ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে সরকারি দলের প্রাইভেট বাহিনীর গুলিতে ২ জন ছাত্রসহ ৩ জন নিহত হয়। মাগুরা নির্বাচনের ফলাফল বাতিল এবং সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এই ঘেরাও কর্মসূচি আহবান করা হয়। আওয়ামী লীগ নিহতের সংখ্যা দাবি করে ৬ জন। এর মধ্যে ৩ জনের লাশ পুলিশ গুম করেছে বলে দলীয় সূত্রে অভিযোগ করা হয়। পুলিশের বেধরক লাঠিচার্জে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ গুরুতর আহুত হন। লাঠিচার্জ ও গুলিতে মাত্রাধিক দলীয় নেতা কর্মী, সাংবাদিক, সাধারণ মানুষ আহুত হন। এদের মধ্যে ৩০ জনের অবস্থা গুরুতর। পুলিশ অন্তত ৫০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ঘেরাও কর্মসূচি ঠেকাতে সকাল থেকেই সচিবালয় ও এর

Dhaka University Institutional Repository

আশপাশের এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ, বিডিআর ও আনসার নিশ্চিদ্র ব্যারিকেড দিয়ে সচিবালয় ঘেরাও করে রাখে। রাজধানী অন্য রাস্তাগুলোতে পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পুরো নগর কার্যত এক অবরুদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়।

ঘেরাও কর্মসূচী চলাকালে হত্যাকান্ড, গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ১০ এপ্রিল রোববার ও ২৬ এপ্রিল মঙ্গলবার দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা একসঙ্গে ৩/৪ জন করে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙ্গতে শুরু করে। এভাবে তারা প্রেসক্লাবের সামনে জিপিও হাইকোর্ট এলাকা এবং আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে বসে পড়েন। আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের শেষে বেলা ১২টার দিকে হাজার হাজার মানুষ নূর হোসেন চত্বরের দিকে এগুতে থাকে। এ সময় পুলিশ বিনা উস্কানিতে বেপরোয়া লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণ ও টিয়ার নিক্ষেপ শুরু করে। এক পর্যায়ে পুলিশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। এ সময় পুলিশ সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের আক্রমনের এ সময় তিনি গুরুতর আহত হন। একই সময় আহত হয় সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ড. মোস্তফা জামাল মহিউদ্দিনসহ ৫০ জন কর্মী সমর্থক নিরীহ মানুষ।

পুলিশ অনুরূপভাবে কার্জন হল, দৈনিক বাংলার মোড়, প্রীতম ভবন, গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, পল্টন, বিজয়নগর, মৎস্য ভবন, নবাবপুর, ঠাটারী বাজার, নর্থ সাউথ রোডসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরীহ জনগণ পথচারী। রিকশাওয়ালা, হকারদের উপর লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও রাবারের বুলেট নিক্ষেপ করে। পুলিশের এই তান্ডবে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে এক ভয়ার্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পথচারীরা দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। বেলা ১টার দিকে কাপ্তান বাজার ও নর্থ সাউথ রোডে অবস্থিত বিএনপি ও যুবদল কার্যালয় এলাকায় থেকে সরকারী দলের সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনী কাটা রাইফেল, স্টেনগান, পিস্তল রিভলবার নিয়ে জনতার ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। গুলিতে এ সময় নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র মোস্তফা আমিনুর ঘটনাস্থলে, রশিদ পরান (২১) এ রুস্তম আলী হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র আজিজুল হক মিলন হাসপাতালে নেয়ায় পর মারা যায় এবং অজ্ঞাত পরিচয় একজন শ্রমিকও নিহত হয় বলে স্থানীয় লোকজন জানায়। এ ঘটনায় রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্র হুমায়ুন কবিরের তলপেটে এবং একজন অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মাথায় গুলি লাগে। আশংকাজনক অবস্থায় দু'জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেছে। সরকারি দলের প্রাইভেট বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পুলিশ সার্জেন্ট ফরহাদ হত্যা মামলার পলাতক আসামী ছাত্রদল নেতা হামিদুর রহমান ও সূত্রাপুর থানা যুবদল সভাপতি নাসির। পুলিশের সহায়তায় বিএনপি'র সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ঘটনায় স্থানীয় জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে মিছিল করে তারা নবাবপুর। গুলিস্তান হয়ে গোলাপ শাহ মাজার পর্যন্ত চলে আসে। বিক্ষুব্ধ জনতা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের লটারির টিকিট বিক্রির ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় পুলিশ জনতা ধাওয়া, পাল্টা-ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ চলে। সিদ্দিক বাজার ও নবাবপুরে জনতা যুবদলের অফিসের দিকে এগিয়ে যায়। এ সময় কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে ছুরি ও চাপাতির আঘাতে আহত করা হয়। বেলা ২টার দিকে এখান থেকে আবার সরকারি দলের সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনী গুলিবর্ষণ শুরু করে। এখানে দু'দফা গুলিবর্ষণের ঘটনায় উল্লিখিত নিহত ও আহতরা ছাড়াও ৩৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়।

৭ এপ্রিলের সচিবালয় ঘেরাও অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রেসনোট জারি করে। এতে সরকারি ভাষ্যে বলা হয়–
সরকার এই দুঃখজনক অপমৃত্যুর ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে। ইতিমধ্যেই হতাশাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য সোপর্দ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গতকাল সন্ত্রাসী তৎপরতার সাথে যুক্ত ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার বিদ্যমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে সকল প্রকার কার্যক্রম সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে যে, সামগ্রিক জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সকলেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহনশীলতা প্রদর্শন করবেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেকে গুরুত্ব দিয়ে সহিংসতা এবং বে-আইনী কার্যকলাপ পরিহার করবেন। সরকার এ ব্যাপারে সচেতন জনগনেরও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

৭ এপ্রিল সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে সরকারি দলের ও পুলিশের নির্যাতন, সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ এ কর্মসূচি (১১ এপ্রিলের হরতাল) ঘোষণা করে। বৃহস্পতিবার ঘটনা জনমনে এতো ক্ষোভের সংস্কার করে যে, তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন হররতালের প্রতি সমর্থন জানায়। রাজধানী ঢাকায় হরতালের সফলতা ছিল নজিরবিহীন। ভোর দুইটায় আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের হাজার হাজার নেতা কর্মী, সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে আসে। হরতালের সমর্থনে রাস্তায় সর্বস্তরের মানুষের এই ঢল দেখে পুলিশ, বিডিআর ও আনসারকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া হরতালকালে রাজধানী ছিল শান্ত। হরতাল চলাকালে রাজধানীতে কোনো যানবাহন চলেনি। দোকানপাট খোলেনি। অফিসপাড়া, মিল কারখানা, ব্যাংক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের গেটে বড় বড় সাইজের তালা ঝুলতে দেখা গেছে। এতো সফল হরতাল দেখে অনেককে একথা বলতে শোনা যায়, কয়েক বছরের মধ্যে এমন হরতাল তারা দেখেননি।

জিল্লুর রহমান বলেন, বিএনপির জনৈক মন্ত্রী প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের বিএনপি ছাত্রদলের হাতে অবৈধ অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। খালেদা জিয়ার নির্দেশে ছাত্রদলের সন্ত্রাসী গ্রুপ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছিল। অস্ত্রের ও লাশের রাজনীতির মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম ছাত্রনেতা রাউফুন বসুনিয়া, জহুরুল হক হলের ভিপি শহীদুল হক চুন্নু, কনক, আসলাম এবং ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষার হলে ছাত্রলীগ নেতা নোমানকে হত্যা করে। এসএম হলের মেধাবী ছাত্র মুন্না ও রিক্সাচালক রহিমকে হত্যা করে।

Dhaka University Institutional Repository

সালাম তালুকদারের বিবৃতি ঃ

২৩ এপ্রিল বিএনপির মহাসচিব আব্দুস সালাম তালুকদার বিরোধী দলের বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। এতে তিনি বলেন, গত সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি কিংবা ক্ষমতা হারানোর বেদনা তাদেরকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে বলে এমন আচরণ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছি। সালাম তালুকদার বলেন, সরকারের কর্মকান্ডে কিছু ত্রুটি থাকতেই পারে, যা বিরোধী দলের বন্ধুদের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শে তার সংশোধনী ও পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব। দেশ ও জনগণের প্রকৃত কল্যাণে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রয়াস তাই এত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি, প্রচলিত নিয়ম নীতি অগ্রাহ্য করে, পবিত্র সংবিধানকে অমান্য করে, গণস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নির্বাচনে পরাজিত কোন দল পতিত স্বৈরাচারের সাথে হাত মিলিয়ে নির্বাচিত সরকারকে জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জনগণকে জিম্মি এবং উন্নয়নের ধারা পঙ্গু করে দেবে এটা হতে দেয়া যায় না।

মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপি বিষয়ক দাবিতে হাস্যকর ও অবাস্তব হিসেবে আখ্যায়িত করে ব্যারিস্টার তালুকদার বলেন, এই নির্বাচনে কোনো ত্রুটি দেখে থাকলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে আপিল করবেন এটাই নিয়ম। কিন্তু তা না করে তারা অবিরাম হরতাল ঘেরাও করে চলেছেন। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছেন। তারা অবিরাম হরতাল ঘেরাও করে চলেছেন। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছেন। তারা আদায় করতে চান রাজপথে। যুক্তির পরিবর্তে শক্তি দিয়ে তারা নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করতে চান। দেশের উন্নয়ন, জনগণের শান্তি, সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি কোনটাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তিনি বলেন, তাদের দলীয় সন্ত্রাসীরা প্রতিপক্ষের কর্মীদের হত্যা করতে পারবে কিন্তু বিএনপি তার দলীয় কর্মীদের লাশও দাফন করতে পারবে না।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সন্ত্রাস দমন আইনে বিরোধী দলের কিছু বন্ধু সন্তুষ্ট হতে পারেননি, প্রধানত দুটি কারণে, একটি হল এই আইন প্রয়োগের ফলে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হলে তাদের ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন পূরণ হওয়া দুস্কর হবে, অন্যটি হল এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে তাদের বেশ কিছু সন্ত্রাসী নেতা কর্মীর আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, সংসদীয় রাজনীতির সকল প্রতিষ্ঠিত বিধান লংঘন করে অতর্কিতে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনে পর দিন সংসদের মুল্যবান সময়ের অপচয় করেছেন। প্রতিনিয়ত অশালীন ভাষা ব্যবহার করে সংসদে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন, নির্বাচিত গণ প্রতিনিধি ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীদের চরিত্র হননের উদ্দেশ্যমূলক অপচেষ্টা চালিয়েছেন, সম্মানিত ডেপুটি স্পিকারকে অপদস্থ করার জন্য পবিত্র সংসদ কক্ষে পেশী শক্তি প্রদর্শন করেছেন এমনকি অন্য দলের সংসদ সদস্যদের পাদুকা প্রদর্শন থেকে শুরু করে ফাইল ছুঁড়ে মারা ও মাইক ভেঙ্গে ফেলা পর্যন্ত হেন অসাংবিধানিক অসংসদীয় আচরণ নেই যা তারা করতে বাকি রেখেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে পরাজিত ও জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কতিপয় দল ও ব্যক্তি দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থের বিরাজমান গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

২৬ এপ্রিল সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আওয়ামীলীগের আহবানে সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে সারাদেশের বেসরকারি শিক্ষকরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীতে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। কিন্তু সরকার দাবি মানার প্রশ্নে অনমণীয় নীতি গ্রহণ করে। শিক্ষকদের এক সভায় বলা হয়, শিক্ষকের শতকরা ৭০ ভাগ বেতন ভাতা দিতে যেখানে মাত্র ৫শত ২৬ কোটি টাকা লাগে, সেখানে শতকরা ৩০ ভাগের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকা লাগার শিক্ষামন্ত্রীর হিসেব হাস্যকর। প্রকৃতপক্ষে এর জন্য অতিরিক্ত ১শ ৭৬ কোটি টাকা লাগবে। দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্যই শিক্ষামন্ত্রী এ ধরনের মন্তব্য করেছেন বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ৩২ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের দাবি দাওয়া মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আহবান জানান।

স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ও ফতোয়াবাজদের তৎপরতা প্রতিরোধে ৩১মে রাজধানীসহ সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২ জুন প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকার সূত্রাপুর থানার র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটে কোটিপতি ব্যবসায়ী রতন মিয়াকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৬ জুন বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। এর আগের দিন সংসদ ভবনে কে বা কারা জাতীয় পতাকা নামিয়ে পাঁচ তারা পতাকা উত্তোলন করে। এতে সারাদেশে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে।

৬ জুন তারিখেই সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে বিএনপির সংসদীয় দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ জুন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি উন্মুক্ত বিতর্কের আহবান জানান। তিনি বলেন, বিতর্কের বিষয় থাকবে এটি একটি "আমরা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই আর বিএনপি চায় না।" সংসদ নেত্রী তার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেবেন আর আমি আমাদের দাবির সমর্থনে যুক্তি দেবেন আর আমি আমাদের দাবির সমর্থনে যুক্তি দেখাবো। কিন্তু বিতর্ক হতে হবে প্রকাশ্যে জনগণের সামনে। রেডিও টিভিতে সরাসরি তা সম্প্রচার করতে হবে। হাজারো মানুষের মুহুর্মুহু শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পরিচয় হচ্ছে তার পতাকা। কিন্তু বিএনপি এই পতাকাটি পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি। চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য নিজেরাই এই কাজ করেছে। তারা ষড়যন্ত্র করেছে গণতন্ত্র ধ্বংসের। এ সরকার আর বেশী দিন ক্ষমতায় থাকলে দেশ রসাতলে যাবে।

বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সুফল তো আপনারাই ভোগ করছেন। এই দাবি মেনে নিয়ে জনগণকে আবার স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার অধিকার দিয়ে আবারও তাদের ম্যান্ডেট নিন। জনসমর্থন থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে এত ভয় কেন। তিনি বলেন, মাননীয় স্পীকারের সাথে আলোচনায় আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি, আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জানাচ্ছি না। মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই আমাদের এই দাবি। কারণ কয়েকটি নির্বাচনে একথা প্রমানিত হয়েছে। এই সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন আজ জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা যখন সংসদে থাকি প্রধানমন্ত্রী তখন সংসদে যান না। আমরা যখন সংসদে থাকি না প্রধানমন্ত্রী তখন সংসদে বসে থাকেন। তিনি রাজপথে আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান।

এই সরকারের পতন ও অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন তিনি দাবি করেন। আব্দুল মান্নান বলেন, দেশ ও সংসদ যেভাবে চলছে তা স্বাভাবিক নয়। তাই এই সরকারের পরিবর্তন দরকার। সাজেদা চৌধুরী বলেন, সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিসহ পররাষ্ট্র নীতিতেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তোফায়েল আহমদ বলেন, সংসদে ৪৫ মিনিট জাতীয় পতাকা ছিল না এটা কোনো দেশের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মোহাম্মদ নাসিম বলেন, জাতীয় সংসদের বিগত ২৯২ কার্যদিবসে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন মাত্র দুই থেকে তিন ঘণ্টা।

পাস করা ১২১টি বিলের মধ্যে ৯৪টি ছিল রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ। সরকার ইনডেমনিটি বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো মানবতা বিরোধী আইন বাতিল করেনি। পাস করেনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিল, এতেই প্রমানিত হয় সংসদকে কারা অকার্যকর করছে। মোহাম্মদ হানিফ আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে খোলা পানিতে মাছ শিকারের অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে বলেন, ক্ষমতা চাইলে এদেশে একটি মুক্তিযুদ্ধ এবং ৩০ লাখ মানুষের জীবন দিতে হতো না। ইচ্ছা করলে বঙ্গবন্ধু সেদিন ১৪ কোটি মানুষের বাসস্থান অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে না।

৭ জুন জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরে আবারো ঘটে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। মঙ্গলবার ভোরে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় কে বা কারা একটি ফলক স্থাপন করে। এতে লেখা ছিল, জাতির জনক স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজারের জন্য নির্ধারিত স্থান।

ভোর থেকে বেলা একটা পর্যন্ত ফলকটি সেখানে স্থাপিত ছিল। পরে বেলা দুটোর দিকে সেখানে গিয়ে তা দেখা যায়নি।

৮ জুন খালেদা জিয়া বলেন, তিনি উন্মুক্ত বিতর্কে রাজী তবে তা হতে হবে সংসদে। শেখ হাসিনা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯ জুন দেশে এক শ্রেণীর মাওলানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি, বিভিন্ন এনজিও অপতৎপরতা এবং জনকণ্ঠ পত্রিকা নিষিদ্ধ করার দাবিতে ৩০ জুন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

১৫ জুন বেসরকারী শিক্ষকরা প্রেসক্লাবের সামনে আমরণ অনশন শুরু করে। এরপর শিক্ষামন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, শিক্ষকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করলে অনুদান ৭৫ ভাগ করা হবে। ১৭ জুন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অনশনরত শিক্ষকের অনশন ভঙ্গ করান।

২৩ জুন গোলাম আজম প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, অতীতে আমার ভুলের যদি কেউ দুঃখ পেয়ে থাকেন তবে তাদের বেদনার সঙ্গে আমিও শরীক। ভুল মানুষের হতেই পারে।

২৭ জুন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংসদে তার সভাপক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করেন।

২৪ জুন ফতোয়াবাজ ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আহুত তথাকথিত ৩০ জুনের হরতাল, প্রতিরোধ, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম প্রমুখের বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচার, গণ আদালতের রায় কার্যকর করাসহ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহবানে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জুন রাজপথ দখল করে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মত বিনিময় সভায় গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে ২৬ জুন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক জোটের নাগরিক সমাবেশ, বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে সমাবেশ অনুষ্ঠান, ৩০ জুন রাজপথ দখল করে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন, সারাদেশে গোলাম আজমের সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করা, সারাদেশে গণতন্ত্রের অভিযাত্রার মতো ফতোয়াজ মৌলবাদ বিরোধী অভিযাত্রা, আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, বুদ্ধিজীবী মহল, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও কর্মীদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রাখার উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ জুন এক সভায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে সরকার সাম্প্রদায়িক উস্কে দিয়েছে। মদদ পেয়ে এই অপশক্তি দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ফায়দা লুটতে চাচ্ছে। ধর্ম ব্যবসায়ীদের এই গোষ্ঠী জনকণ্ঠসহ স্বাধীনতার পক্ষের পত্রিকাগুলোর ওপর হামলা চালাচ্ছে। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে দেশের সার্বভৌমত্ব নস্যাতের। তাঁরা বলেন, সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলেন, অপরদিকে পত্রিকার ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে গ্রেফতার করেন সাংবাদিকদের। ফলে এই অপশক্তি সাহস পায় দেশে হরতাল ডাকার। তারা ৩০ জুন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজের কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, এখন এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে না পারলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। সমাবেশে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোলাম আজম আজ জাতির কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু দুই লাখ লাঞ্ছিত মা বোন, ৩০ লাখ শহীদের আত্মীয় স্বজন কি তাকে ক্ষমতা করতে পারবে? যুদ্ধাপরাধী এই ঘাতকের বিচার বাংলার মাটিতে একদিন হবেই। রাজ্জাক বলেন, মতিউর রহমান নিজামী দেশে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। আমরা আজ গৃহযুদ্ধ মোকাবেলায় প্রস্তুত। খেলা যখন শুরু হয়েছে তা রাজপথেই হউক। তিনি ৩০ জুন রাজপথে গোলাম আজমের সহযোগীদের প্রতিহত করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

২৯ জুন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সংসদে বাজেট আলোচনাকালে বিরোধী দল ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাকে অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বলে অভিযুক্ত করেন। একই তারিখে সংসদে বাজেট পাস হয়।

অবশেষে ৩০ জুন ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে ধর্ম ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এসব সহিংস ঘটনায় কিশোরগঞ্জের একজন স্কুল ছাত্র নিহত এবং ঢাকাসহ সারাদেশে প্রায় ৩ শত আহত হয়।

রাজধানীতে সর্বাত্মক হরতালের সময় ধর্মব্যবসায়ীদের মসজিদ কেন্দ্রিক সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং জনকণ্ঠসহ প্রগতিশীল সংবাদপত্র কর্মীদের খোঁজাখুঁজির ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। তারা এতটাই উগ্র ছিল যে,

Dhaka University Institutional Repository

জামায়াতের ইসলামীর মুখপাত্র দৈনিক সংগ্রামের একজন সাংবাদিককেও তাদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। এছাড়া লাঞ্ছিত হয়েছে আরও কয়েকজন সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের দুটি গাড়ি। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনকণ্ঠসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীটি নরসিংদীতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিসে হামলা চালিয়ে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকায় আগুন লাগিয়ে তাদের জন্য সুবিধাজনক বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নেয়। ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে রাজধানী জুড়ে।

গোলযোগ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ১৭ জুন পুলিশসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়। আহত পুলিশের মধ্যে ২ ইন্সপেক্টর, ১ দারোগা, ১ সুবেদার, ৪ সার্জেন্ট ও ৭ জন কনস্টেবল। আহতদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০ জন ভর্তি করার পর ৬ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়। আহত ৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সংগঠনগুলো ভোর পৌনে চারটা থেকে রাজপথে নামে। আর মৌলবাদীর ফরজ নামাজের পর রাস্তায় নেমে আসে। উভয় পক্ষই রাজপথে নামার পর ভোর থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হলে তাদেরকে অধিকাংশ সময় চুপ চাপ দাড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ ভোর চারটা ৫০ মিনিটে তোপখানা এলাকায় প্রথম মিছিল করে। মিছিলটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পল্টন মোড় পর্যন্ত বেশ কয়েকবার চক্কর দেয়। বেলা বাড়তে থাকার সাথে সাথে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সংগঠন মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাব এলাকায় পৌছায়। বেলা ১০টা নাগাদ এই এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। সংগঠনসমূহের মিছিল আর শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো চত্বর। মাঝে মাঝেই সংগঠনগুলো সংরক্ষিত সমাবেশ করে মৌলবাদীদের রাজনীতি চত্বর। মাঝে মাঝেই সংগঠনগুলো সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে মৌলবাদীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রেস ক্লাবের সামনে প্যারোডি ও জারিগানের আসর বসায়, বিকালে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজের সমাবেশ শুরু হওয়া পর্যন্ত সারাদিন এই এলাকায় দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি।

Dhaka University Institutional Repository

৩ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রাজধানীতে গণমিছিল বের হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন শেখ হাসিনা।

৩ জুলাই শেখ হাসিনা ঢাকায় এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মাসে এক কোটি ২০ লাখ টাকা ভাতা নেন। ৭ জুলাই বিএনপি মহাসিচব আব্দুস সালাম তালুকদার এর প্রতিবাদে একটি বিবৃতি দেন। এতে তিনি বলেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী তাঁর মন্তব্যে যে যে শব্দ চয়ন করেছেন, তা অত্যন্ত অশোভন। বিরোধী দলীয় নেত্রীর মতো একজন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে এ ধরনের অসত্য, দায়িত্বহীন ও অশোভন উক্তি অত্যন্ত দুঃখজনক। ৩ জুলাই রাজধানীতে এক সমাবেশে বিরোধী দলীয় নেত্রী প্রধানমন্ত্রীর ভাতা সম্পর্কে অভিযোগ করেন।

বিএনপি মহাসচিবের বিবৃতিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সরকারের প্রধান নির্বাহীর অফিস। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামগ্রিক ব্যয় বাবদ এ বছরের বাজেটে বরাদ্দ রয়েছে ১০ কোটি ৬১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বেতন-ভাতা, দান ও জনকল্যাণের ব্যয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চার শতাধিক কর্মকর্তা, কর্মচারীর বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পরিবহন পুলের যাবতীয় ব্যয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যয়। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলীয় নেত্রী যে অর্থের উল্লেখ করেছেন তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামগ্রিক মাসিক গড় ব্যয়েরও বেশী। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মোট গড় মাসিক খরচ এক কোটি টাকারও কম।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, প্রধানমন্ত্রীর বার্ষিক বেতন বাজেট বরাদ্দ এক লাখ ৭০ হাজার টাকা। অন্যদিকে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বিরোধী দলীয় উপনেতার বিভিন্ন ভাতা ছাড়াই বার্ষিক বেতন বাবদ বাজেট বরাদ্দ দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর বেতন ভাতা প্রায় সমান। আরও উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী তাঁর মাসিক বেতনের টাকা নিজে গ্রহণ না করে বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায় দান করে থাকেন। ব্যারিস্টার সালাম তালুকদার বিবৃতিতে বলেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী তাঁর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামগ্রিক ব্যয়কে প্রধানমন্ত্রীর ভাতা হিসেবে দেখিয়েছেন। এভাবে হয়ত দেখা যাবে তিনি সমগ্র সরকারের খরচকে প্রধানমন্ত্রীর ভাতা হিসেবে চিহ্নিত করবেন। সরকারের প্রশাসন এবং রাজস্ব ব্যয় সম্পর্কে সকল রাজনৈতিক নেতা নেত্রীর অবশ্যই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

১০ জুলাই সাবেক সেনাপ্রধান কে,এম শফিউল্লাহ আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

২৫ জুলাই চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে একই সময়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ও জামাত আহুত জনসভাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির বিস্ফোরণ ঘটে। ছাত্রজনতার ওপর পুলিশ ও জামাতের ক্যাডাররা হামলা চালালে শতাধিক আহত ও ২০ জন গ্রেফতার হয়।

২৬ জুলাই গোলাম আজমের চট্টগ্রামের জনসভাকে কেন্দ্রকরে ছাত্র জনতার সঙ্গে জামাত, পুলিশ, বিডিআর এর ব্যাপক সংঘর্ষে ৫ জন নিহত ও দু'শতাধিক আহত হয়।

২৭ জুলাই আওয়ামী লীগ আয়োজিত পান্থপথের জনসভা থেকে শেখ হাসিনা সরকার পতনের এক দফার দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেন। চট্টগ্রামে ৫ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় ২৮ জুলাই সেখানে হরতাল পালিত হয়।

৩০ জুলাই চট্টগ্রামের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়।

২ আগস্ট দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৫ আগস্ট গুলিস্তান চত্বরে এক সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব আব্দুস সালাম তালুকদার বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে বিরোধী দলের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে ছাত্রদল একাই যথেষ্ট।

৬ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহের জন্য সকল ছাত্র সংগঠনের সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

৯ আগস্ট মহাখালীতে দু'দল সন্ত্রাসীর প্রকাশ্য বন্দুকযুদ্ধ এক যুবক নিহত ও ১০ জন আহত হয়।

১১ আগস্ট ঢাকায় ছাত্রদলের এক সমাবেশে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা তিনি বিরোধী দলকে 'তিন শয়তান' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বিরোধী দলের আন্দোলনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করবেন বলেও হুমকি দেন। তিনি বলেন, রাজাকার, হাইজ্যাকের ও স্বৈরাচারের আজকের আঁতাত কোন নতুন ঘটনা নয়। '৮৬-র সংসদে এরা একসঙ্গে ছিল। সেই সংসদের বিরুদ্ধে বেগম জিয়ার আন্দোলনে সংসদে ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ। সেই 'জিদ' তিন অপশক্তি ভুলতে পারেনি। তাই বিএনপি যখন আজ ক্ষমতায়, তখন তিন শয়তান আবার এক হয়ে ষড়যন্ত্র করছে। এবারের ষড়যন্ত্র হচ্ছে '৮৬ সালে বেগম জিয়া তাদের যেভাবে টিকতে দেয়নি, তারাও বেগম জিয়াকে টিকতে দেবে না। এই একটি মাত্র কারণে তিন অপশক্তি তাদের পুরনো সম্পর্ক আবার ঝালাই করে মাঠে নেমেছে। আমরা কাউকে ভয় করি না। আন্দোলনের ভয় দেখানো কোন কাজে আসবে না। জনগণ চায় বিএনপি ক্ষমতায় থাকুক। কারণ তিন অপশক্তি চক্রান্তের শক্তি।

তথ্যমন্ত্রী আইনজীবী ও বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১২৪(খ) ধারামতে কোন বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে যদি এমন কিছু বলা বা করা হয়, যাতে বৈধ সরকায়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়, বৈধ সরকারকে অন্যরা ঘৃণা নিন্দা করে। উৎখাতের হুমকি দেয়, তবে তা দন্ডনীয় অপরাধ। এ অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডের শাস্তি হতে পারে।

তিনি বলেন, সংসদের বাইরে সরকার সম্পর্কে কিছু বলা হলে উল্লেখিত ধারা প্রযোজ্য হবে। তবে সংসদের ক্ষেত্রে এই ধরা প্রযোজ্য হবে না।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বেগম জিয়ার সরকার বৈধ সরকার। এই সরকারকে জনগণ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। এই বৈধ সরকারকে উৎখাত করার যে আন্দোলনের ডাক বিরোধী দল দিয়েছে; সেই ডাক বেআইনি, বিরোধী নেত্রীর ডাকে বৈধ সরকারকে উৎখাতের আন্দোলনে যারা সাড়া দিয়েছেন প্রত্যেকেই দন্ডনীয় অপরাধে পেতে পারেন। আর এই শাস্তি বাংলাদেশের মানুষ দিতে পারে। এ জন্য দেশের যে কোন নাগরিক, এমনকি একটা রাস্তার ফকিরও মামলা করতে পারে।

বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে বিশ্বাস করে না উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণ তাদের ম্যান্ডেট দিয়ে বিএনপি সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সেই গণতান্ত্রিক সরকারের উপর খবরদারি করার মত অন্য কোন সরকার চেপে বসতে পারে না। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারে বিশ্বাস করে অথচ বিএনপিকে বিল আনতে হবে এমন আবদার চলে না। সংসদে সংখ্যালঘু হিসেবে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগুরু। বিএনপিকে কোন নির্দেশ দিতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, সংসদে এসে যদি যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের দাবি তারা বোঝাতে পারে; তবে বিএনপি তা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল বিএনপি আনবে না।

তিনি বলেন, যেভাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনসহ সংসদের ১২টি উপনির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই মাগুরার উপনির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। তথ্যমন্ত্রী বলেন, যারা বিশ্বাস করে হারলে কারচুপি আর জিতলে ঠিক হয়েছে। তাদের কাছে মাগুরার নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়নি। তারা মনে করেছিল, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপিকে হারিয়ে সারাদেশে বোধ হয় জনপ্রিয় হয়ে গেছে। কিন্তু যখন দেখল মাগুরার উপনির্বাচনের ফলাফল বিএনপি'র দিকে, তখন তারা কারচুপির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিএনপি সরকার সেই কারচুপি হতে দেয়নি বলেই আজ তারা নিশ্চিত হয়েছে যে, বিএনপি সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে কারচুপি করতে পারবে না তারা। তাই তাদের প্রয়োজন এমন এক সরকার, যে সরকারের কোন দায়িত্ব থাকবে না, নির্বাচিতও হবে না, জবাবদিহিতা থাকবে না। তারা চায় এমন দুর্বল সরকার, যাতে ইচ্ছামতো কারচুপি, ছোট ডাকাতি করতে পারে। তাদের সে আশা পূরণ হবার নয়।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বিরোধী দলীয় নেত্রী কোন কিছুই বোঝেন না। তিনি আজ কান্ড জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছেন। যেকোন মূল্যে হোক তাকে ক্ষমতায় যেতে হবে। ক্ষমতার স্বপ্ন তাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, সমস্ত কান্ডজ্ঞান তিনি বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি মরিয়া হয়ে গেছেন। কারণ সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে পারবেন না।

বিরোধী দলকে আন্দোলনের ভয় না দেখানোর জন্য আহবান জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, নয় বছর আপোসহীনভাবে রাজপথে ছিলাম। এখনো রাজপথে আছি। ভবিষ্যতেও বেগম জিয়া ও রাজপথেই থাকবেন। জনগণকে নিয়ে নয় বছর যেভাবে আন্দোলন করেছি, আগামীতেও বাংলাদেশের স্বাধনিতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতেই এই জনগণের পাশেই আমরা থাকবো। কাজেই আমাদেরকে আন্দোলনের ভয় দেখাবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা অনেক সহ্য করেছি। বৈধ সরকার হিসেবে আমরা আমাদের সহনশীলতা দেখিয়েছি। আমরা সবকিছুর একটা রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছি। সমঝোতার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র এগিয়ে যাবে। চেয়েছি বিরোধী দল যাতে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে এবং দায়িত্বশীল হয়। এ জন্য চেয়েছি তারা গণতান্ত্রিক সরকারকে এগিয়ে নেবে।

যারা সংসদ বর্জন করে,তাদের ভোট চাওয়ার কোন অধিকার নেই বলে তথ্যমন্ত্রী মন্তব্য করে বলেন, তারা জনগণের ম্যান্ডেটকে অস্বীকার করছে। তাদেরকে সংসদে আসার জন্য বলেছি। সংসদে যা কিছু আলোচনা করা যায়। আমাকে গালাগালি করতে পারেন। আমাকে যা ইচ্ছা তাই এমনকি নিন্দা করতে পারেন। সংসদে সবকিছু বলা চলে কিন্তু বাইরে তারা সরকার বিরোধী কিছু বলতে পারেন না।

পরদিন ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ তথ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার জবাব দেন। তিনি বলেন, দুর্নীতিবাজ, ভোট ডাকাত বিএনপি সরকারে বিরুদ্ধে বলার কারণে যদি রাষ্ট্রদ্রোহী হতে হয়, তবে তথ্যমন্ত্রী আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করতে পারেন।

বৃহস্পতিবার গুলশানের জনসভায় তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে তোফায়েল আহমদ বলেন, মন্ত্রীর বক্তৃতা প্রমান করে যে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ও আন্দোলন করা যায় না। আইনত বিচার করতে হলে বিএনপি সরকারেরই করতে হবে। কারণ, এই সরকার দুর্নীতিবাজ। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের লালন পালনকারী বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে বলার কারণে যদি রাষ্ট্রদ্রোহী হতে হয়, তবে তথ্যমন্ত্রী মামলা করতে পারেন।

তিনি বলেন, তথ্যমন্ত্রীর নাম নিতেও ঘৃণা হয়। সংসদে বলেছিলাম একটি সুন্দর ফুলের বাগান ধ্বংসের জন্য একটি ভল্লুকই যথেষ্ট। তথ্যমন্ত্রী তাই করেছেন। মন্ত্রীরা লুটপাট করে কোনটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও বাসভবন পরিণত হয়েছে ব্যবসা কেন্দ্রে। এজন্য তাদের বিচার হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শাহাবুদ্দিনের সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয় সংক্রান্ত বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদারের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে তোফায়েল বলেন, এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর '৯১ সালে নির্বাচন হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই। তিন জোটেপর রূপ রেখায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে এরশাদকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে বলা ছিল।

সংসদে একটা একটা করে চোর ধরতে চেয়েছিলাম উল্লেখ করে তোফায়েল বলেন, এরশাদ যদি হয় ডাকাত, তবে এই সরকার চোর, কিন্তু তারা সংসদকে অকার্যকর করে রেখেছে, যাতে তাদের চিহ্নিত করা না যায়।

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবিতে অর্ধ দিবস হরতাল পালিত হয়।

১৭ আগস্ট গুলি, বোমাবাঝি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৯ আগস্ট আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য রওশন আলী যশোর সদর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

২৩ আগস্ট ঢাকার পান্থপথে জাতীয় পার্টির জনসভা পুলিশ ভন্ডুল করে দেয়। এর প্রতিবাদে জাতীয় পার্টি ২৪ আগস্ট ঢাকায় হরতাল পালন করে।

৩০ আগস্ট বিরোধী দল ছাড়াই জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশন শুরু হয়।

৫ সেপ্টেম্বর সরকারী দলের সঙ্গে জাতীয় পার্টির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জাতীয় পার্টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে দলভিত্তিক কোন আলাপ হবে না।

৬ সেপ্টেম্বর বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকাররে দাবি মেনে নেয়ার আহবান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮ সেপ্টেম্বর লণ্ডন থেকে প্রচারিত বিবিসি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের রাজনেতিক সংকটের কারণে সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ বৃটেনের একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরের সময় বলেছেন যে, বর্তমান রাজনৈতিক সংজ্ঞা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ক্ষতি করছে এবং প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য লর্ড ওয়েডারলি সরকার আর বিরোধী সংসদ সদস্যদের এক বৈঠকে বলেছেন যে, অবস্থা আরও অবনতি হলে তার দরুন সামরিক হস্তক্ষেপের আংশকা থেকে যাচ্ছে। শনিবার বিরোধী দলগুলোর রাজধানী ঢাকা অবরোধের পরিকল্পনা প্রস্তুতির সময় এই হুশিয়ারী দেয়া হলো। ঢাকা থেকে রিজার্ভ গ্যালপিন জানিয়েছেন ঃ পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন স্থাপন করতে সরকারকে জোর করে রাজি করাবার চেষ্টায় বিরোধী পক্ষ গত মার্চ মাস থেকে সংসদ বর্জন করে আসছে। তারা বলছে এটা করা না হলে নির্বাচন অবাধ ও ন্যায্য হবে না।

কিন্তু লর্ড ওয়েডারলি তাঁর বক্তৃতায় বিরোধী দলগুলোর তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাদের যে ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানানো উচিত তারা সেটারই ক্ষতি করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন,তাদের আন্দোলন বহির্বিশ্বে এই বানীই পাঠাচ্ছে যে, স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের ওপর যে দায় দায়িত্ব বর্তেছে বাংলাদেশ সেটা পালন করতে এখনো প্রস্তুত হয়নি। লর্ড ওয়েডারলি অবশ্য স্বীকার করেন যে, নতুন গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে লোকেরা সবকিছু সবসময়েই তাড়াতাড়ি পেতে চায়। কিন্তু তিনি বলেন যে, তাহলেও বিরোধী দলগুলোর সংসদে তাদের কাজকর্ম আবার শুরু করা উচিত।

বৃটেনের রক্ষণশীল দলের সদস্য এবং বৃটিশ প্রতিনিধি দলের নেতা মাইকেল কেলভিনও বিরোধীদের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, তাদের কথাটা বোঝা দরকার যে একদিন তারা যখন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে তখন তারা চাইবে না বিরোধী পক্ষ সংসদ বর্জন করুক। ঐ সংকট সমাধানের চেষ্টায় উভয় পক্ষকেই আলাপ আলোচনা শুরু করার আহবান জানান মি. কেলভিন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি একথাও বলেন যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতায় তাদের আস্থা স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে টাকা ঢালবে না। ইতোমধ্যে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের একজন উর্ধ্বতন সদস্য বলেছেন যে, শনিবারের ঐ অবরোধে এক লক্ষ সমর্থক যোগ দেবে বলে তারা ধরে নিচ্ছেন। ঐ মহিলা সদস্য বলেন যে, দেশের সর্বত্র থেকে ঐ লোকেরা রাজধানীতে হাজির হবে। অন্যান্য বিরোধী দল তাদের নিজস্ব বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে।

১০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বিরোধী দলসমূহের আহবানে ঢাকায় অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। এদিকে সরকারের ইঙ্গিতে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবহন ধর্মঘট শুরু হওয়ায় সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। সরকার অবরোধ ভন্ডুল করার উদ্দেশ্যেই পরিবহনকে ব্যবহার করে।

অবরোধ কর্মসূচীর দিন সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল সমাবেশ করার কারণে পুলিশ ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। রাবার বুলেট ও বোমার আঘাতে আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ নাসিম ও জাতীয় পার্টির কর্ণের (অবঃ) মালেকসহ ৫ শতাধিক আহত হয়।

অবরোধ কর্মসূচী পালনকালে পুলিশ নির্যাতনের প্রতিবাদে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ দিনব্যাপী হরতাল কর্মসূচী শুরু হয়।

উল্লেখ্য ১১ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে ১২ সেপ্টেম্বর ৫টি বিভাগীয় শহর এবং ১২ সেপ্টেম্বর সারাদেশে হরতাল পালিত হয়।

১৮ সেপ্টেম্বর কমনওয়েলথ মহাসচিব আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রেডিও টিভি ভাষণে বিরোধী দলকে সংসদে আমার আহবান জানান। বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর আহবান প্রত্যাখ্যান করে।

২০ সেপ্টেম্বর বিরোধী দলের ডাকে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। এ নিয়ে শহরে প্রচুর হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। বিবিসি প্রচারিত প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আজ ঢাকায় অনেক বিরোধী দলীয় বিক্ষোভকারী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন। অন্তত ১০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের একজন উর্ধ্বতন নেতাও রয়েছেন।

নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনের দাবি মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করতে আজকের এই ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ছিল এ যাবত নিয়ে বিরোধী দলের সর্বপেক্ষ এবং সবচেয়ে গুরুতর প্রচেষ্টা। বিরোধী দল দাবী করছেন যে আগামী সাধারণ নির্বাচনে কারচুপি বন্ধ করতে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব থাকতে হবে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনের হাতে।

গতকাল কর্তৃপক্ষ শহরের কেন্দ্রস্থলে সবরকম বিক্ষোভের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। গোটা এলাকা আধা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় প্রায় ১০ হাজার পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছেন। হাজার হাজার বিরোধী সমর্থক ব্যারিকেড এর কাছে সমবেত হন এবং কিছুসংখ্যক বিক্ষোভকারী যখন এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, তখন এই সংঘর্ষ শুরু হয়।

পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস এবং রবারের বুলেট ব্যবহার করে। আওয়ামী লীগের প্রধান দপ্তরের চারপাশে বড় রকমের সংঘর্ষ হয়। সেখানে তাদের বিপুল সংখ্যক সমর্থক সমবেত হয়েছিলেন। দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এবং আওয়ামী লীগের আরও একজন প্রাক্তন সংসদ সদস্য পুলিশের লাঠিচার্জের সময় মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বিবিসিকে জানিয়েছেন যে, রাজধানী শহরকে কার্যত অচল করে দিয়ে অবরোধ পুরোপুরি সফল হয়েছে। তিনি বিক্ষোভ দমনে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারকে দোষারোপ করেন। তিনি বলেছেন একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে বুলেট ব্যবহার করা হয়েছে এবং তিনি আগামী ৩ দিন গোটা দেশে এক নাগাড়ে সাধারণ ধর্মঘটেরও আহবান জানিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচি পালনকালে সরকারের বাঁধা দানের প্রতিবাদে ১১, ১২, ১৩ সেপ্টেম্বর লাগাতার হরতালের ডাক দেন এই হরতাল সম্পর্কে বিবিসি প্রচারিত দু'টি প্রতিবেদন। বাংলাদেশে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ আহুত ক্রমাগত ধর্মঘটের আজ তৃতীয় দিন পার হলো দলের

Dhaka University Institutional Repository

নেত্রী শেখ হাসিনা আজ নতুন কর্মসূচী দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে রিচার্ড গ্যালপিনের প্রতিবেদন ঃ

গত চারদিনে বিরোধীরা তাদের তৎপরতা খুব বাড়িয়ে দিয়েছে। শনিবার রাজধানী অবরোধের পর তিনদিন লাগাতার হরতাল হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আজ দেশব্যাপী হরতাল খুবই সফল হয়েছে।

সবগুলো প্রধান শহর এবং চট্টগ্রাম বন্দরে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। কিছু কিছু সংঘর্ষ হয়েছে এবং শেখ হাসিনা সাংবাদিকের বলেন, আওয়ামী লীগের দু'জন কর্মী গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, বিএনপির কর্মীরা এদের গুলি করেছে। শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, বিরোধীদের আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন কুড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি এক সপ্তাহ ধরে দেশ সফর করবেন। তিনি বলেন যে, তাঁর সফরের সময় প্রধান শহরগুলোতে সমাবেশ করা হবে এবং তার এই সফরসূচি শেষ হবে ঢাকার। তিনি বলেন, এ মাসের শেষের দিকে দেশ জুড়ে তাঁর মতে, রেলপথ ও সড়ক পথ অবরোধ করা হবে। তিনি আবার অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ বিরোধীদের আন্দোলনের দমানোর জন্য স্বৈরাচারী অবলম্বন করছে।

তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনের অধীন সাধারণ নির্বাচনের দাবি মেনে নেবার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানান। তবে সরকার তা মেনে নেবে বলে মনে হয় না এবং বিরোধীরা তাদের আন্দোলন যতই জোরদার করছে আলোচনা মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ততই দূরে সরে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ধর্মঘট অনেকটা গা সাওয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালে তা দেশের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া রাখবে। ঘন ঘন এই ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারছে কিনা কিংবা আজকের এই ধর্মঘট জনমনে কি প্রভাব ফেলছে তা নিয়ে ভোরের কাগজ পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমানের সঙ্গে আতাউস সামাদ আলাপ করেন। মি. মতিউর রহমান বলেন, এখন তো দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী দলীয় শক্তিগুলো হরতাল ছাড়া আন্দোলন প্রতিবাদের অন্য কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তারা বলছেন, এতে প্রমাণ করতে চাইছেন যে দাবি আদায়ে তারা দৃঢ়।

Dhaka University Institutional Repository

তারা এও বলছে যে সরকারকে দাবি মানতে হবে। তারপরও পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ বলছেন তারা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চান যে হরতাল অবরোধ করেই তো দাবি আদায় করতে হয়। যেমন হয়েছে '৬৯, '৭০ এ এবং এমনকি '৯০ সালেও।

২৩ সেপ্টেম্বর থেকে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা সরকার বিরোধী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ট্রেন যাত্রা শুরু করেন। তিনি খুলনা থেকে রূপসা এক্সপ্রেসে ঈশ্বরদী যাত্রাকালে ব্যাপক হাঙ্গামা ও বাঁধা প্রদান করা হয়। কিন্তু পরদিন এক সরকারী আওয়ামী লীগের অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয় ঃ

শনিবার ২৪ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাকে বহনকারী ট্রেনটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হেযছে বলে। যে অভিযোগ করেছেন, তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্টে বিরোধী দলীয় নেত্রীর এই অভিযোগের কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। সরকার আরও জানাতে চায় যে, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী গত ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় খুলনা থেকে রূপসা ট্রেন যোগে সৈয়দপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে বিভিন্ন রেলষ্টেশনে শান্তি পূর্ণ পরিবেশে পথসভা করেন। রেলপথে ভ্রমণের সময় তার নিরাপত্তার জন্য ট্রেনেও স্টেশনসমূহে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বিরোধী দলীয় নেত্রী ট্রেনযোগে ঈশ্বরদী ও নাটোর পৌছার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে পরস্পরবিরোধী কতিপয় রাজনৈতিক দলের উশৃঙ্খল সমর্থেকরা উল্লিখিত স্টেশন দু'টির আশপাশে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় লিপ্ত হয় এবং পটকা বিস্ফোরণ ঘটায়। কর্তব্যরত পুলিশ মেজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে। বিরোধী দলের নেত্রী যখন ঈশ্বরদী ও নাটোর রেলষ্টেশনে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন, তখন সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল।

পরদিন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই সরকারি প্রেসনোট প্রত্যাখ্যান করা হয় এতে বলা হয়—

Dhaka University Institutional Repository

"স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিক রিপোর্টে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ট্রেনটিকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়নি। এরূপ ডাহা মিথ্যা, প্রতারণাপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর প্রেসনোট কেবলমাত্র স্বৈর সরকারের পক্ষে সম্ভব। এই ধরনের মিথ্যা বানোয়াট প্রেসনোট প্রমাণ করে ক্ষমতাসীন সরকার শুধু সত্যকে অস্বীকার করতেই অভ্যক্ত নয় বরং মিথ্যা অপপ্রচার দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায়ও লিপ্ত।"

২৫ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা ট্রেন মার্চের দ্বিতীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর বিরোধী দলের আহবানে সারা দেশে রাজপথ রেলপথ অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। এদিকে সংকট নিরসনকল্পে কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা আনিয়াকুর মধ্যস্থতায় সংলাপে বসতে খালেদা জিয়া সম্মত হয়েছেন বলে পত্রিকায় খবর বের হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে কয়েকটি কুটনৈতিক মিশানের তৎপরতার খবর দিয়েছে একটি জাতীয় দৈনিক। এতে বলা হয়েছে যে, তারা গ্রহনযোগ্য কাঠামো তৈরীর চেষ্টা চালাচ্ছেন।

১ অক্টোবর খালেদা জিয়া মানিক মিয়া এভিনিউ জনসভায় বলেছেন, বিরোধীদলের অসাংবিধানিক দাবি গ্রহনযোগ্য নয়। ইনশাল্লাহ্ বর্তমান সরকার তার মেয়াদ পূর্ন করবে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ আয়োজিত স্বাধীনতা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেছেন, বেশ কয়েকটি নির্বাচন তত্ত্বাবধারক সরকারের অধীনে হতে হবে।

৯ অক্টোবর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা পূর্বঘোষিত টঙ্গি থেকে মহাখালী পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ কি.মি. সড়কে সোয়া ৫ ঘন্টা একটানা পদযাত্রা করেন। যাত্রা শেষে এক সভায় তিনে বলেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি সরকারকে গণদাবির কাছে মাথা নত করতেই হবে। এ সরকারের পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, আমরা ভোট ডাকাতকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েছিলাম। এখন ক্ষমতায় বসে আছে ভোট চোর। এই ভোট চোর ক্ষমতায় থাকলে ভোটাররা জানে বাঁচবেনা। আপনারা লালবাগে তার প্রমান পেয়েছেন। শেখ হাসিনা বর্তমান সরকারের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, দলীয়করণের কথা উল্লেখ করে বলেন, ক্ষমতায় গিয়ে তাদের কেবল খাই খাই অবস্থা। এই খাই খাই পার্টির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

৫ অক্টোবর কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা সংলাপে মধ্যস্থতাকারী দূতের নাম ঘোষনা করেন। তিনি হলেন অষ্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর জেনারেল স্যার নিনিয়ান কিউফেন।

৭ অক্টোবর আব্দুস সামাদ আজাদ বিঃ চৌধুরীর চিঠির জবাব দেন। এদিকে আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির এক বর্ধিত সভায় শেখ হাসিনা বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংলাপে না হলে আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করবো।

৯ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তিন বিরোধী দল আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ঢাকার বাইরে থেকে রাজধানী অভিমুখে পদযাত্রায় অংশ নেয়। এতে ঢাকার সাথে সারাদেশের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১০ অক্টোবর বিএনপির মহাসচিব আব্দুস সালাম তালুকদার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সন্ত্রাস দমন আইন বাতিল করার কথা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য ১৯৯২ সালে বিরোধী দলের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও সন্ত্রাস দমন আইনটি পাস করানো হয়।

১৪ অক্টোবর স্যার নিনিয়ান বিরোধী দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। ১৫ অক্টোবর তিনি সরকারী দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেন।

২০ অক্টোবর অনেক জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সন্ধ্যায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু হয়। এদিন সুরঞ্জিত সেনের নেতৃত্বাধীন গনতন্ত্রী পার্টির একাংশ আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে একীভূত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২২ অক্টোবর যশোর জেলা আওয়ামী লীগের আহবানে অর্ধ দিবস হরতাল পালিত হয়।

২৫ অক্টোবর সংকট নিরসন কল্পে সরকার ও বিরোধী দলের টানা ৫ দিন আলোচনার পর সংলাপ ব্যর্থ হয়।

২৬ অক্টোবর বিরোধী দল ঢাকায় গণমিছিল করে। আওয়ামী লীগের গণমিছিলের নেতৃত্ব দেন সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

২৬ অক্টোবর ঢাকার সংবাদপত্রসমূহে এই মর্মে খবর বের হয় যে, গত ১০ সেপ্টেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধীদলের আহবানে ঢাকা অবরোধ ও ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে গ্রেফতার কড়ে ১২৩ জনের মধ্যে ৮৮ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ৩টি মামলায় সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইনের ৪ ধারায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

২৭ অক্টোবর স্যার নিনিয়ানের উপস্থিতিতে আবার উপনেতা পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যুবদলের সম্মেলনের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আমরা অন্যায় দাবির কাছে মাথানত করতে পারি না। অহেতুক ইস্যু সৃষ্টি করে কেউ ধ্বংসাত্মক কিছু করলে জনগণ জবাব দেবে।

৩০ অক্টোবর যশোর ৩ আসনের উপনির্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন কোন প্রার্থী না থাকায় বিএনপি প্রার্থী তরিকুল ইসলাম এম.পি নির্বাচিত হন।

১ নভেম্বর শেখ হাসিনা মানিক মিয়া এভিনিউ বিশাল জনসভায় বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি না মানা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তিনি সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, সংলাপ ব্যর্থ করে আমাদেরকে পদত্যাগে বাধ্য করবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৩ নভেম্বর চিকিৎসক ধর্মঘটের ১৩ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মঘট নিরসন সরকার কোন পদক্ষেপ নেননি। ফলে সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র অচল হয়ে পড়ে। ৪ঠা অক্টোবর হাইকোর্ট ধর্মঘটী ডাক্তারদের প্রতি ধর্মঘট প্রত্যাহার করে অবিলম্বে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়। একই তারিখে সংলাপে বসার জন্য অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সামাদ আজাদের কাছে চিঠি দেন।

৩ নভেম্বর বিএনপির সরকারের তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদাকে বরখাস্ত করা হয়। বিরোধী দলের সঙ্গে সরকারের তীব্র রাজনৈতিক দরকষাকষির এক পর্যায়ে দলের অবস্থানের বাইরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত একটি ফর্মূলা দেয়ার অপরাধে প্রধানমন্ত্রী তাকে বরখাস্ত করেন। এদিকে সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, তিনি পদত্যাগ করেছেন। সংবিধানের ৫৮(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন এবং পরে রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করেন। সরকার শামসুল ইসলামকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন।

৮ নভেম্বর আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার কাছে তাদের পদত্যাগ পত্র পেশ করেন।

৯ নভেম্বর বিরোধী দলগুলো প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ঘেরাও করার এক কর্মসূচি দেয়। সরকার এই কর্মসূচি ঠেকাতে ১৪৪ ধারা জারি করে কিন্তু বিরোধী দল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এই কর্মসূচি পালন করে। তবে বিরোধী দল আহুত প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিকে ঠেকাতে পুলিশ ও বিডিআর এর নজিরবিহীন তৎপরতায় রাজধানী ছিল অবরুদ্ধ। সকাল থেকেই পুলিশ ছিল মারমুখো ও জঙ্গি। মিরপুর রোড, বিজয় স্মরণি ও মহাখালী মানিক মিয়া এভিনিউ, এফডিসি গেটসহ বিভিন্ন এলাকায় তারা বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতি কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এতে ১শ জনের বেশী লোক আহত হয়। জাতীয় পার্টির পার্লামেন্টারী দলের প্রধান ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কর্মসূচি পালনকালে পুলিশের নিক্ষিপ্ত রাবার বুলেটে পিঠে গুরুতরভাবে আহত হন। পুলিশ পেছন দিক থেকে তার প্রতি রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে বলে দাবি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা গতকাল ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বিজয় সরণীর সমাবেশে হাজির হন। এ সময় জনতার প্রবল চাপে পুলিশি ব্যারিকেড ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। পুলিশ মরিয়া হয়ে টিয়ার গ্যাস ও ফাঁকা গুলিবর্ষণ শুরু করলে আওয়ামী লীগ নেতা এসএমএস কিবরিয়া, আমির হোসেন আমু, আব্দুল জলিল, ড. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন প্রমুখ আহত হন।

পরে বিরোধী দলের নেতারা সরকারি আচরণের প্রতিবাদে ১২ নভেম্বর ঢাকায় এবং ১৩ নভেম্বর সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালনের ডাক দেয়।

এদিকে হরতাল কর্মসূচি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবের প্রকাশ ঘটলেও বামফ্রন্ট ১০ নভেম্বর নিজেরাই এক অপ্রাসঙ্গিক হরতাল পালনের আহবান জানায়।

১২ নভেম্বর সংসদের ১০ম অধিবেশন শুরু হয়। এদিন বিরোধী ঢাকায় দিনব্যাপী হরতাল পালিত হয়।

২০ নভেম্বর চট্টগ্রামে ছাত্র শিবিরের ব্রাশফায়ারের দুইজন ছাত্রদল নেতা নিহত এবং ২০ জন আহত হয়। এদিন স্যার নিনিয়ান এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমার প্রস্তাব সরকারী দল মানলেও বিরোধী দল মানেনি। আজ আমি ফিরে যাচ্ছি। তবে কমনওয়েলথ বাংলাদেশকে ত্যাগ করবে না।

২১ নভেম্বর সম্মিলিত বিরোধী দল বলেছে, স্যার নিনিয়ানের বক্তব্য দুঃখজনক, অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক।

২৭ নভেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দল পদযাত্রায় অংশ নেয়। ২৯ নভেম্বর ৩ বিরোধী দলের আহবানে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

৩০ নভেম্বর জাতীয় সংসদ ভোটারদের পরিচয় পত্র এবং নির্বাচন কমিশনকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দেবার বিধান সম্বলিত জনপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) বিল ১৯৯৪ সংশোধিত আকারে পাস হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচার পতন দিবসে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে শেখ হাসিনা সরকারকে ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়ার আলটিমেটাম দিয়ে বলেন, অন্যথায় বিরোধী দল ২৮ ডিসেম্বর পদত্যাগ করবে।

৭ ডিসেম্বর ও ৮ ডিসেম্বর বিরোধী আওয়ামী লীগের ডাকে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। এই উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। দৈনিক সংবাদ ৮ ডিসেম্বর সংখ্যায় এ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে বলে, হরতালের প্রথম দিন গতকাল বুধবার সরকারি বেসরকারি অফিসে প্রায় অচলাবস্থা বিরাজিত ছিল। ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানে গতকাল কোন লেনদেন হয়নি।

যেসব কর্মকর্তা সার্বক্ষনিক গাড়ি পান, তারা হরতাল শুরু হবার আগেই গতকাল বুধবার কর্মস্থলে চলে আসেন। অবশ্য কেউ কেউ অফিসে রাত কাটান। কর্মকর্তাদের হাজিরা মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল এবং কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ গতকাল কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কর্মচারী ও তদবিরকারীদের অভাবে গতকাল বুধবার বাংলাদেশ সচিবালয় ছিল নীরব নিথর।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে উপস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবল চাপ ছিল। এ জন্য ব্যাংকের অনেক বড় কর্তা অফিসেই রাত কাটান। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি যদিও সন্তোষজনক ছিল তবে কোন রকম লেনদেন হয়নি। বেসরকারি অফিস ছিল পুরোপুরি বন্ধ।

১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিরোধী দলের পদত্যাগের পর যা কিছুই ঘটবে তার দায় দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। এদিন স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী রাষ্ট্রপতির অধীনে নির্বাচনের একটি ফর্মূলা দেন এবং উভয় দলের সঙ্গে আলোচনা করেন। ২৪ ডিসেম্বর সারাদেশে অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়।

২৫ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা সরকারী বাসভবন ছেড়ে ধানমন্ডির ৫ নম্বর সড়কে নিজের বাড়িতে ওঠেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৮ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিরোধী দলের ১৪৭ জন এমপি একযোগে পদত্যাগ করেন। রাত সোয়া নয়টায় স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীর কাছে নিজের এবং দলের পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। যা বাংলাদেশে তথা পৃথিবীর সংসদীয় ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

২৯ ডিসেম্বর সারাদেশে বিরোধী দলের আহবানে হরতাল পালিত হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে আন্দোলন ঃ

১৯৯৪ সালের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয় দেশের পরবর্তী নির্বাচন কিভাবে এবং কেমন সরকারের অধীনে হবে এই প্রশ্নকে ঘিরে। বিরোধী দল সমগ্র বছর সংসদ এবং সংসদের বাইরে এ ব্যাপারে সরকারি দলের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রেখে। এক্ষেত্রে বিরোধী দল আংশিকভাবে সফলতা লাভ করে বলা যায়। কারণ সাধারণ মানুষ, এমনকি বিএনপি সমর্থকদের একটি অংশ বলতে থাকেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে দোষ কোথায়।

অবস্থা এমন এক পর্যায়ে যায় যে, বিএনপির একাধিক মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যও এই দাবির প্রশ্নে সরকারের বিপরীত অবস্থানে গিয়ে প্রকাশ্যেই বক্তব্য রাখতে থাকেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত দেওয়ার মালিক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই বিষয়ে ছিলেন নির্বিকার। তবে বছরের প্রায় শেষ ভাগে তিনিও বলে বসেন এবং এক জনসভায় ঘোষণাও করেন, নির্বাচনের এক মাস আগে পদত্যাগ করতে রাজি আছি।

তবে বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সম্মিলিত ঘোষণা দিতে ২৭ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এর আগে এই প্রশ্নে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন বছরের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত বিরোধীরা দাবির প্রশ্নে অটল মনোভাব প্রদর্শন করে এবং ১৯৯৫ সালের প্রথমার্ধে তাঁরা সংসদ থেকে এই প্রশ্নে পদত্যাগ ও করেন। ২৭ জুন বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা ঘোষণা করেন। নিম্নে এর রূপরেখা প্রদান করা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ বার বার বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন করে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক একটি সংসদ ও সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আমাদের দেশে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক চর্চা যেহেতু এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, সেহেতু গণতন্ত্রকে সুসংহত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করার তাগিদ এখন একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে।

এই লক্ষ্য অর্জনে বিরোধী দলসমূহ সংসদে তিনটি বিলও পেশ করে এবং ঐ বিলসমূহ আলোচনার জন্য দাবি রাখে। কিন্তু সরকার তাতে কোন সাড়া দেয়নি। এরপর বিরোধী দলসমূহ ২৬ জুনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনকল্পে সংবিধানে সংশোধনী আনয়নের একটি বিল উত্থাপনের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু সরকার সেই বিল না এনে সংসদকে আরও অকার্যকর করে দেয় এবং অগণতান্ত্রিক ও একগুয়েমি মনোভাব নিয়ে আজ জাতিকে গভীর সংকটে নিমজ্জিত করেছে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে গণতন্ত্রের প্রস্তাবিত রূপরেখা নিম্নরূপ হবে ঃ একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদে ভেঙ্গে দেয়ার সাথে সাথে–

১। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

২। রাষ্ট্রপতি এই অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা করার জন্য জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলন রাজনৈতিক দলসমূহের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয়, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবে না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন।

৪। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৬। সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে। এছাড়া এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারন নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

(ক) নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন যাতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণবিধি প্রণয়ন ও নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১৯৯৪ সালে সরকার ও রাজনীতির অবস্থা ছিল টালমাটাল। বছরের শুরু থেকেই স্পষ্ট হয়ে পড়ে সরকারের পরম ও চরম নির্ভর হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। বস্তুত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, বেগম খালেদা জিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসন দেশের রাজনীতির সকল ভার বইতে এ সময় ছিল অক্ষম।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা ১৯৯৪ সালে ছিলেন সকল আলোচনা এবং সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তার রাজনীতিগত রণনীতি ও রণ কৌশল বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্নের জন্ম দিলেও তাঁর ভূমিকায় সরকারি দল ছিল সদা সন্ত্রস্ত। শেখ হাসিনা তাঁর সরকার

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী ভূমিকা বা তৎপরতার ক্ষেত্রে কতটুকু সফল বা বিফলতার পরিচয় দিয়েছেন, তার মূল্যায়নে না গিয়েও নির্দ্বিধায় বলা যায়, বিএনপি সরকারের সমগ্র বছরটি ছিল হাসিনা-ভীতিতে তটস্থ।

নিউইয়র্ক টাইমস এর প্রতিবেদনে '৯৪ সালের রাজনৈতিক চিত্র ঃ

১৬ জুলাই নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা তসলিমা নাসরিন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, সরকার ও বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে প্রথম পাতায় বেশ বড় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে অবশ্য তসলিমাকে সমর্থন করা হয়। পাশাপাশি সরকার ও বিরোধী দলের সমালোচনার করা হয়।

নিউইয়র্ক টাইমস আরো কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর সাথে কথা বলেছে। তারা এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, তসলিমা নাসরিনকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত সম্পর্কের কারণে বর্তমান সরকারের পতনও ঘটতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমান সরকার দেশের সবচেয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে, জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতায় বসে। কিন্তু বর্তমানের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে জনপ্রিয়তা অনেকটা কমে এসেছে। প্রায় ৪ মাসকাল বিরোধী দলগুলো সংসদ অধিবেংশন বর্জন করে চলেছে।

৫.৫ ১৯৯৫ এর সার্বিক রূপ ঃ

১৯৯৫ সালের সমগ্র সময়টি রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যয় হয় জাতীয় সংসদে থেকে সকল বিরোধী দলেল সদস্যদের একযোগে পদত্যাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ১৯৯২ সাল থেকে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন আন্দোলনের দাবিতে বিরোধী দল যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল তারই চরম সূচি অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৯৫ সালে এসেও বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকে, উপরন্তু এক নতুন সংকটকে নিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাত্রা শুরু করে। সে হচ্ছে, সংসদ থেকে বিরোধী দলের সদস্যদের পদত্যাগ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালের সংবাদপত্রের প্রথম দিনের পাতায় এই বিষয়ক সংবাদই প্রধানভাবে গুরুত্ব লাভ করে। পয়লা জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর এক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের নির্বাচন ফলাফলে বিরোধী দল পেয়েছিল শতকরা ৬৯ ভাগ ভোট। বিএন পি পেয়েছিল শতকরা ৩১ ভাগ ভোট। সংসদ থেকে শতকরা ৬৯ ভাগ ভোটারদের প্রতিনিধিত্বকারী জনপ্রতিনিধিরা পদত্যাগ করার পরে এই সংসদের কোনো বৈধতা বা অস্তিত্ব নেই। বর্তমান সংকট থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্তি দেয়ার একমাত্র পথ হলো রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অবিলম্বে সংসদ ভেঙ্গে দেয়া এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। বিএনপি'র ক্ষমতালিপ্সাই আজ দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। সরকার যদি বর্তমানে সাংবিধানিক উদ্ভুত পরিস্থিতি উপলব্ধি না করে সংবিধান উপেক্ষা করে ক্ষমতা আকড়ে রাখতে চায় তাহলে তারা দেশকে আরও সংকটের দিকে ঠেলে দেবে।

কিন্তু একই দিনের পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার এক জনসভায় এই সম্পর্কিত বক্তব্যও প্রকাশিত হয়। রাজবাড়ীর পাংশায় এক জনসাভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পদত্যাগপত্র পেশের মাধ্যমে বিরোধী এমপিরা জনগনের রায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

তাদের পদত্যাগপত্র পেশের পর বর্তমান সংসদ অবৈধ হয়ে গেছে বলে বিরোধী দল প্রদত্ত বিবৃতির কঠোর সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সংসদে সম্পূর্ণ বৈধ ও সংবিধানসম্মত। এই সংসদে ১৭২ জন নির্বাচিত সাংসদ রয়েছেন। অতএব এই সংসদ বৈধ। সংবিধান এবং বিধি মোতাবেকই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাবো।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পয়লা জানুয়ারি খৃষ্টীয় নববর্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনও রেডিও বাংলাদেশ থেকে একই সঙ্গে প্রচারিত জাতির উদ্দেশ্যে দেয়অ ভাষণে বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সংবিধান সমুন্নত রাখার দায়িত্ব সরকার ও বিরোধীদল উভয়েরই। জনগণকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, যে বিষয় নিয়ে বিরোধী দলের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা সংসদ ত্যাগ করেছেন তা নিস্পত্তির জন্য আমাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল

Dhaka University Institutional Repository

না এবং এখনো নেই। তিনি আরো বলেন, তারা যা চেয়েছিল, সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আমরা তার কোনটাই করতে বাকি রাখিনি। একটি সমাধানে পৌঁছার সময় এখনো আছে। তিনি বলেন, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব থেকে কোন পক্ষ সরে আসলে দেশবাসীর কাছে তাদের একদিন জবাবদিহি করতে হবে। বেগম জিয়া বলেন, আমি আশা করি, বিরোধী দল এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান পরদিন ২রা জানুয়ারি সংবাপত্রে বলেন, এই ভাষণে নতুন কোন একটি কথা ও সংযোজিত হয়নি। গত ক'দিন ধরে তিনি বিভিন্ন সভা সমিতিতে যেসব কথা বলে বক্তৃতা করেছেন, এই বক্তৃতা হুবহু তারই প্রতিধ্বিনি। একমাত্র আত্মপ্রশস্তি গাওয়া এবং বিরোধী দলের ওপর দোষ চাপানো তারা একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই প্রকাশ ঘটেছে এই ভাষণে। সমগ্র জাতি আবারও হতাশাগ্রস্থ হয়েছে। জিল্লুর রহমান বলেন, আমাদের দাবি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা দিয়ে সংসদ ভেঙ্গে নয়া নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বক্তৃতাশেষে প্রধানমন্ত্রী হুমকির যে আভাস দিয়েছেন, বিরোধী দল ঐসব হুমকির কাছে মাথা নত করতে অভ্যস্ত নয়। এ ধরনের বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর থেকে না আসাই ভালো।

এদিকে ২রা জানুয়ারি থেকে রাজধানীতে বিরোধী দলের ডাকে তিনদিনের হরতাল শুরু হয়।

৮ই জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী যান চট্টগ্রামে। সেখানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, ২৫ বছরের শৃঙ্খলিত জীবনের পরিসমাপ্তির ঠিক আগ মুহূর্তে এক শ্রেণীর বিরোধী দল একটি নির্বাচিত সরকারকে অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে সরিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়। তারা চায় তাদের প্রভুদের মাধ্যমে এদেশের ১২ কোটি মানুষকে শৃঙ্খল পড়াতে। বিএনপি সরকার এ শৃঙ্খলকে বিকল করে রেখেছে এবং তা কখনোই হতে দেবে না।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি চেয়ারপার্সন বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি প্রসঙ্গে বলেন, পৃথিবীর কোথাও এ ধরনের সরকার নেই, হয় না। সাময়িক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ ধরনের সরকারের কোনো জবাবদিহিতা থাকে না। জনগণ চায় জবাবদিহিকতামূলক সরকার এবং বিএনপি তা প্রতিষ্ঠা করেছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ঢাকাতে আয়োজিত এক সমাবেশে এদিন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সংবিধান সম্মতভাবে স্পীকারের কাছে বিরোধী দলের সদস্যরা পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। অতএব, তা নিয়ে আর টালবাহানোর অবকাশ নেই। সংবিধানে যা লেখা আছে, পদত্যাগপত্র সম্পর্কে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত জনগণ মানবে না, মানতে পারে না।

শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের এক মাস আগে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের ঘোষণা দেয়া হলো গত ২৯শে ডিসেম্বর, অর্থাৎ বিরোধী দলীয় সদস্যদের পদত্যাগ করার পরদিন। এই বক্তৃতায় যদি তিনি ২৪ ঘণ্টা আগে দিতেন এবং পদত্যাগ করতে রাজি আছেন বলে জানাতেন, তাহলে আমরাও পদত্যাগ করতাম না, সংসদও চলত, তিনি ক্ষমতায়ও থাকতে পারতেন। কিন্তু ২৯ তারিখের পর প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এ প্রসঙ্গে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নির্বাচনের এক মাস আগে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, দিন শেষ হয়ে যাবার পর হলেও আপনি অবস্থার গুরুত্ব বুঝেছেন এবং পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন। দিনক্ষণের বিষয় নয়। জনগণ দেখতে চায়, আপনি পদত্যাগ করতে চেয়েছেন, পদত্যাগ করবেন। নির্বাচনী সিডিউল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ কয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বিরোধী দলের ফর্মূলা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, সংসদ বাতিল এবং ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার দাবি জানিয়ে বলেন, রাষ্ট্রপতি একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয়,

Dhaka University Institutional Repository

নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা করার জন্য আন্দোলনরত সকল রাজনৈতিক দলের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কাজ পরিচালনা করবেন। অন্তবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবে না এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন ও নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। অন্তবর্তী সরকারের দায়িত্ব হবে নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সুনিশ্চিত করা, সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা এবং শুধু জরুরি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা, করা সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার অবলুপ্ত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী সভানেত্রী বলেন, এটাও যদি না মানেন, তাহলে অন্তত রাষ্ট্রপতির অধীনে নির্দলীয় নিরপেক্ষ উপদেষ্টামন্ডলী দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা করারও সুযোগ রয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি জনসমক্ষে যে কথা বলেছেন, সে কথা থেকে পিছপা হলে বাংলার জনগণ তা মেনে নেবে না। সমবেত জনগণ এটা মানবে কিনা জানতে চাইলে তারা গগনবিদারী আওয়াজ 'না' 'না' ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

১০ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের সমাবেশে ভাষণ দানকালে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও সংসদ বাতিলের পর প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টামন্ডলীর অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগ রয়েছে।

১১ জানুয়ারি মুন্সিগঞ্জের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে এখন দুই ধরনের প্রবণতা রয়েছে। একটি হচ্ছে উন্নয়নের প্রবণতা যা সরকার পরিচালনা করছে অন্যটি হলো বিরোধী দলের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা। তিনি আরও বলেন, সংসদ থেকে এমপিদের পদত্যাগসহ তাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে দেবার পরিবর্তে নন ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে একটি নির্বাচিত সরকারকে হঠানোর লক্ষ্যে তারা রাস্তায় নেমেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন যে, রাস্তায় আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি জনগণের সমস্যা সমাধান এবং ভালো করতে আইন পাস করতে পারবে? তিনি বলেন, সরকারের বিরোধিতা করার জন্য অন্য কোন ইস্যু না পেয়ে বিরোধী দল তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু উত্থাপন করেছে। কিন্তু বিশ্বের কোথাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো কিছু নেই।

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সর্বক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। কোন মনোনীত ব্যক্তি দেশ পরিচালনা করতে পারবে না। তিনি বলেন, অনির্বাচিত ব্যক্তি দেশ পরিচালনা করলে তা হবে সংবিধান বিরোধী এবং তা জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতিরও বরখেলাপ হবে। বিএনপি সরকার এমন কিছুই করবে না, যা সংবিধান বিরোধী।

১২ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যশোরের নয়াপাড়ার জনসভায় ভাষণ দানকালে বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে বলেছেন, পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সাংবিধানিক রাজনীতিতে ফিরে আসুন।

১৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের এক প্রতিবাদী পদযাত্রা কর্মসূচি উদ্বোধনকালে সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের ৩০ দিন আগে নয়, তফসিল ঘোষনার সাথে সাথেই প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরহাতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আপনি পদত্যাগ করবেন বলেছেন, কথার হেরফের করবেন না। ঘোষণা থেকে সরে গেলে জনগণ আপনাকে ছাড়বে না। শেখ হাসিনা ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ এনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারক দোষারোপ করে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হবার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে নতুন ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি বলেন, এর পরিণতি ভালো হবে না। আমরা তাকে নিরপেক্ষ দেখতে চাই।

১৫ জানুয়ারি কুমিল্লায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে জাতীয় সংসদে ফিরে এসে তাদের ওপর জনগণের অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য বিরোধীদের প্রতি পুনরায় আহবান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধান অনুযায়ী দেশ চলছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। যে কেউ জনজীবনে দুর্ভোগের সৃষ্টি করবে, দেশের আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা হবে।

১৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী বিভাগের বিএনপি সম্মেলন উদ্বোধনকালে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে পারে না। কারন, দ্বাদশ সংশোধনী আমরা একা করিনি। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে ফর্মূলা বিরোধী দল দিয়েছে জনগণ তা গ্রহণ করেনি। তাই বিরোধী দল জোরগলায় কোন কথা বলতে পারছে না। তিনি জোর গলায় বলেন, দেশ সংবিধান মোতাবেক চলছে এবং চলবে। বিরোধী দলের দাবি লাভ করে দিয়ে বলেন, এই সংসদের বৈধতা নেই এটা মিথ্যা, ভুল কথা। বিরোধীদল জনগণের ভোট নিয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করল। তারা জানে না, কত বড় ভুল তারা করল।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিএনপি একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। আর বিএনপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য রাজাকার, স্বৈরাচার ও হাইজাকাররা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাদের সামনে কোন কর্মসূচি নেই তাই তারা দিশেহারা চোখে অন্ধকার দেখছে বিএনপিকে তারা শান্তিতে দেশ চালাতে দিতে চায় না।

১৯ জানুয়ারি দেশব্যাপী বিরোধী দলের ডাকে রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়।

২২ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের এক বর্ধিত সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উস্কানির কারণেই আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি দিতে বাধ্য হয়েছি। সভায় তিনি বলেন, আমাদের পদত্যাগের সময় সারাদেশের প্যানিক সৃষ্টি করা হয়েছিল দেশ সংঘাতের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সাংবিধানিকভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পদত্যাগ করে চুপচাপই ছিলাম। সংঘাত নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ের জন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে উস্কে দিয়ে ঘোষণা দিলেন। দেশে কিছুই হচ্ছে না হবেও না। কিছু

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার জন্য কর্মসূচি ঘোষণা ছাড়া আমাদের আর কি পথ ছিল। তিনি বলেন, সংসদে ১৪৭ জন বিরোধী দলের সদস্যকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। তা না করে তারা যেটুকু আছে, সেইটুকু নিয়েই ক্ষমতা আঁকড়ে আছেন।

এদিকে ২২ জানুয়ারি থেকে সারাদেশে শুরু হয় ৭২ ঘণ্টার শিক্ষা ধর্মঘট ও রাজপথ, রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি। প্রথম দিনে চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় একজন, দ্বিতীয় দিন নারায়ণগঞ্জে ২ জন নিহত হয়। শত শত ধর্মঘটী এই দিনের সংঘর্ষে আহত হয়। বিভিন্ন স্থানে রেললাইন পর্যন্ত বিক্ষোভকারীরা তুলে নেয়।

২২ জানুয়ারি গোপালগঞ্জ সফরকালে প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচিতে বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারতের কোন কর্মসূচি না থাকলেও তিনি দুপুর ১টায় বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত করতে যান এবং প্রায় ৫ মিনিট সেখানে অবস্থান করেন।

২৩ জানুয়ারি রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে তিনটি প্রধান বিরোধী দল মিছিল নিয়ে টিভি ভবন ঘেরাও করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় বিক্ষিপ্ত বোমা বিস্ফোরণ এবং পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাসে রামপুরা থেকে মালিবাগ লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত সড়কে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘেরাও কর্মসূচির আগে এক সমাবেশে বলেন, রেডিও টেলিভিশন জনগণের ঢাকায় চলে। সেখানে প্রতিদিন একই চেহারা দেখতে জনগণ রাজি নয়। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী রেডিও টিভির স্বায়ত্তশাসন দিন, নইলে গদি ছাড়ুন।

২৪ জানুয়ারি রাজধানী ঢাকায় অর্ধ দিবস হরতাল চলাকালে পুলিশের সঙ্গে পিকেটারদের সংঘর্ষ, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। ফার্মগেটসহ কয়েকটি স্থানে পুলিশ হরতাল সমর্থকদের বেধরক লাঠিপেটা করে। এতে আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, অ্যাডভোকেটর সাহারা খাতুনসহ প্রায় একশজন আহত হন। হরতালের সময় বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশ কলেজ ছাত্রী, তরুন তরুনীসহ ১৮জনকে গ্রেফতার করে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ফার্মগেট এলাকা দিয়ে যাওয়া-আসার সময় পিকেটারদের বাঁধার মুখে পড়েন। হোটেল সোনারগাঁওয়ে বিনিয়োগ সম্মেলনে বক্তৃতা শেষে ফিরবার পথে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী গাড়ির ১০/১৫ হাত দূরে ২টি হাতবোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরিত বোমার ধোঁয়া উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি দ্রুত তাঁর কার্যালয়ে দিকে চলে যায়।

২৪ জানুয়ারি বিরোধী দলের হরতাল চলাকালে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী গাড়ি বহনের সামনে হাতবোমা নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী ২৬ জানুয়ারি সংসদে এক বিবৃতিতে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে এবং তদন্তের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ঘটনার দিন প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগ সম্মেলন উদ্বোন করে ফিরছিলেন। এর আগে সকাল ৮টা থেকেই আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী ও অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনের নেতৃত্বে ২০০ থেকে ২৫০ জন লোক মিছিল করে হোটেল সোনারগাঁও থেকে বিজয় সরণি পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করছিলেন ১১টা ৩৪ মিনিটের দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির বহর তেজকুনি পাড়া অতিক্রম করার সময় পূর্ব গলি থেকে হরতালকারীরা একটি বোমা নিক্ষেপ করে। ঐ বোমা বিস্ফোরণ একজন কনস্টেবল ও একজন সহকারী পুলিশ কমিশনারের পায়ে আঘাত লাগে।

কিন্তু পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করে ঢাকার এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গত ২৪ জানুয়ারি হরতালের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লোকেরাই প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহরের সামনে পটকা ফুটিয়েছে।

২৫ জানুয়ারি সারাদেশে বিরোধী দলের আহবানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। দেশে অব্যাহত প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখে ২৫ জানুয়ারি সরকার দেশে ৪টি সংসদীয় আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করে। সকল বিরোধী দলের বর্জনের ফলে সংবাদপত্রের ভাষায় সম্পূর্ণ ভোটারবিহীন ভাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সভাপতিমন্ডলীর সভায় আরও বলা হয় যে, এ সরকারের অধীনে যে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

নয় তা উপনির্বাচনে আবারও প্রমাণ হয়েছে। জাতীয় সংসদের ৪টি উপনির্বাচনে বিরোধী দল অংশগ্রহণ না করায় জনগণ এ নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শতকরা ১০ ভাগ ভোটারও ভোটকেন্দ্রে যায়নি। আওয়ামী লীগ আরও বলেছে যে, বিরোধী দলবিহীন এ উপনির্বাচনেও সরকারি দল নির্বাচনের দিনে একজনকে হত্যা করেছে সন্ত্রাস চালিয়েছে ও ভোট কারচুপি করেছে।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতালিপ্সাই আজ দেশে গভীর রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। সরকার যদি বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চায় তাহলে সংকট আরও বাড়বে, যার পরিণাম হবে ভয়াবহ।

২৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী যান নওয়াবগঞ্জের ভোলাহাটে। সেখানে তিনি বলেন, যথাসময়ে উপযুক্ত সাংবিধানিক পদক্ষেপটি নেয়া হবে। তিনি সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনায় তার সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

৬ ফেব্রুয়ারি স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বিরোধীদলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ পত্র সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সংসদ থেকে পদত্যাগকারী ১৪৭ জন বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে জাতীয় পার্টির এইচ.এম. এরশাদ, এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগের দবিরুল ইসলামের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। বাকী ১৪৪ জনের পদত্যাগ পত্র প্রত্যাখ্যান করেন।

স্পীকার রুলিংয়ে স্পষ্টভাবে মতামত দেন যে, কারণ দর্শানোসহ পদত্যাগপত্রগুলো গণতন্ত্রের মূল নীতিমালার পরিপন্থী এবং রাষ্ট্রীয় মৌলিক নীতিসমূহের বিরোধী যা সংবিধানের ৬৭(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং আমার অভিমত হচ্ছে, ঐ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৪৪ জনের পদত্যাগপত্র আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় (জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী, ২৩/২/৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

স্পীকারের রুলিং এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সংসদ সদস্য পদ থেকে বিরোধী দলের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত ও অটুট থাকবে। বিরোধী দলীয় সদস্যদের পদত্যাগ আইনসম্মত ও সংবিধানসম্মত। এ কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে শেখ হাসিনা আরও বলেন, পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন না, এ ধরনের কোন এখতিয়ার স্পিকারের নেই। এ সংক্রান্ত বিষয়ে রুলিং দেয়া সম্পূর্ণরূপে স্পিকারের এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ। যা সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংবিধানকে অবমাননার সামিল। তিনি বলেন, বিরোধী দলীয় সদস্যরা পদত্যাগ করায় পর সংসদ একদলীয় ও অবৈধ হয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, এই পদত্যাগপত্রের কোন শব্দ স্পীকারের পছন্দ না হলে তিনি তা বাদ দিয়ে পড়তে পারেন। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে তা উল্লেখ আছে।

১১ মার্চ রাজশাহীতে চেম্বার নেতাদের সাথে এক বৈঠককালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর আত্মীয়করণের মন্ত্রী এবং এমপিদের ক্ষমতায় আসার আগের ও পরের সম্পত্তি সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হলে দুর্নীতিবাজ বিএনপি সরকারকে হটানো ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা উন্নয়ন ও বিনিয়োগে বাঁধা দিচ্ছি বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। অথচ বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে ১৩টি অর্ধদিবস ও ৪টি পূর্ণদিবস হরতাল ডাকা হয়। তিনি প্রশ্ন করেন বাকি সময়ে দেশে কি উন্নয়ন বা বিনিয়োগ হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়া বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপের ডাকে এবং বিভাগ আন্দোলনের জন্য যে সব হরতাল ধর্মঘট হয়েছে তার দায়িত্বও কি বিরোধী দলের?

১২ ও ১৩ মার্চ বিরোধী দলের ডাকে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। এই সময় চট্টগ্রামে একজন নিহত ও সারাদেশে ২১ জন গ্রেফতার বরণ করে। ১৩ মার্চ হরতাল চলাকালে বিভিন্ন সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের অধীনে নির্বাচনের ফর্মূলা বাতিল করে বলেছেন, নির্বাচনের তিন মাস আগে বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া অন্য কিছু মানবো না। এই দাবি মেনে নিয়ে ঘোষণা দেয়া ছাড়া রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলেও খালেদা জিয়ার সাথে কোন আলোচনা হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২৪ মার্চ সার, চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতের আহবানে অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়।

২৬ মার্চ ঢাকায় তিন বিরোধীদলের অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়।

২৮ মার্চ ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালনকালে এক সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাসার ঠিকানা থেকে একটি কোম্পানীর শেয়ার বিক্রির বিজ্ঞাপন পত্রিকায় দেয়া শুরু হয়েছে। সে কোম্পানীর পরিচালকরা হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর দুই ছেলে, ভাই, ভাবী এবং অন্যরা। কিন্তু কোম্পানীর চেয়ারম্যান কে তা বিজ্ঞাপনে বলা হয়নি। আসলে প্রধানমন্ত্রীই সে কোম্পানির অঘোষিত চেয়ারম্যান।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সংবিধান এবং গণতন্ত্র কোনটাই মানেন না। সংসদ থেকে ১৪৭ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করার পর এ সরকার অবৈধ হয়ে গেছে। এ সরকার আনসারদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে গুলি করেছে। অথচ এর জন্য তখন সংসদ থেকে কোনো অনুমোদন নেয়া হয়নি। তিনি পুলিশের উদ্দেশ্য করে বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাতে পুলিশের রক্ত ঝরেছে, পুলিশ ইন্সপেক্টর ফয়হাদকে ছাত্রদল কর্মীরা খুন করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ন্যায্যমূল্যে সার চাওয়ায় কৃষকদের ওপর গুলি হয়েছে, শ্রমিকরা তাঁদের চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি করেছে বলে তাদের ওপর গুলি হয়েছে। তিনি বলেন, জনগণের টাকায় কেনা গুলি কৃষক-শ্রমিকের ওপর চালানো হয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কত টাকার গুলি করা হয়েছে জনগণ এর হিসাব চায়।

শেখ হাসিনা বলেন, জিয়াউর রহমান আড়াইহাজার সৈনিককে হত্যা করে গদি রক্ষা করতে পারেননি। এরশাদও জনগণের ওপর গুলি চালিয়ে গদি রক্ষা করতে পারেননি, বর্তমান সরকারও পারবে না। তিনি বলেন, বিরোধী দল ঢাকা অবরোধের কর্মসূচী দিয়েছিল। কিন্তু সরকার পুলিশ বাহিনী দিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে অবরোধ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেশে ভয়াবহ সার কেলেংকারীর প্রেক্ষাপটে শিল্পমন্ত্রী এ,এম জহিরউদ্দিন খান ৪ এপ্রিল পদত্যাগ করেছেন। তার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়।

কিন্তু ৫ই এপ্রিল এই পদত্যাগ ঘটনা প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শিল্পমন্ত্রীর পদত্যাগেই সমস্যার সমাধান হবে না। প্রধানমন্ত্রীকেও দুর্নীতির অভিযোগে পদত্যাগ করতে হবে। কৃষক শ্রমিকের পেটে লাথি মেরে ও মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে দেশ শাসন করতে দেয়া হবে না। কৃষকের যে হাত উৎপাদন করে, ফসল ফলায়, খাদ্য জোগায় সেই কৃষকের ওপর গুলি, অত্যাচার-নির্যাতন করে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যাবে না।

শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় অর্থে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে চলেছে। এই সরকারের উন্নয়নের জোয়ারে ভেসেছে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এম,পি তাদের ভাই-বোন ও পদলেহী গোষ্ঠী। অত্যাচারী মন্ত্রী এমপি দিয়ে দেশের মানুষকে আর জিম্মি করে রাখা যাবে না।

শেখ হাসিনা বলেন, কৃষক বাঁচাও, শ্রমিক বাঁচাও দেশ বাঁচাও কর্মসূচি নিয়ে আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে দু'টি চিঠি পাঠিয়েছি। আমাদের দাবি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে এ অবস্থা হতো না। চিঠি দু'টি গ্রহণ করা হলেও কোনো উত্তর পাইনি। প্রধানমন্ত্রীও কোন পদক্ষেপ নেননি। ১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ফতুল্লায় এক জনসমাবেশে বলেন, বিরোধী দলগুলো বৈঠকে চটকদারি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছে যে, তারা নির্বাচিত হলে জনগণের জন্য অনেক কিছু করবে। কিন্তু তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলো যমুনা সেতু নির্মান, বড় পুকুরিয়ায় কয়লা ও মধ্যপাড়ায় কঠিনশিলা উত্তোলন, মহিলা ও যুবকদের ঋণ সুবিধা এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচিসহ জনকল্যাণমূলক সকল কর্মসূচি বন্ধ করে দেবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন খাতে বিএনপি সরকারের গৃহীত ব্যাপক কর্মসূচির ফলে দেশে বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা বদলেছে। বর্তমানে দেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি নয়, উদীয়মান বাংলাদেশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনরা রাঙ্গুনিয়া কলেজ মাঠে এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন যে, ক্ষমতায় গেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে নির্বাচন করবো।

২৮ শে এপ্রিল বিবিসি কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিরোধী দলগুলোর প্রস্তাব করেছিল যে, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল দলের মতামত নিয়েই এই পদে কাউকে নিয়োগ করা হোক। কিন্তু এই একতরফা নিয়োগ প্রমাণ করে যে, সরকার নির্বাচনে কারচুপি করতে চায় (রেডিও মনিটরিং রিপোর্ট, রেডিও বাংলাদেশ, ২৮/৪/১৯৯৫)।

কিশোরগঞ্জে ৫ই এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি'র মন্ত্রী, এমপি ও নেতা কর্মীরা নজিরবিহীন দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে কৃত্রিম সার সংকট সৃষ্টি করে ধানের শীষকে শুকিয়ে মেরেছে। তিনি শ্লোগান দিয়ে বলেন, 'ক্ষুধার জ্বালায় পেটে বিষ, আর নয় ধানের শীষ।'

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, কিশোরগঞ্জে টেক্সটাইল মিলও কালিয়াচাপড়া সুগার মিলসহ দেশের ৫ হাজার মিল কারখানা বন্ধ করেন দিয়ে বিএনপি সরকার দুই লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারীকে পথের ভিখারি বানিয়েছে। তিনি বলেন, খাদ্যের দাবি পূরণে ব্যর্থ এ সরকারের আর এক মুহূর্তও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নাই।

প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে শেখ হাসিনা বলেন, তিনি ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক তথা দেশবাসীকে দেয়া সকল অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। তাঁর কাছে খাদ্যের দাবি জানাতে এসে ক্ষুধার্ত কৃষককে খাদ্যের বদলে বুলেট উপহার দেয়া হয়েছে। সার নিতে হবে ১৯জন কৃষককে গুলি খেয়ে লাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা অশ্রু সজল চোখে সমবেত জনতার কাছে প্রশ্ন রাখেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হয়েও আমি কেন আমার মা, বাবা, ভাইয়ের হত্যার বিচার চাইতে পারবো না?

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে টাঙ্গাইলে ৬ই মে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর মতে যে সব মহল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যাতের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং উৎপাদন ও উন্নয়ন তৎপরতায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে গভর্নর পদ্ধতি আবার চালু করবে বলে দেয়া বিবৃতির সমালোচনা করে বেগম জিয়া বলেন, এর অর্থ, ওই দলটি আবার একদলীয় বাকশাল শাসন কায়েম করবে। তিনি বলেন, এদেশের মানুষ কোনোদিনও কোনো মহলকে এক দলীয় শাসনের পুনরুজ্জীবন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনী গঠন করতে দেবে না।

৭ই মে ঢাকার এক সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নোংরা মিথ্যার রাজনীতি শুরু করেছেন। আওয়ামী লীগ তার গঠনতন্ত্র থেকে অনেক আগেই বাকশাল বাদ দিয়েছে অথচ প্রধানমন্ত্রী জঘন্য মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী আরও বলেন, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের কথা আছে। কিন্তু বিএনপি'র গঠনতন্ত্রে এখনো রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির কথাই বলা আছে। আওয়ামী লীগই দেশে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করতে বিএনপিকে বাধ্য করেছে। কারণ বিএনপি সংসদীয় পদ্ধতি মানতে চায়নি। শেখ হাসিনা আরো বলেন, সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতাবান হয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাদের দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একনায়কতন্ত্রের কায়দায় দেশ চালাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু সবগুলো দল নিয়ে বাকশাল করেছিলেন আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সংবিধান লংঘন করে সম্পূর্ণভাবে একদলীয় সংসদ চালাচ্ছেন। তাঁর স্বামী জিয়াউর রহমানও সংবিধান এবং সামরিক বাহিনীর বিধি ভঙ্গ করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। শেখ হাসিনা আরও বলেন, বাকশাল বহুদলীয় ছিল বলেই জিয়া এর সদস্য হওয়ার জন্য অনেকের দরজায় ধরনা দিয়েছিলেন।

২০শে মে, শনিবার আওয়ামী লীগের প্রধান নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে পুলিশ বাঁধা প্রদান করে। সচিবালয় থেকে একশ গজ দূরত্বে পুলিশি ব্যারিকেডের সামনে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা অবস্থান নেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। একতরফাভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ, ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও তালিকা প্রণয়নের কাজে বিএনপি'র দলীয় লোকদের নিয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনী কারচুপি করার এবং জনগণের ভোটাধিকার হরনের চক্রান্তের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ এই কর্মসূচীর আয়োজন করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ঘেরাওয়ের আগে আয়োজিত এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে সরকার জনগণের ভোটাধিকার হরনের জন্য একতরফাভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিন্দনীয়।

পয়লা জুন বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের পদত্যাগকারী বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল শেরে বাংলা নগরস্থ প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ,কে,এম সাদেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ একতরফাভাবে এবং বিরোধী দলের আলোচনা ছাড়াই নিয়োগের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, যেখানে প্রধান বিরোধী দলের আস্থা অর্জন করা যায়নি সেখানে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ করা উচিত এবং এটা একটা দৃষ্টান্ত হবে।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সাক্ষাতের শুরুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, একতরফাভাবে আপনার নিয়োগ এবং নিয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে আমরা গোড়া থেকেই প্রতিবাদ করে আসছি। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা সংসদের প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলো বারবার বলে আসছে। এমনকি সংসদ ভবনে সরকারের সঙ্গে সংলাপকালেও ঐকমত্য হয়েছিল যে, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হবে। কিন্তু বিচারপতি আব্দুর রউফ প্রধান কর্তৃক নির্বাচন কমিশন পদ থেকে অব্যাহতি নেবার পর তাড়াহুড়ো করে সরকার প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই পদটি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ এবং সকল রাজনৈতিক দলের কাছে আস্থাভাজন একজন ব্যক্তিরই এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। যা আগেই আলোচনার মাধ্যমে করা সম্ভব ছিল।

৭ জুন নারায়ণগঞ্জে ২ জন আওয়ামী লীগ কর্মীর হত্যার প্রতিবাদে শহরে হরতাল পালিত হয়।

১১ জুন কিশোরগঞ্জের কুলিয়াচরে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, দেশের ১২ কোটি মানুষের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বিএনপি সরকার জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বই শুধু রক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

করছে নয়, জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকারও নিশ্চিত করেছে। বিরোধী একটি দলের নাম উল্লেখ না করে তিনি তাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, তারা দেশের ৭ কোটি মানুষের দায়িত্ব কাঁধে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন, তারা ১২ কোটি মানুষের দায়িত্ব কিভাবে কাঁধে নিতে পারে?

২২ জুন কুড়িগ্রামে রাজিবপুরে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ভাত ও ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য বিএনপি সরকারকে উৎখাত করতে দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, খালেদা জিয়া দিল্লীতে বেড়াতে গিয়ে নরসিমা রাওয়ের সাথে আলোচনার পর না বুঝে যুক্ত ইশতেহারে যে সই করেছেন তাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিক্রি হয়ে গেছে। তিনি দেশের স্বাধীনতা বিক্রি করে দিয়েছেন।

১৬ জুলাই বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের জাতীয় সংসদের অধিবেশনে একাধিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিতির প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের কাছে প্রেসিডেন্টের মতামত চাওয়ার বিষয়টির ওপরে শুনানি সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে শুরু হয়।

২৭ জুলাই বিরোধী দলীয় এমপিদের একাধিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিতির প্রশ্নে রেফারেন্সের ওপরে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের মতামত প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কাছে পেশ করা হয়। ৩১ জুলাই জাতীয় সংসদের ৮৭ জন বিরোধী দলীয় এমপি'র আসন ২০ জুন থেকে শূন্য ঘোষণা করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য বিজি প্রেসে পাঠানো হয়। অবশিষ্ট ৫৫ জন সদস্যের কাছে সংসদ সচিবালয় থেকে চিঠি পাঠানো হয়।

৩রা আগষ্টের সংবাদ একটি খবর প্রকাশ করে যে, সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, সংসদ উপনেতা প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলীসহ পঞ্চম জাতীয় সংসদের সরকারি ও বিরোদী দলের ২৯৭ জন সদস্য শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুযোগ গ্রহণ করেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ বিরোধী দলের ৮ জন সদস্য এ সুযোগ গ্রহণ করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

৯ আগস্ট নির্বাচন কমিশন বন্যাজনিত কারণে উপনিবৃঅচনের মেয়াদ নিধারিত সময় ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী ৯০ দিন বৃদ্ধি করে।

১৪ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের ২০ বছর উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবসের এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা যুবসমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, এখন আর অন্যায়ের প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ গড়ে তুলে প্রতিশোধ নিতে হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী আরও বলেন, যদি দেখতাম সাধারণ মানুষ সুখে শান্তিতে আছে তাহলে আমি রাজনীতিতে আসতাম না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে জন্য নিজের জীবন বিলিয়েছেন। সেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য রাজনীতিতে আসতে বাধ্য হয়েছি। সাধারণ মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করব।

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড দিবসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আহবানে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, রেডিও টিভিতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারসহ অন্যান্য দাবীতে আওয়ামী লীগ এই হরতালের ডাক দেয়। এছাড়া, শোককে শক্তিতে পরিণত করে জনগণের অধিকার আদায়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহবান জানিয়ে ১৫ই আগস্ট মঙ্গলবার সারাদেশে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। ১৯৭৫ সালের এই কালো রাতে স্বাধীনতা ও মানবতার শত্রু নবঘাতকের দল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শোকের এই দিনটিকে জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী পার্টি, সিপিবি, গণফোরাম, ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনসহ বহু সংগঠন এই শোকাবহ বেদনাবিধূর দিবসটি পালন করে।

২৭শে আগস্ট পান্থপথের এক সমাবেশ শেষে নির্বাচন কমিশন অভিমুখী আওয়ামী লীগের শান্তিপুর্ণ মিছিলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সশস্ত্র হামলা ও পুলিশের গুলি, লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে রহমান (২৬) নামে আওয়ামী লীগের একজন কর্মী নিহত এবং দু'শতাধিক আহত হয়। ফার্মগেট এলাকায় এই হামলা চালানো হয়। সমাবেশ ও মিছিলে যোগদানের জন্য সায়েদাবাদের সমবেত আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর পুলিশ হামলা চালালে

Dhaka University Institutional Repository

কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। আওয়ামী লীগ দাবি করে তাদের ২ জন কর্মী মারা গেছে। নির্বাচন কমিশনের গৃহীত 'স্বৈরাচারী' পদক্ষেপের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ পূর্বঘোষিত পান্থপথে সমাবেশ শেষে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেছিল।

২৭শে আগস্ট ইয়াসমীন নামে এক তরুনীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার ঘটনায় যুদ্ধ প্রতিবাদী জনতাকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষনের মাধ্যমে পুলিশ দিনাজপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে ৭ জনকে হত্যা করে। এতে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। এ ঘণ্টায় জনতা মারমুখী হয়ে শহরের ৪টি পুলিশ ফাঁড়ি ও পুলিশের ৪টি গাড়ী পুড়িয়ে দেয়। সন্ধ্যায় কিছু জনতা দিনাজপুর পুলিশের গোয়েন্দা অফিস জ্বালিয়ে দেয়। পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ ও গণহত্যার প্রতিবাদে সর্বদলীয়ভাবে সকাল সন্ধ্যা হরতাল আহবান করা হয়। জেলা মেজিস্ট্রেট রাত ৯টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য শহরে সান্ধ্য আইন জারির কথা ঘোষণা করেন।

২৮ শে আগস্ট অশান্ত দিনাজপুরে বিক্ষুব্ধ জনতা সান্ধ্য আইন লংঘন করে সারাদিন খণ্ড বিখণ্ড মিছিল, সড়কসমূহে ব্যারিকেড, কাস্টমস গুদাম লুট অগ্নিসংযোগ, সদর টিন, অফিস ও বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। নিহতদের গায়েবানা জানাযায় হাজার হাজার মানুষ অংশ নেয়। হাজার হাজার মানুষ কোতোয়ালী থানা আক্রমণ করতে গেলে পুলিশ ফাঁকাগুলি ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পুলিশ সুপারকে প্রত্যাহার করা হয় এবং তরুনী ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ৩ জন পুলিশ সদস্যকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়।

২৯শে আগস্ট বিক্ষুব্ধ দিনাজপুর পরিদর্শনে যান শেখ হাসিনা। সেখানে এক সমাবেশে তিনি বলেন, দেশে আইনের শাসন নেই, বিচার নেই, বিচার চাইলে খুন করে মায়ের বুক খালি করা হচ্ছে। খালেদা জিয়াকে খুনি আখ্যায়িত করে তিনি বলেন। পুলিশের হেফাজতে তরুনীর ইজ্জত হরণ করার পর হত্যা করা হয়েছে; এর যদি বিচার না হয়ে তাহলে মানুষ কোথায় যাবে? আর বিচার চাইতে গেলে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে সাতজন নিরপরাধ মানুষকে, নেত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে, এবার যেতে হবে। অন্যায় অত্যাচার করে টিকে থাকা যায় না, অতীতে ও কেউ টিকে থাকতে পারেনি, মানুষের রক্ত মরেছে, এখন তোমার যাওয়ার পালা।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, এই সরকার মিথ্যার বেসাতি করে ভূয়া প্রেসনোট দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায়। প্রেসনোট পড়ে মনে হয় প্রসিদ্ধ নয়, জনগণই যেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ভুল করেছে। প্রেসনোটে পুরো মিথ্যার বয়ান দেয়া হয়েছে। তিনি এর ধিক্কার জানিয়ে টিভি এবং রেডিও শোনা থেকে বিরত থাকার আহবান জানান।

পয়লা সেপ্টেম্বর বিএনপির ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় এক সমাবেশে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, কেউ যদি অন্য কোন প্রক্রিয়ায় বিএনপি কে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়, আমরা যে কোনো মুল্যে তা প্রতিহত করব। যে কোন কিছুর বিনিময়ে হলেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখব। অন্য কোনো প্রক্রিয়াকে কাজ করতে দেয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে আবারো খোলামনে আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, নির্বাচনের ৩০ দিন আগে আমি এবং আমার সরকার ক্ষমতা থেকে সরে যাবে। কিন্তু সংবিধানের মধ্যে থেকেই সংকট সমাধানের পথ বের করতে হবে। সংবিধানের বাইরে কোনো কিছু হবে না।

২রা সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণের খোলা মন নিয়ে আলোচনার কোনো সুযোগ রেখেছেন কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন। খোলা মন নিয়ে আলোচনার যে সুযোগ দিয়েছিলাম তিনি তাও গ্রহণ করেননি। বরং আমাদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন। আমরা ভাতে ভয় পাই না। জীবন বাজি রেখেই আমরা রাজপথে নেমেছি।

এদিকে ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর বিরোধী দলের ডাকে ৩২ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৩২ ঘন্টা হরতাল পরবর্তী জনসভায় বলেন, হন্তারক, দুর্নীতিবাজ, ভোট-চোর, সন্ত্রাসী বিএনপি, সরকারের ক্ষমতায় থাকার আর কোনো অধিকার নেই। তিনি বলেন, অভূতপূর্ব হরতালের মধ্য দিয়ে জনগণ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই অবিলম্বে অবৈধ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে সরকারকে পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬ সেপ্টেম্বর সংসদ বাতিল ও সরকারের পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, ৩২ ঘন্টা হরতালকালে মিরপুরে হত্যাকান্ড এবং সংসদ অধিবেশন ডাকার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের আহবানে রাজধানী ঢাকায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পারিত হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের এক বিশেষ জাতীয় কাউন্সিল দলের সভাপতি শেখ হাসিনা প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবির পুনরুল্লেখ করে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে অবিলম্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে বিরোধী দল আহত লাগাতার ৭২ ঘন্টার হরতাল দেশব্যাপী পালন শুরু হয়। এই সময় অফিসগামী লোকদের পিকেটাররা বাঁধা দেন। একটি ঘটনায় একটি প্রাইভেট অফিসের একজন কর্মচারীকে জনৈক ছাত্রলীগ কর্মী আলম 'দিগম্বর' করার ঘটনা সারাদেশে আলোড়ন তোলে।

২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বিদেশী সংস্থার সংবাদদাতা সমিতির (ওকাব) সাথে এক বৈঠকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি সরকারের সঙ্গে কোনো চুক্তি সমঝোতা না লেনদেন না করার জন্য বিদেশী সরকারগুলোর প্রতি আহবানি জানিয়ে বলেন, এ ধরনের চুক্তি হবে অবৈধ, কারণ এই সরকার অবৈধ। তার চুক্তি করার কোন আইনগত অধিকারও নেই।

২৮শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক বিশাল সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংবধিান লংঘনের দায়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করেন। শেখ হাসিনা বলেন,সভা-সমাবেশ করার অধিকার সংবিধানসম্মত অধিকার, কিন্তু আপনি সন্ত্রাসী বাহিনী, গুন্ডা বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে আজকের সমাবেশে যাতে মানুষ আসতে না পারে তার জন্য যে বাঁধার সৃষ্টি করেছেন। এই বাঁধা সৃষ্টি করে আপনি সংবিধান লংঘন করছেন। তিনি বলেন সংবিধান লংঘনের দায়ে আমি প্রধানমন্ত্রীকে অভিযোগ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী পদে পদে সংবিধান লংঘন করেন আর মুখে সংবিধান রক্ষার কথা বলেন।

৩ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজনৈতিক সংকটের একটি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে পত্রযোগে আনুষ্ঠানিক আলোচনার প্রস্তাব দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

৬ অক্টোবর বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীতে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে জানান ৯৬ ঘণ্টার হরতালের পরও যদি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে না নেয়া হয়, তাহলে যেমন মহাসমাবেশ করেছি, তেমনি লোকজন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ীর সামনে অবস্থান ধর্মঘট করবো। যতক্ষণ দাবি আদায় না হবে ততক্ষণ অবস্থান ধর্মঘট চলবে।

৮ই অক্টোবর পাঁচ বিভাগীয় সদরে বিরোদী দল আহুত টানা ৩২ ঘণ্টার হরতাল শেষ হয়েছে। একদলীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধয়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামাত ও জাসদ (রব) পৃথক পৃথকভাবে এ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল।

৮ই অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তবাঞ্চলের জনগণ যখন বন্যার পানিতে ভাসছে বিরোধীদল তখন হরতাল পালন করছে। তিনি প্রশ্ন করেন, এটাই কি তাদের জনগণের প্রতি ভালবাসা? বেগম জিয়া দৃঢ়তার সাথে বলেন, হরতাল দাবি আদায়ের উপায় নয় এবং হরতালের মাধ্যমে দাবি পূরণ হবে না।

১০ অক্টোবর শেখ হাসিনা দিনাজপুরের বন্যাদূর্গত এলাকা পরিদর্শন শেষে একাধিক পথসভায় বলেন, এ সরকার জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। জনগণের দুর্দশা নিয়ে তারা রাজনীতি শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী যতক্ষণ আছেন, টিভি ক্যামেরা যতক্ষণ চালু থাকে ততক্ষণই ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। ক্যামেরা সেই প্রধানমন্ত্রীও নেই, ত্রাণও নেই, এই হলো অবস্থা। এ হচ্ছে বিএনপির রাজনীতি।

Dhaka University Institutional Repository

১৪ই অক্টোবর ঢাকায় সড়ক শ্রমিকদের এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে জনগণের দাবি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেনে নিলে এখনই হরতাল প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। তিনি বলেন, আমরা একের পর এক প্রস্তাব দিচ্ছি, কিন্তু কোনটাই সরকারের পছন্দ হচ্ছে না। সর্বশেষ আমরা '৯১ সালের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার চেয়েছি '৯১ সালে যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করেছিলাম, সে সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীতে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত কেউ ছিল না, এবার আমরা প্রস্তাব দিয়েছি, সরকার ও বিরোধী দলের সমান সংখ্যক উপদেষ্টা থাকবে।

বন্যার কারণে কয়েকটি এলাকাকে হরতালমুক্ত ঘোষণাসহ পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী প্রেরণের দাবি জানান এবং আগামী '৯৬ ঘন্টা হরতাল থেকে বন্যাদূর্গত রাজশাহী বিভাগের সকল জেলাকে মুক্ত ঘোষণা করেন। তিনি বর্তমান ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড বাতিলের দাবিরও উল্লেখ করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে ১৪ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার বাসভবনের বাইরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার প্রস্তাব মতো অবস্থান ধর্মঘট করার প্রয়োজন হবে না। বেগম জিয়া বলেন, আমি আপনাদের সৃষ্ট সমস্যাদির একটা সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য চা খেতে এবং আলোচনা করতে আমার বাসভবনে স্বাগত জানাই, যাতে জাতিকে এরূপ অসুবিধার হাত থেকে মুক্ত করা যায়।

তিনি বলেন, আমি চাই জাতি এরূপ অসুবিধা থেকে মুক্তি পাক। বেগম জিয়া বলেন, বাসভবনের বাইরে রোদের মধ্যে অবস্থান ধর্মঘট করা বরং অস্বস্তিকরই হবে। তিনি বলেন, আমি চাই না 'আপনারা খোলা আকাশের নিচে বসে কষ্ট করুন'।

১৪ই অক্টোবর এক সমাবেশে 'রাজনৈতিক সমস্যা বিরোধী দলের সৃষ্ট নয়' উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী এই সংকটের সৃষ্টি করেছেন। 'লুটপাট' হত্যা, ধর্ষন চালিয়ে সংকটের বিস্তার ঘটিয়েছেন। নিজের সংকটে নিজেই আটকা পড়েছেন। তাই ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায়

Dhaka University Institutional Repository

নেই। শেখ হাসিনা প্রশ্ন করেন, জনগণের ভোটদান ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেন কেড়ে নিতে চান প্রধানমন্ত্রী? এই লোভ মোহ ছেড়ে দিন শেখ হাসিনা বলেন, আমরা হরতাল করতে চাইনি। প্রধানমন্ত্রীই আমাদের হরতাল করার জন্য বাধ্য করেছেন।

তিনি বলেন, গত হরতালে রিকশা চালকদের কিছুটা ছাড় দেয়া হলে সরকার মন্তব্য করেন যে, 'হোমিওপ্যাথি' আন্দোলন করছি। প্রধানমন্ত্রী চাঙ্গা হয়ে বলেন, দাবি মানা লাগবে না। এলোপ্যাথি দিলে এতো কান্নাকাটি কেন।

১৬ই অক্টোবর থেকে শুরু হয় দেশের প্রথম একটানা ৯৬ ঘণ্টার হরতাল। এতে প্রথম দিনেই নিহত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক ছাত্রতো শাহনেওয়াজ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিহত এই ছাত্রলীগ নেতা শাহনেওয়াজের লাশ সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এ দিন বলেছেন, এই হত্যার আমরা প্রতিশোধ নেবো। হত্যাকারীরা রেহাই পাবে না। তিনি এই হত্যার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করে বলেন, এই 'খুনি' সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এক দফার আন্দোলন শুরু হলো। সরকারের পদত্যাগ চাই।

অবশেষে বিরোধীদের দাবির মুখে ১৫ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কি ধরনের হবে তার একটি ধারণা দেন। ঢাকায় ঐদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে ১১ সদস্যের। ৫ জন থাকবেন সরকারি দলের ও ৫ জন থাকবেন বিরোধী দলের এছাড়া প্রধানমন্ত্রী যিনি হবেন, তিনি আমার (বেগম জিয়ার) মনোনীত হবেন। বিরোধী দলের ৫ জনকে উপনির্বাচনের জয়ী হয়ে আসতে হবে।

২৮ শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একটি চিঠি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো হয়। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী সংকট নিরসনে 'খোলামনে' আলোচনার জন্য শেখ হাসিনাকে বৈঠকে বসার আমন্ত্রণ জানান। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে উল্লেখ ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

৩০শে অক্টোবর চট্টগ্রামের উন্নয়নে সরকারের অবহেলা, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকান্ডে অসহযোগিতা ও পদে পদে বাঁধা সৃষ্টির অভিযোগ করে আয়োজিত এক জনসভায় সিটি মেয়র এ,বি,এম মহিউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৮ দফা দাবি উত্থাপন করে বলেন। ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নের সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে তিনি চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন।

২৮শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার চিঠির তড়িৎ উত্তর পাঠান বিরোধী দলের নেত্রী শেষ হাসিনা। তিনি উত্তরে আলোচনার সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা দাবি করেন। ৩রা নভেম্বর এর উত্তরে প্রধানমন্ত্রী আলোচ্যসূচিতে সুনির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত সূচির বিষয়টি আবারও এড়িয়ে যান এবং এর একদিন পরেই চট্টগ্রামে এক সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে অন্যায় ও অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে এই দাবিতে যারা হরতাল, অবরোধের কর্মসূচি দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, দাবিটি নীতিগতভাবেও আমি মেনে নিতে পারি না। সুতরাং আর আলোচনা কিসের?

তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছাড়া আর কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশে নিরপেক্ষ লোক বলে কেউ নেই। তারা বললেই কাউকে এনে আমি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারি না।

প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীরা সাথে সাম্প্রতিক চিঠি চালাচালি প্রসঙ্গে বলেন, ক'জন সিনিয়র সাংবাদিক আমার সাথে দেখা করে বললেন, আপনি বিরোধী দলীয় নেত্রীকে একটা চিঠি লিখতে পারেন কিনা। আমি বললাম, কেন পারব না? তাদের পরামর্শে আমি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখি। তাতে এমন কোন ভাষা লেখা হয়নি যাতে বিরোধী দল আহত হতে পারে। কিন্তু তারা যে চিঠি লিখলেন তাকে চিঠি না বলে বলা চলে বিবৃতি। পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের বিবৃতি দেয়া চলে। তাদের উদ্দেশ্যে আমরা তাদের ভাষায় চিঠি লিখিনি। যাতে তারা বলতে না পারেন যে আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরও আমরা সংযত ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

আরেকটি জবাব দিয়েছি। তারা বলছে এজেন্ডার কথা। আমাদের চিঠিতে এজেন্ডার উল্লেখ করা আছে। আমরা তাদের বলেছি আসন্ন সংসদ নির্বাচন কিভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। তাতে আপনাদের কি সুপারিশ রয়েছে আসুন বসে বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছি। কিন্তু তাঁরা গোঁ ধরে বসে আছেন। এজেন্ডা ছাড়া এগুচ্ছেন না।

৪ঠা নভেম্বর শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর চিঠির জবাবে আর একটি পত্র লেখেন সেই পত্রেও আলোচনার জন্য সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসুচি দাবি করেন।

৬ নভেম্বর বিরোধী দলের আহবানে বিভিন্ন দাবিতে সকাল-সন্ধ্যা সড়ক, রেল ও নৌপথ অবরোধ পালিত হয়।

৭ নভেম্বর বিরোধী দলের অবরোধ কর্মসূচি পালন কালে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ গাড়ি ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ ১৪ জনকে গ্রেফতার করে।

৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালে বিক্ষোভকারীদের তাড়া করতে গিয়ে পুলিশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৩ তলা পর্যন্ত বেপরোয়া হামলা চালায়।

১১ নভেম্বর সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে বিরোধী দল আহুত ৬ দিনের হরতাল সকাল থেকে শুরু হয়।

১২ নভেম্বর হরতালের প্রথম দিনে ঢাকায় অর্ধ শত আহত এবং ৩১জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পত্রের জবাবে আবারও 'তত্ত্বাবধায়ক' শব্দ লেখা থেকে বিরত থাকেন। ফলে চিঠি গালাগালির রাজনীতিতে মূল সমস্যা আর শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়নি।

১৩ই নভেম্বর হরতালের তৃতীয় দিনে পুলিশের সাথে আওয়ামী কর্মীদের সংঘর্ষে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যায়। এই সময় মতিয়া চৌধুরীসহ আরও অনেক কেন্দ্রীয় নেতা পুলিশের হামলায় আহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাৎ হয়। ২৩ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন ১৫ ডিসেম্বর সংসদের ১৪৬টি শূন্য আসনে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে।

২৪ নভেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদে অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস সংসদ ভেঙ্গে দেন। একই তারিখে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টিভি ভাষণে সকল দলকে আহবান জানিয়ে বলেন, আসুন, সবাই মিলে আসন্ন নির্বাচন সফল করি।

২৬ শে নভেম্বর শেখ হাসিনা এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে সরাসরি টেলিফোন করেন কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে প্রত্যাখ্যান হন। তাকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেনে নেয়া যাবে না এবং সংবিধানের বাইরে তিনি যাবেন না।

শেখ হাসিনা টেলিফোনে খালেদা জিয়াকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ ও জাতিকে এই সংকট থেকে তিনিই মুক্ত করতে পারেন। আশা করি আপনি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে উদারতা দেখাবেন এবং এ জন্য ইতিহাসে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

২৬ নভেম্বর রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে আবারও চিঠি চালাচালির একটি ঘটনা ঘটে। এদিন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার অভিনন্দন জানান। তিনি একে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন। পরে শেখ হাসিনা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবটিও কার্যে পরিণত করার আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানান।

২রা ডিসেম্বর শেখ হাসিনা সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, বিএনপি সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের টাকা দলীয় নির্বাচনের প্রচারণায় সরকারি যানবাহন অবাধে ব্যবহার করছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের ইচ্ছে মাফিক বদলি করা হচ্ছে নির্বাচনে কারচুপির সুযোগ সৃষ্টির জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এখন আর সংসদ নেত্রী নন। সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় রয়েছেন রাষ্ট্রপতির অনুরোধক্রমে সরকারি প্রচার মাধ্যম, রেডিও টেলিভিশন এবং সরকারি সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সরকারি টাকায় চলে। প্রধানমন্ত্রী সেগুলো দলীয় কাজে ব্যবহার করছেন। প্রশাসনকেও দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্ষমতা অপব্যবহার করে জনগণের টাকা দলীয় নির্বাচনের কাজে ব্যয় করার কোন অধিকার তার নেই।

৩রা ডিসেম্বর, ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি তার ওপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে পারেন। সংবিধানের ৪৮(২) এবং ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ব্যবহার করতে পারেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি না করেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল (২রা ডিসেম্বর) রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পেলাম। কিন্তু জবাবের অপেক্ষা না করেই তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। বিএনপিকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচন কবরা আর দোযখের আগুন পোড়া একই কথা।

৪ঠা ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন ১৮ জানুয়ারি ১৯৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা দেয়।

৭ ডিসেম্বর, প্রধানমন্ত্রীর অফিস অভিমুখে বিরোধী দলের মিছিল যাওয়াকে কেন্দ্র করে ঢাকা মহানগরীতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে শতাধিক আহত এবং প্রায় ৭০ গ্রেফতার বরণ করে।

৮ ডিসেম্বর পান্থপথে শেখ হাসিনার বক্তৃতাকালে কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও বোমা হামলায় শতাধিক লোক আহত হয়।

৯ ডিসেম্বর বিরোধী দল আহুত রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ৭২ ঘণ্টার হরতাল শুরু হয়। ১২ ডিসেম্বর শেষ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩০ ডিসেম্বর সারাদেশে রাজপথ, রেলপথ, নৌপথ ও সড়ক পথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। এই সময় সারাদেশে বিরোধী দলের সাথে পুলিশ ও সরকারি দলের কর্মীদের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কমনওয়েলথ মহাসচিবের রিপোর্টঃ কমনওয়েলথ মহাসচিব চিফ এমেকা আনিয়াকু কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের উদ্দেশ্যে তাঁর ১৯৯৫ সালের রিপোর্টে বলেছেন, বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো আলোচনা আবার শুরু করতে সম্মত হলে তার বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান স্টিফেনের গত বছরে রেখে যাওয়া প্রস্তাবগুলো এর ভিত্তি হিসেবে এখনো কাজ করতে পারে।

রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট অব্যাহত রয়েছে এবং মহাসচিব দু'পক্ষের সমঝোতার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৯৫ সালে দেশের বিরোধী দলগুলো সমাবেশ করেছে ১৪২টি, তিন দলের প্রধান নেতৃবৃন্দ বিবৃতি দিয়েছেন ১০৪টি এবং হরতাল ডাকা হয়েছে ১৭১টি। এ জন্য ১৯৯৫ সাল বক্তৃতা বিবৃতি এবং সমাবেশ ও হরতালের বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গত বছরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রমাগত হরতাল এবং ঘেরাও অবরোধ কর্মসূচিতে একদিকে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে, অন্যদিকে দেশের জনগণকে ঠেলে দেয়া হয়েছে চরম দুরবস্থার মধ্যে।

১৯৯৫ সালে সকল বিরোধী দল ১৯৯টি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। সবচেয়ে বেশী সভা সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ। এর সংখ্যা ৭০টি। এইসব সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সবচেয়ে বেশী বক্তৃতা করেন। জাতীয় পার্টি ৩৫টি এবং জামায়াত ৩১টি সমাবেশ করে। এ সালে বক্তৃতা সমাবেশ ছাড়া বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিবৃতির কারণেও স্মরণীয় হয়ে আসে। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের ইসলামীর বিভিন্ন নেতা ১০৪টি বিবৃতি দেন। এই সালে গেরাও অবরোধের মত ঘটনা ঘটেছে ১৮টি। বিরোধী দলের ঘেরাও অবরোধের কারণে জনগণ ও সরকারের জানমালের ও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিদায়ী বছরে ৪১টি হরতাল হয়েছে। গত ২৫ বছরে ৯৫ সালেই সর্বাধিক সংখ্যক হরতাল হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান মিলিয়ে ১৭১টি হরতাল হয়েছে। '৯৪ সালে আঞ্চলিকসহ ছোট বড় ৭৪টি হরতাল ডাকা হয়েছিল।

গত বছর তিনদল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর অভিন্ন ডাকে রাজধানীসহ দেশব্যাপী ৩৪টি হরতাল ঢাকা হয়।

দৈনিক সংবাদের মতে, ১৯৯৫ সাল ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারও রাজনীতির ফর্মূলার বছর।

৫.৬ ১৯৯৬ এর পরিণতি ও পরবর্তী অবস্থা ঃ

দেশের চলমান রাজনৈতিক ধারা ও সংকটের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন একটা রাজনৈতিক ঘটনা দিয়েই শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালের পয়লা জানুয়ারি। সারা দেশের চল্লিশ হাজার গ্রাম ও বস্তি থেকে প্রায় চার লাখ দরিদ্র নারী পুরুষ রাজধানীতে এক জাতীয় সমাবেশ করে। তৃণমূল জনসংগঠন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশের দরিদ্র নারী-পুরুষরা তাদের দুঃখ এবং এবং দাবির কথা দেশের রাজনৈতিক নেতাদের জানানোর জন্যে ঢাকায় সমবেত হয়েছিল।

কিন্তু সমাবেশের পক্ষে বিপক্ষে অনেক ঘটনাই ঘটে যায়, এমনকি সমাবেশ সমাবেশ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। পয়লা জানুয়ারি (১৯৯৬) এর তৃনমূল জনসংগঠন আয়োজিত দরিদ্র নারী পুরুষের জাতীয় সমাবেশে মৌলবাদ, ফতোয়াবাজ, গ্রাম্য, টাউট বাটপার, ঘুষখোর, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক এবং মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিরোধ করার আহবান জানানো হয়।

গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত দরিদ্র নারী পুরুষরা সমাবেশে দেশে সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার অন্যান্য বণ্টন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সুষম ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, বিকৃত ও অসম বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তন, জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র ও নারীদের অধিকার সংরক্ষণের জোর দাবি জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এই বিশাল সমাবেশে তারা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে : দরিদ্রদের আর সমাজে বঞ্চিত করা চলবে না। তাদের পূর্ণ মর্যাদা ও ভোটের অধিকার দিতে হবে। সমস্ত খাস জমি দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ, জলমহাল ও খাল পুকুর দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দিতে হবে। বর্তমান স্থানীয় সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে একটি বিকেন্দ্রীকরণ শাসন পদ্ধতি চালু করতে হবে যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সম্পৃক্ত হতে পারে।

১৯৯৫ সালের রাজনেতিক রেখা যা ১৯৯৬ সালেও ছড়িয়ে পড়েছিল সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দলের আন্দোলন ১৯৯৬ সালের শুরুতে এক চূড়ান্ত এবং জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। খালেদা জিয়ার সরকার এই সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা দমনে সেনাবাহিনীও তলব করে। এই প্রেক্ষাপটে প্রধান বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেন শেখ হাসিনা পয়লা জানুয়ারি সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন, অবৈধ অস্ত্রধারীদের তান্ডবলীলায় দেশবাসী আজ আতঙ্কগ্রস্ত। দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। হত্যা, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি প্রতিনিয়ত ঘটছে। ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র, সাধারন এবং মা বোনেরা সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। তেমনি এক মুহূর্তে পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, আজ সোমবার থেকে প্রতি জেলায় ও থানায় সশস্ত্র বাহিনীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া ও সেনাবাহিনী। অতীতে ব্যক্তি বিশেষের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে গিয়ে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার হয়েছে। এর ফলে সেনাবাহিনীর বহু অফিসার ও সৈনিকে জীবন হারাতে হয়েছে। অনেক পরিবার স্বজন হারানোর বেদনায় অন্তর কাঁদে।

বারবার ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে জনগণের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীকে দাঁড় করাবার যে প্রক্রিয়া চলেছিল তার বিরুদ্ধেও আমরা সব সময় প্রতিবাদ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিএনপি সরকার বিরোধী দলের দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপেক্ষা করে দেশে একটি সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহন করে। এর প্রতিবাদে ৩ জানুয়ারি ঢাকায় এক জনসভায় বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির প্রতিরোধ জানিয়ে বলেন, সংসদ ভাঙার পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে একবার অনুরোধ করে দেশ পরিচালনা করতে বলেছেন। তিনি এখন আর সংসদ সদস্য নন। আরেকবার তাকে অনুরোধ করুন, যাতে তিনি পদত্যাগ করে জাতিকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে রেহাই দেন। শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভেবেছেন রোজার মাসে আন্দোলন হবে না। তিনি ইচ্ছামত ভোট চুরি করে একদলীয় নির্বাচন করিয়ে নেবেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে, রোজার মাসেও যুদ্ধ হয়েছিল।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাকেও বলছি, পদত্যাগ করে জাতিকে রেহাই দিন। শেখ হাসিনা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, একদলীয় ভাবে কোন নীলনকশার নির্বাচন হতে দেয়া হবে না। তিনি সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, যে কোন মূল্যে আপনারা নীলনকশার নির্বাচন প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিন। গ্রামে-গঞ্জে, মহল্লায় প্রতি মানুষের কাছে যান। তাদের ভোটাধিকার রক্ষার জন্যে পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বস্তুতঃ ক্ষমতাসীন দল বিএনপি একা হয়ে যায়। এদিকে ৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমদ এবং মোহাম্মদ নাসিম রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাথে দেখা করে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে পদত্যাগের মধ্যস্থতা করতে আহবান জানান। কিন্তু রহমান বিশ্বাস এ ব্যাপারে তার ক্ষমতাহীনতার কথা ব্যক্ত করেন। এদিন বিভিন্ন আসনে বিএনপির প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে দলীয় কোন্দলের জের হিসেবে সরকারী দলের বিক্ষুব্ধ অংশ বিরোধীদলের স্টাইলে হরতাল সড়ক অবরোধ ও ধর্মঘট পালন শুরু করে।

৮ জানুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি পরিবর্তে ১৫ ফেব্রুয়ারী ধার্য হয়। এদিকে ৮ ও ৯ জানুয়ারি বিরোধী দলের ডাকে ৪৮ ঘন্টা টানা হরতাল সারাদেশ অচল হয়ে পড়ে। ঢাকায় প্রথম দিন সেনা কর্মকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে হরতালের বিরুদ্ধে 'এ্যাকশনে' গেলে আওয়ামী লীগের নেতা মতিয়া চৌধুরী প্রতিবাদ করেন। একজন সেনা অফিসার এদিন একজন আলোক চিত্রীর ক্যামেরা ও ফিল্ম পর্যন্ত কেড়ে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় বিরোধী দলগুলো ১০ জানুয়ারি সমাবেশ করে ১৭ জানুয়ারি পুনরায় হরতাল আহবান করে। এদিন পান্থপথে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ভোট চুরি করে বিএনপি আবার ক্ষমতাসীন হবে তার বৈধতা দেয়ার জন্য কোন প্রহসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যাবে না, বরং অবাধ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের নিশ্চয়তার জন্য সংগ্রাম করে যাবে। তাতে যত বছরই লাগুক না কেন।

১৬ জানুয়ারি জননেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সারাদেশে থেকে আগত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের এক মহাসমাবেশে বিএনপির একতরফা নির্বাচন বর্জন করার আহবান জানান।

নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই জনসভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপি সরকারের সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ঢাকা-৫ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম।

১৬ জানুয়ারি সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সমাঝোতার চেষ্টায় ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ভেডিড এন মেরিলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ হাইকমিশনার পিটার জে কাউলার, কানাডার হাই কমিশনার জন জে স্কট, জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়োসিকাজু কানেকো অষ্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার কেনেথ উইলিয়াম এসপিনাল এবং ইতালির রাষ্ট্রদূত রাফায়েল মিনিয়েরো খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার সাথে লাগাতার বৈঠক করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন।

১৯৯৬ সালের ১৭ জানুয়ারি রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়ের সূচনা তারিখ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ওদিন বিএনপি-র সরকারের একগুয়েমির ফলশ্রুতিতে একটি একতরফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া হয়। সারাদেশে এদিন বিএনপি রাজনৈতিক খেলা হয়, অর্থাৎ একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোথাও পাতানো প্রার্থী, কোথাও বিদ্রোহী প্রার্থী এদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করে।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই বিরোধী দলগুলো এদিন হরতাল ডেকেছিল। শেখ হাসিনা এদিন এক বিবৃতিতে এই প্রহসনমূলক নিবাচনের পরিনতির দায়-দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকেই বহন করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

এদিন নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে পুলিশ ফার্মগেট এলাকায় আওয়ামী লীগের মিছিলে সাড়াশি আক্রমণ চালালে অর্ধশতাধিক নেতা কর্মী আহত হয়। এদিন মতিয়া চৌধুরী পুলিশ কর্তৃক নাজেহাল হন।

বিরোধী দলগুলো এক যৌথ ঘোষণার খালেদা সরকারের পতন ঘটানোর প্রত্যয় ঘোষণার সাথে অপদার্থ প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) সাদেকেরও পদত্যাগ দাবি করে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে বর্তমান রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট নিরসনে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জাতীয় দাবি না মেনে নিয়ে বিএনপি সরকার একতরফাভাবে যে প্রহসনমূলক নির্বাচনের নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান।

১৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৫ বছর লড়াই সংগ্রাম ও শত শহীদের রক্তদানের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জনগণ অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তি পূর্ণ ভোট প্রদানের যে অধিকার অর্জন করেছিল বর্তমান বেগম খালেদা জিয়ার সরকার তাও কেড়ে নিচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নরঘাতক সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান '৭১ সালে উপনির্বাচন '৮৮তে যেভাবে জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে নির্বাচনের যে প্রহসন করা হয়েছে বেগম খালেদা জিয়া নেই একই কায়দায় অনুরূপ একটি নীল নকশার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আকড়ে থাকার অপচেষ্টায় রক্তে অর্জিত গণতন্ত্রের কবর রচনা করছে। জাতীয় সংসদে শতকরা ৬৯ ভাগ জনগণের প্রতিনিধিত্ব কারী রাজনৈতিক দলসহ সকল বিরোধী দলকে বাদ দিয়ে এবং সমগ্র দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাকে পদদলিত করে বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতা লিপ্সা ও একগুয়েমি আজ দেশকে সংঘর্ষ, সংঘাত ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনা একদলীয় নির্বাচনে শ্রেণী পেশাসহ সর্বস্তরের জনগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকা এবং নির্বাচনী যে কোন রকম কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

বিরোধী দল আহুত সর্বাত্মক হরতালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সেনাবাহিনী বিডিআর এবং পুলিশ বাহিনীর যৌথ কড়া প্রহরায় দু'টি মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন।

বিরোধীরা যদিও প্রধানমন্ত্রীর সিলেট সফর ঠেকাতে পারেনি তবুও নির্বাচনী প্রচারণার এটা খুব শুভ সূচনা নয়। তাছাড়া প্রধান বিরোধীদলগুলো আভাস দিয়েছে যে, আগামী তনি সপ্তাহে বেগম খালেদা জিয়া যে শহরেই যাবেন সে শহরেই হরতাল ডাকা হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দল সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য, পুনর্বার আহবান জানিয়ে বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, গণবিচ্ছিন্ন সরকার গদি রক্ষার জন্য দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তাবাহিনীকে ব্যবহার করছে। কারো অবৈধ ক্ষমতা রক্ষায় ও একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জাতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যস্থায় করা মেনে নেয়া যায় না।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, সংস্কৃতিসেবী, আইনজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, মহিলা, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতিবনিময় সভায় ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে একদলীয় প্রহসন ও গণতন্ত্র হত্যার নীল নকশা হিসেবে চিহ্নিত করে ঐক্যবদ্ধভাবে ও স্ব স্ব অবস্থান থেকে এই নির্বাচন বর্জন, প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার সর্বসম্মত অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে যে কোন কর্মসূচি, এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি নেয়া হলেও দেশ, জাতি, সংবিধান, গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় তা যে কোন মূল্যে বাস্তবায়নের ও দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে। এ জন্য আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সকল রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী পেশায় সংগঠনগুলোর বৃহত্তর সমাবেশ করার কর্মসূচি নেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই মত বিনিময় সভায় বক্তৃতাকালে শেখ হাসিনা ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বন্ধে দেশের সকল সচেতন মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি এই নির্বাচনী তামাশায় যুক্ত না হওয়ার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত রিপার্নিং অফিসার, সহকারী রিটানিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহবান জানানোর পাশাপাশি হুঁশিয়ারি করে দিয়ে বলেন, সেনাবাহিনী পুলিশ, বিডিআর পাহারা চিরদিনের জন্য থাকবে না; জনগণের বিরুদ্ধাচরণ কারণে জনগণ ও সময় মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে সহযোগিতা না দিলে ক্ষমতাসীন সরকার সেগুলো ভেঙ্গে দিবে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত খবর উদ্ধৃত করে শেখ হাসিনা বলেন "অন্তর্বর্তী কালীন কোন সরকার ঐ ধরনের হুমকি দিতে পারে না। নির্বাচনের নামে প্রহসন করার জন্য এই সরকার সকল সীমা লংঘন করছে।"

৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রহসনের নির্বাচন বন্ধ, 'চরম দুর্নীতিবাজ' খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারের পতন ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অর্থবহ নির্বাচনের লক্ষ্যে কার্যত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন— জনগণ যে নির্বাচনে ভোট দিতে যাবে না, রাজনৈতিক দলগুলো বর্জন করেছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেছে, সেই একদলীয় নীলনকশার নির্বাচনী প্রহসন এদেশের মাটিতে হতে পারবে না। তারপরেও মিডিয়া ক্যু করে রেডিও টেলিভিশনে খালেদা জিয়ার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বের করা তামার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করা হলে জনগণ তা মানবে না, বরদাশত্ করবে না। একমাঘে শীত যায় না বলে মত ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা রেডিও টেলিভিশনের কলাকুশলী ও নির্বাচন প্রার্থীসহ প্রহসনের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আরো বলেন, ঘোষণার নির্বাচনে যারা সংসদ সদস্য হবেন, তাদের সময় থাকতেই ভাবতে হবে, পরে জনগণ তাদের কিভাবে 'সমাদর' করবে। যারা ওই ভূতুড়ে নির্বাচনী প্রচার ও ঘোষণার সাথে সম্পৃক্ত হবে, তাদেরও জনগণের 'আদর আপ্যায়ন' পেতে হবে। সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর কাউকে চিরকাল পাহারা দিয়ে রাখবে না।

Dhaka University Institutional Repository

১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ৪৮ ঘন্টা লাগাতার হরতাল এবং ১০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে গণমিছিলসহ ৬ দিনের টানা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন ৬৮ হাজার গ্রামে জনগণের কার্ফ্যু থাকবে। তিনি ঐদিন ঘর থেকে বের না হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কর্মসূচি ঘোষণার পাশাপাশি তিন দলই নির্বাচন সামগ্রী পরিবহন না করার জন্য পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিন দল নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করা এবং টেলিভিশন রেডিওর শিল্পী কুশলীদের নির্বাচনী ফলাফল প্রচার অনুষ্ঠানে অংশ না নেয়ার আহবান জানায়।

নদীর পানি বহুদুরে গড়িয়ে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার টনক নড়ে। তিনি উপলব্ধি করেন তার পায়ের তলায় মাটি নেই। ৩ মার্চ রোববার জাতির উদ্দেশ্যে মিডিয়ায় এক ভাষণে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিনি বুঝেন না বলে এতোদিন জেদ ধরে ছিলেন, সেই তিনিই তিন দফা প্রস্তাব উথাপন করে বলেন, (১) দেশ ও জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে নির্দলীয় সরকার গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত এই সরকার দৈনন্দিন সরকারি কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করবেন, কোন নতুন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। নির্বাচন কমিশন পরিচালনা করার পূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন। (২) ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে আমরা এ বিষয়ে সংবিধান সংশোধনী বিল আনবো। যত শিগগির সম্ভব এই সংশোধনী বিল সংসদে পাস করানোর এবং সংবিধান অনুযায়ী গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে। (৩) অতঃপর ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ৭ম জাতীয় সংসদে নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪ মার্চ বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করায় খালেদা জিয়াকে ধন্যবাদ জানান।

১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৩) সালের এই একতরফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারী দল বিএনপিতেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। দলের একজন এমপি এই নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। বরগুনা থেকে এই বিএনপি

Dhaka University Institutional Repository

নেতা নুরুল ইসলাম মনি ৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে বিবৃতি দেয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। তিনি বিরোধী দলীয় চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে অবিলম্বে 'প্রহসনের' নির্বাচন বন্ধ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের আহবান জানান।

বিবিসি'র সংবাদদাতা রিচার্ড গ্যালপিন তার রিপোর্টে বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সর্বশেষ পর্যায়ে গতকাল রাজশাহী যান। সেখানকার পরিস্থিতি ছিল উত্তেজনাকর। এ সফরের আগে সরকারি ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়। আহত হয় আরো অনেকে। আর যে প্রধান বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচন বর্জন করছে তারা প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে বিঘ্ন ঘটানোর লক্ষ্যে শহরে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং তা কার্যকর করার চেষ্টা চালায়।

প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দর থেকে শহরে আসার পথে তাকে রক্ষা করার জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়। পথের দু'ধারে কয়েকশ' গজ দূরে দূরে মোতায়েন করা হয় সশস্ত্র পুলিশ। শহরের কেন্দ্রস্থলে আধা-সামরিক বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্যকে টহল দিতে দেখা যায়।

সাধারণ ধর্মঘট ও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে প্রধানমন্ত্রীর যানবাহন যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেখানে কোন লোকজন ছিল না বললেই চলে।

প্রধানমন্ত্রীর পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিরোধী দলের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। নির্বাচনী সমাবেশ স্থলের মাত্র কয়েক শ'গজ দূরে বোমার টুকরার আঘাতে একজন পুলিশ মারা যায়। পুলিশ এর জবাবে গুলি চালায়। আরো একজন পুলিশ ও একটি শিশুসহ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পৃথক পৃথক ঘটনায় তারা আহত হয়। বেশ কয়েকজন সাংবাদিক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সহিংসতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী সমাবেশে ভাষণ দেন, যদিও সমাবেশে খুব একটা বেশি লোক হয়নি, হয়তো বা কয়েক হাজার লোক মাত্র। সমাবেশ স্থলের এক সিকিও ভরেনি।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য বিরোধী পক্ষের সমালোচনা করেন। তিনি বিরোধীদলগুলোর বিরুদ্ধের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিতে ভয় পাচ্ছে; কারণ তারা জানে যে, তারা পরাজিত হবে। বিরোধী দলগুলোর বর্জন সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী আরো একবার জনগণের প্রতি ভোট দেয়ার আহবান জানান এই কথা প্রমাণ করতে যে, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা তার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ৮ ফেব্রুয়ারি লালবাগে আওয়ামী লীগ নেতা ও ওয়ার্ড কমিশনার হাজী আলিমকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি এর প্রতিবাদে সমগ্র লালবাগে বলা চলে সারাদিন যুদ্ধ চলে। আলিমের শোক মিছিলেও হামলা করা হয়।

১০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ পুলিশ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মানিক মিয়া এভিনিউতে নির্ধারিত সমাবেশ করে এবং সমাবেশ শেষে ঘোষণা অনুযায়ী প্রধামন্ত্রীর বাসভবনের দিকে গণমিছিল নিয়ে এগিয়ে যায়।

১১ ফেব্রুয়ারি নীলনকশার নির্বাচন বন্ধ করা, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগসহ ৮ দফা দাবীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, বিএনপি সরকারের সীমাহীন ক্ষমতালিপ্সার কারণে সারাদেশে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে দেশে অচিরেই গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে।

নির্বাচনের একদিন মাত্র আগে ১১ ফেব্রুয়ারি বিবিসি এক চাঞ্চল্যকর খবর পরিবেশন করে জানায় যে, দেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীরা তাদের প্রচার অভিযান বাদ দিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কমপক্ষে একশ' জন প্রার্থী তাদের নির্বাচনী এলাকা থেকে পালিয়ে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর ও জয়পুরহাটসহ উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জেলার দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনেকেই প্রাণ ও মানসম্মানের ভয়ে নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে পালিয়ে ঢাকা কিংবা অন্যান্য জেলায় আত্মগোপন করেছেন।

রংপুরে অন্তত ৩০ জন প্রার্থীকে তাদের নিজ এলাকায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। বগুড়ার শিবগঞ্জ এলাকায় অনেক প্রার্থী প্রচারণার কাজ বাদ দিয়ে ঘরে বসে আছেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস এক কলংকজনক ঘটনা ঘটায় বিএনপি। ১৯৮৮ সালে সামরিক সরকার এরশাদ ভোট চুরিতে যে অপকর্ম করেছিল ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তাকেও ছাড়িয়ে যায় বিএনপির খালেদা জিয়ার সরকার। এই সম্পর্কে বিবিসি যে ভাষ্য প্রচার করে তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকার মতো। বিবিসি বলেঃ

> শুক্রবার বিরোধী দলগুলো ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের অবিলম্বে অপসারণ, বৃহস্পতিবারের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা না করা ও এক্ষুণি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে নির্বাচন দেয়ার দাবিতে ঈদের পর তিন দিন সর্বাত্মক অসহযোগিতা তথা চাকা বন্ধের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।
>
> সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তগুলো থেকে বলা যায় যে, এই কর্মসূচি পালিত হবে ঠিকই। আদিকে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি আর অজানা অচেনা কিছু দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যে সাধারণ নির্বাচন হলো তাতে বিএনপি যে একচেটিয়া আসন পাবে তা সবার জানা ছিল আর তা হচ্ছেও। কিন্তু যা দেখে নিজের চোখ কানের ওপর বিশ্বাস নষ্ট করতে হচ্ছে তা হলো, বিএনপি প্রার্থীদের পক্ষে যে বিপুলসংখ্যক ভোটপ্রাপ্তি ঘোষণা হচ্ছে সেটা। এই শহর যতগুলো ভোট কেন্দ্রে গেছি, সহকর্মীদের কাছে অন্য যেগুলোর খবর পেয়েছে আর সংবাদপত্রে যে ক'টা ছবি দেখেছি তাতে পরিস্কারভাবেই বুঝেছি যে, নগণ্য সংখ্যক ভোটারই সেদিন ভোট কেন্দ্রে এসেছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি, এই ঢাকাতেই দু'জন বিএনপি নেতা প্রত্যেকেই এক লাখের উপর ভোট পেয়ে বসে আছেন। আর লক্ষ ছুঁই ছুঁই সংখ্যা দেখানো হয়েছে আরো কত জনের বেলায়।

Dhaka University Institutional Repository

খোদ নির্বাচন কমিশনই এতে হতভম্ব হয়ে গিয়ে এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, স্বাভাবিকভাবে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর সাফল্যের রহস্যটি কোথায় তা তারা খতিয়ে দেখবে। এখন যে ফলাফল আসছে তা বলা হয় অনানুষ্ঠানিক। চলিত ভাষায়, ভোট চুরি বা ভোট ডাকাতি হয়েছে এমন সন্দেহ আছে যেসব ক্ষেত্রে সে সব ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য হচ্ছে, আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণা বন্ধ রেখে শক্তভাবে তদন্ত করা। আর সেই কাজটি পারবে বিনা নির্বাচন কমিশন এখন সেই পরীক্ষারই মুখোমুখি হয়েছে।

ফাঁকা মাঠে গোল করার সুযোগ পেয়েও বাড়াবাড়ি করে বিএনপি নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে—একথা বললেন আজকেই কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু।[৪০]

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে বর্ণনা করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫ জন শিক্ষক আরো এক বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫১ জন শিক্ষকও অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করেন। দেশের শীর্ষ স্থানীয় ৮জন আইনজীবীও নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করে ১৭ ফেব্রুয়ারি বিবৃতি প্রদান করেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কড়া বিবৃতি প্রদান করে ওয়াকার্স পার্টি। তারা বলে, তারা বিএনপি সরকারের পদত্যাগ নয়, অপসারণ করার জন্যে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাবেন। তারা বলেন, গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের পথে এই সরকার উৎখাত হবে।

বিএনপি আয়োজিত ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির একতরফা নির্বাচন যে কতোটা অসার হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ মেলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যের বহর দেখে। মোট ৪৩ জন প্রার্থী ৪৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার মতো 'ম্যানেজ' অবস্থার সৃষ্টি করে, কোন কোন আসনে প্রার্থীও পাওয়া যায়নি। এবার নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল ৪৩টি দল ও জোটের ১৫শ ১৪জন প্রার্থী। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪৪টি আসনের ফলাফল নির্ধারিত হওয়ায় প্রার্থী হচ্ছেন ১৪শ' ৭০।

[40] বিবিসি প্রতিবেদন, রেডিও-মনিটরিং রিপোর্ট, রেডিও বাংলাদেশ, ১৯.০২.১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনার নয় দফা ঃ

এর আগেই ১৫ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে সরকারের সকল দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে নেয়ার আহবান জানিয়ে নয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ঃ

১। এখন থেকে প্রশাসন, সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপতির নির্দেশে পরিচালিত হবে।

২। বেসামরিক প্রশাসন রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সচিবদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

৩। টিএনও, ডিসি, কমিশনার, এসপি ও পুলিশ কমিশনার থানা, জেলা ও বিভাগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবদের নির্দেশ অনুসরন করবেন।

৪। তিন বাহিনী প্রধান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সকল সচিবগণ রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সরকার পরিচালনা করবেন।

৫। বিএনপি সরকারের অনুপস্থিতিতে শান্তিপ্রিয় জনগণ এবং সকল রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতি ও প্রশাসনকে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা করবেন যেন দেশে কোনো সঙ্কট সৃষ্টি না হয়।

এই পরিস্থিতির মাঝেই আসে ১৯৯৭ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আগমনের প্রতিবাদে একুশ উদ্‌যাপন কমিটির সাথে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করে ১৮ ফেব্রুয়ারি দেশের বিশিষ্ট নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও সংস্কৃতিসেবীগণ বিরোধী দল ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে বলে, ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবির যৌক্তিকতাই প্রমাণিত হয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি সম্মিলিত বিরোধী দল ক্ষমতাসীন বিএনপি ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলে, কোন ভোট ডাকাত, গণতন্ত্র হত্যাকারী নতুন করে এদেশে সংসদ ভবনকে কলঙ্কিত করবে তা হতে দেয়া হবে না। অবৈধ কোন সংসদের অধিবেশন বসতে দেয়া হবে না। এজন্য আরো রক্ত দিতে হলে, আরো ত্যাগ স্বীকার করতে হলেও আমরা প্রস্তুত।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে বিরোধী দলগুলো বিএনপি সরকারকে অবৈধ সরকার হিসেবে অভিহিত করে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এ অসহযোগ কর্মসূচি শুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি দেশের সকল সরকারি অফিস, আদালত, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সড়ক, নৌ, রেল ও আকাশ পথ বন্ধ থাকে। এর মধ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে বিরোধী দলের সমাবেশে সশস্ত্র গুন্ডারা গুলী চালালে ৪০ জন আহত হয়। ঢাকায় এদিন মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম ও মওদুদ আহমদসহ ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি তোফায়েল আহমদকেও গ্রেফতার করা হয়। এর আগে জাতীয় পার্টির নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জুও গ্রেফতার হন। ২৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হলে বন্দর নগরী অচল হয়ে পড়ে।

এর আগে ২৩ ফেব্রুয়ারি এক সরকারী প্রেসনোটে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে যথাযথ সময়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। যানবাহন মালিকদের উদ্দেশে বলা হয়, হরতালে কোন যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকার তার ক্ষতিপূরণ করবে। (সরকারী প্রেসনোট, পিআইডি, ঢাকা ২৩.০২.১৯৯৬)

পয়লা মার্চ থেকে বিএনপি সরকার সাংবাদিকদেরও গ্রেফতার করতে শুরু করে। এদিন 'আজকের কাগজ' দৈনিকের প্রধান প্রতিবেদক সৈয়দ বোরহান কবীরকে গ্রেফতার করে সরকার জেলে নিয়ে যায়।

এদিকে ২ ফেব্রুয়ারি বিএনপি সরকার বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের এক স্মরণ সভায় বক্তারা বলেন, খালেদা জিয়ার অবৈধ বিএনপি সরকার ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রহসনমূলক নির্বাচনকে ঘিরে এ পর্যন্ত ৪১ ব্যক্তির প্রাণ নিয়েছে, সারাদেশে রক্তপাত ঘটিয়েছে।

'বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তার সরকারকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছে। বিরোধী দল বলেছে, আলোচনা হতে হবে রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে। এ ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন?' এই প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস বলেন, সাংবিধানিকভাবে আমার ক্ষমতা নেই, তবে

Dhaka University Institutional Repository

কেউ উদ্যোগ নেয়ার কথা বললে শুনতে ভাল লাগে। আমার ইচ্ছা থাকলেও কিছু করার নেই। সংসদীয় পদ্ধতিতে ভারতের রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা আছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সেই ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেই একথা শুনতে খারাপ লাগে।

এরই মধ্যে ৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরোধী নেতা শেখ হাসিনার কাছে একটি পত্র পাঠান। এতে তিনি বলেন,

তারিখ : ৫ মার্চ ১৯৯৬

মিসেস শেখ হাসিনা ওয়াজেদ

সভানেত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ প্রিয় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী,

আসসালামুআলাইকুম।

গত ৩ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ভবিষ্যতে যাতে সকল জাতীয় নির্বঅচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সব নির্বাচনে যাতে দেশের সকল রাজনেতিক দল অংশগ্রহণ করতে পারে — সেই লক্ষ্যে আমি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছে।

এইসব প্রস্তাবকে আলোচ্যসূচী হিসেবে বিবেচনা করে নির্দলীয় সরকারের রূপরেখা প্রণয়ন ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে আমি অবিলম্বে আপনাদের প্রতি আলোচনায় বসমার আহবান জানাচ্ছি।

যত শীঘ্র সম্ভব, কবে এবং কোথায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনায় বসতে পারি সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত আমাদেরকে অবহিত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আশা করি যে, ইনশাআল্লাহ, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আলোচনার মাধ্যমেই বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হবে।

আল্লাহ হাফেজ।

শুভার্থী

খালেদা জিয়া

(মূল কপির ফটো থেকে উদ্ধৃত)

৭ মার্চ শেখ হাসিনা ৫ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে তিনি বলেন,

১। আগামী ৯ মার্চের মধ্যে সকল বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে জেল থেকে মুক্তি নিতে হবে এবং সকল হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। প্রহসনমূলক পুনঃনির্বাচনের সকল প্রক্রিয়া এই মুহূর্ত থেকে বন্ধ ঘোষণা করতে হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারির একদলীয় প্রহসনমূলক জালিয়াতের নির্বাচন বাতিল করতে হবে এবং সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।

৩। আগামী ১০ মার্চের মধ্যে রাষ্ট্রাপতিকে আন্দোলনরত সকল রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং আগামী মে মাসের মধ্যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে।

৪। প্রহসনমূলক নির্বাচন করতে গিয়ে এবং সরকারি সন্ত্রাস ও নির্যাতনে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, সাংবাদিক, পেশাজীবীসহ সাধারণ মানুষের জানমালের ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতিপুরনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে হবে।

১০ মার্চ রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠককালে শেখ হাসিনা তার দাবি উথাপন করেন। রাষ্ট্রপতি একই দিন জাতীয় পার্টির মিজানুর রহমান চৌধুরী, জামাতের মতিউর রহমান নিজামী, বামফ্রন্টের রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, গণফোরামের ড. কামাল হোসেন প্রমুখের সঙ্গেও বৈঠক করেন। সকল দলই ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন বাতিল, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উথাপন করেন। ১১ মার্চ রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস বিএনপি দলের সাথেও বৈঠক করেন।

অনেক ঘণ্টা আলোচনার পরে রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস অবশেষে রণে ভঙ্গ দেন। বিএনপি দল থেকে তাকে বিশেষ কোন বিপ্লবী কর্মকান্ড করার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। ১৫ মার্চ রহমান বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেন, রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার ক্ষমতা সীমিত।

রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের আকস্মিক রণ-ভঙ্গ বিবৃতির কঠোর জবাব দেন বিরোধী দলের নেতা জননেত্রী শেখ হাসিনা। ১৬ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রাষ্ট্রপতির বিবৃতিকে বিএনপির স্বার্থ রক্ষার জন্য বিএনপির চেয়ারপার্সনের

Dhaka University Institutional Repository

মতামতেরই প্রতিধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি রাষ্ট্রপতির বিবৃতিকে সংকট সমাধানের পরিবর্তে দেশকে নৈরাজ্য, সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয়ার ইঙ্গিতবাহী বলেও অভিহিত করেন। শেখ হাসিনা বলেন

সবচেয়ে উদ্বেগ ও শংকার কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ১৫ ফেব্রুয়ারীর ব্যাপক ভোট চুরি ও জালিয়াতির প্রহসনের নির্বাচন, যা ইতিমধ্যেই জাতি প্রত্যাখ্যান করে, সেই নির্বাচনের বৈধতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন। শেখ হাসিনা আরো বলেন, বিএনপির চার দলীয় স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য রাষ্ট্রপতি জনমতের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন, জনগণের ভোট চুরি করে সংবিধানের ৭ ও ১১ অনুচ্ছেদ লংঘন করে। বিএনপি যে অন্যায় করছে সেই অন্যায়কে সাংবিধানিকভাবে জায়েজ করার কৌশল গ্রহণ করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশবাসী লক্ষ্য করেছেন যে জনগণের আন্দোলনের প্রতি কোন প্রকার স্বীকৃতি, সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে রাষ্ট্রপতি জনগনের শান্তি ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিশৃঙ্খলা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি তার সুউচ্চ সাংবিধানিক দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত না থেকে বিএনপি-র চার দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বিএনপি-র চেয়ারপার্সনের-মতামতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

সবচেয়ে উদ্বেগ ও শংকার কারণ হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি তার বিবৃতিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্যাপক ভোট চুরি এবং জালিয়াতের মাধ্যমে যে প্রহসনের নির্বাচন হয়েছে— যা ইতিমধ্যেই জাতি প্রত্যাখ্যান করেছে, তার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেছেন অথচ এই নির্বাচনের কোন সাংবিধানিক ও নৈতিক বৈধতা নেই। শুধু দেশে নয় বিদেশেও এই তথাকথিত নির্বাচনের বৈধতা স্বীকৃত হয়নি।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে আমি আবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই, আওয়ামী লীগ এদেশের জনমানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের সংগ্রাম গত চার দশক যাবৎ যেভাবে করেছে এখনও সেভাবেই চালিয়ে যাবে। আমরা জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে তুলে দিয়ে সাংবিধানিকভাবে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯ মার্চ বিতর্কিত সংসদ ডাকার বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, রাষ্ট্রপতি জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। রাষ্ট্রের কথা, জনগণের দাবি ও মতামতকে উপেক্ষা করে ও সংবিধান লংঘন করে রাষ্ট্রপতি দেশবাসীর সাথে প্রতারণা করেছেন, দেশকে চরম ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ভূমিকা পালন না করে রাষ্ট্রপতি বিএনপির হীনস্বার্থের রক্ষক ও আজ্ঞাবাহী হিসেবে কাজ করেছেন বলে মত ব্যক্ত করার পাশাপাশি শেখ হাসিনা ১৯ মার্চকে জাতির জীবন 'কলঙ্কময় দিন' চিহ্নিত করে ওই দিনকে 'কালো দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। একই সাথে তিনি ওই দিন সংসদ বসানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণকে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড় তোলার আহবান জানিয়েছেন।

১৮ মার্চ এক বিবৃতিতে বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ ১৯ মার্চের 'তথাকথিত' সংসদ অধিবেশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং নতুন প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বর্জনের জন্য ঢাকায় অবস্থিত সকল দূতাবাস, দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রধানদের প্রতি আহবান জানায়।

এই সংবাদের মধ্য দিয়ে দেশের ভবিষ্যত এক অনিশ্চয়তার দিকে যাত্রা করে। একটা আশংকায় নাগরিক জীবন সন্ত্রস্ত হতে থাকে।

১৯ মার্চ বিতর্কিত ষষ্ঠ সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। এই সংসদ ঘেরাও কর্মসূচী শুরুর আগে বিরোধী দলের নেতা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অবৈধ সংসদ বাতিল করে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশে আগুন জ্বলবে। তিনি 'অবৈধ সরকারকে' প্রতিহত করতে যার যা কিছু আছে তা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, সংবিধানের ৭১ ধারা লংঘন করে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর শপথ নিয়ে জনগণকে অপমাণিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ জনগণ মানবে না।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি 'অবৈধ সরকারের' মন্ত্রী-এমপিদের চিহ্নিত করার আহবান জানিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা তাদের চিনে রাখুন। যাকে যেখানে পাবেন শাস্তি দিবেন।' তাদেরকে রক্ষা না করার জন্য পুলিশ বিডিআরদের প্রতি আহবান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ভোট চোরদের রক্ষা করবেন না, তাহলে জনগণ আপনাদের ক্ষমতা করবে না। এর আগেই দেশজুড়ে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের অব্যাহত প্রতিবাদের মুখে খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী, ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ১৩ জন প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কাছে শপথ নেয়। রাষ্ট্রপতি প্রথমে বর্তমান সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হিসেবে বেগম জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বঙ্গভবনের দরবার হলে অনাড়ম্বর ও সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে এ শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

২০ মার্চ দেশে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে। সরকার বিরোধী দলের লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সেনাবাহিনীই এই পর্যায়ে সরকারের একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে। বিএনপি সরকার এদিন এক প্রেসনোনেট বলে ঃ

'সরকার উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে গত কয়েকদিন ধরে মহলের বেআইনী ও সহিংস তৎপরতার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাতা ব্যাহত হচ্ছে। এ ধরনের তৎপরতার ফলে যোগাযোগ, স্বাভাবিক ব্যবসা, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য এবং শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। বিভিন্ন স্থানে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর চলাচালে বিঘ্ন সৃষ্টির ফলে জনগণের ব্যাপক দুর্ভোগের কারণ হচ্ছে। এতে বলা হয়, জনগণের দরিদ্র অংশ, বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষ উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে দারুন দুর্ভোগের মুখোমুখি হচ্ছেন।

প্রেসনোটে আরও বলা হয়, এ পরিস্থিতিতে সরকার ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (সরকারী প্রেসনোট, পিআইডি, ২০ মার্চ, ১৯৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

২৩ মার্চ থেকে সরকার বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। এদিন থেকে প্রহসনের নির্বাচন ও অবৈধ সংসদ বাতিল, অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বিকেল থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তা ও সচিবালয় ঘিরে ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে অবিরাম অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়। মেয়র হানিফ ঘোষণা করেছেন, অবৈধ খালেদা সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত রাত-দিন ধরে অবস্থান ধর্মঘট চলবে। তিনি এ ব্যাপারে ঢাকার ৮৬ লাখ মানুষের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

২৫ মার্চ সকাল থেকে সচিবালয় বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে সবগুলো ভবনের লিফট বন্ধ হওয়ায় সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পায়ে হেঁটে নোমে সমাবেশে যোগ দেন। একাত্মতা প্রকাশকারী সচিব চারজন হচ্ছেন; স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ আহমদ, স্থানীয় সরকার সচিব সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী, যোগাযোগ সচিব ওয়ালিউল ইসলাম ও তথ্য সচিব সৈয়দ আমির-উল-মুলক।

২৭ মার্চ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ৩৫ জন সচিব দেখা করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের অধীনে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। এদিকে, অবশেষে ২৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে অবিলম্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকায় গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। তিনি একই সঙ্গে সংবিধান ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল যা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল নামে পরিচিত তাতে সম্মতি দেয়ার জন্যও রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানান।

অবশেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ ঃ

এর আগে ২৭ মার্চ ভোর রাতে বিএনপি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (ত্রয়োদশ সংশোধনী) বিল জাতীয় সংসদে পাস করে। অবশেষে রাত পৌনে ৪টায় কয়েকটি অনুচ্ছেদের সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং নয়া অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করার মাধ্যমে গণভোট এড়ানো হয়। ফলে রাষ্ট্রপতিকে এই সংশোধনী বিলে সম্মতি দিতে আর গণভোটের প্রয়োজন হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

রাত ১১টা ৫০ মিনিটে বিলটি পাসের প্রক্রিয়া শুরু হলেও নানা ভুলত্রুটি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষ্যে অসঙ্গতি, গণভোট অনুষ্ঠান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নয়া সংশোধনী, সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার, ভাষার পরিবর্তন এবং আইনমন্ত্রীর অপরিপক্কতার কারণে পাস করতে দীর্ঘ ৬ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশোধনী বিলটি বিভক্তি ভোটে ২৬৮-০ ভোটে পাস হয়। বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি।

রাজধানী ঢাকার মতো অবৈধ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবদায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ঢাকার বাইরে রাজশাহী, সিলেট, নরসিংদী, মৌলভী বাজার, সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে 'জনতার মঞ্চ' স্থাপন করা হয়। প্রতিটি মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করা হয়, অবৈধ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত মঞ্চ থেকেই বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

এদিকে, রাজধানী সচিবালয় ও অন্যান্য সরকারি অফিসসহ সারাদেশ থেকে খবর আসতে থাকে যে, সর্বত্র সরকারি অফিস থেকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছবি অপসারণ শুরু হয়। সচিবালয়ের সেনাবাহিনী প্রবেশ করলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বলা চলে বিস্ফোরণই ঘটে। এর ফলে প্রশাসন সমূলে ভেঙ্গে পড়ে। একযোগে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে জনতার মঞ্চে যোগ দেয়।

খালেদা জিয়া সরকারে বিদায় ঃ

২৯ মার্চ দেশের সর্বত্র একটাই আলোচনা চলতে থাকে, প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে খালেদা জিয়া কখন বিদায় হচ্ছেন। অবশেষে ৩০ মার্চ বিএনপি সরকারের অপমানজনক পতন ঘটে। খালেদা জিয়া এদিন পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন প্রধান উপদেষ্টা পদে শপথ নেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচার বিশিষ্ট লেখক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। শপথ অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাও উপস্থিত থাকেন।

খালেদা জিয়ার পদত্যাগের সংবাদের সাথে সাথে সারাদেশে আনন্দ বয়ে যায়। লাখো মানুষ উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। অনেকটা ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বরের স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের মতোই ঘটনাটি

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে। বিরোধী দল ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। ২৬ ও ২৭ মার্চ বিরতিসহ গত ৯ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২০ দিন অসহযোগ কর্মসূচি পালিত হয়।

একটি সংবাদপত্র জনগণের বিজয় নিয়ে ৩১ মার্চ যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তা ছিল নিম্নরুপ ঃ

"আট দিন ধরে জনতার মঞ্চকে ঘিরে রাখো জনতার অপেক্ষার অবসান ঘটেছে। সময় তখন ৬টা ১০ মিনিট। তোপখানা রোডে জনতার মঞ্চ ঘিরে যতদুর দৃষ্টি যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ঘোষণা করলেন, খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেছেন। জনসমুদ্রে যেন জোয়ার আসে। উল্লাসে ফেটে পড়ে জনতা। লাখো জনতা উন্মাতাল হয়ে নাচতে থাকে, একে অপরকে জড়িয়ে দরে, জয়বাংলা ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে রাজপথ। উল্লাস থামার পর মাইকে আসেন জনতার মঞ্চের নায়ক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। বিজয়ের আনন্দে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। বিজয়ের মুহুর্তে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন হানিফ। মুহুর্তেই সে আবেগ ছড়িয়ে পড়ে গোটা জনসমাবেশে, কাঁদতে থাকেন সবাই। সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের। এরপর পুরো সমাবেশ সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি.....।'

৩০ মার্চ, গভীর রাত পর্যন্ত জনতার মঞ্চে অনুষ্ঠান চলেছে। হাজার হাজার উদ্বেলিত জনতা বিজয়ের আনন্দে বিভোর হয়ে উপভোগ করেছে তা। বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনার ছবি নিয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল ঘুরে বেড়াচ্ছিল সমাবেশে। জনতার বিজয়ে উদ্বেলিত সবাই। হানিফ তার বক্তব্যে বলেছেন, এ বিজয় কোনো দলের নয়, ব্যক্তির নয়; এ বিজয় জনতার এ বিজয় গণতন্ত্রের।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্থলে শপথ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ৩১ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে বলেন ঃ

'সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত হচ্ছে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা। গতকাল রোববার রেডিও টিভির মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে তিনি এ জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, দেশের মানুষ শান্তি চায়। আর তাঁর সরকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে

Dhaka University Institutional Repository

মোটেও দ্বিধা করবে না। দেশবাসীকে তিনি এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, নানা কারণে দেশে কিছুটা অস্থিরতা বিরাজ করলেও এ নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নেই।

জনাব রহমান সমাজ, রাজনীতি, নির্বাচন, মানবাধিকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে ইতিহাস, ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরে বলেন, কল্যাণকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় প্রশাসনে জনগণের জবাবদিহি নিশ্চিত হলে। তিনি বলেন, মানবাধিকার সংরক্ষিত না হলে মানুষ অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহকেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে বেছে নেয়। ১৯৭০ সাল বাংলাদেশের মানুষের জন্য এরকমই একটি সময় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সে সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশ শাসন ও সংবিধান প্রণয়নে অন্যায়ভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করে। জনাব রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সংক্ষিপ্ত পটভূমি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা গ্রহণে তিনি খানিকটা সংশয়িত ছিলেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির উৎসাহ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতার আশ্বাস তাকে স্বস্তি দিয়েছে। জনাব রহমান বলেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সদিচ্ছা ও সহযোগিতার যে আশ্বাস বাণী উচ্চারণ করেছেন, দলগুলোর কর্মীরা যদি তাতে সাড়া দিয়ে নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করে তাহলে জাতিরই শুধু মঙ্গল হবে না। স্ব স্ব দলও উপকৃত হবে।

তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত যে শান্তি শৃঙ্খলা তা রক্ষায় তার সরকার আশঙ্কা বা বিচলিত বোধ করবে না। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধ দমন করে। কাউকে অহেতুক হয়রানি করা হবে না এবং সরকারের কাজ অসহ্য রকম দুরূহ না হলে বিশেষ আইন পারতপক্ষে ব্যবহার করা হবে না। এ ব্যাপারে তিনি আইনজীবীদের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, তারা যেন অযথা শুনানি মুলতবি করে সময়ের অপব্যয় না ঘটায়। আদালত বা প্রশাসন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তার আশু তদন্ত করা হবে বলে তিনি জানান।

Dhaka University Institutional Repository

ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরে স্ব স্ব কর্মে মনোনিবেশনের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, নাগরিক কর্তব্য পালন একদিক থেকে সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একাধিকবার দিকভ্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে।

তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কেবল ১১ জন উপদেষ্টা যথেষ্ট নয়। প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এজন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন পুরোনো ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে হা-হুতাশ করলেও জীবন থেমে থাকে না। জাতীয় জীবনে কোনো কারণে রাজনৈতিক সূত্র ছিঁড়ে গেলে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই তার সংস্কার করতে হবে। ব্যক্তি জীবনে যেমন মাঝে মাঝে সুতা ছিড়ে গেলে তা সংস্কার করে জোড়া দিতে হয়।

শেখ হাসিনার বিজয়ী ভাষণ ঃ

৩১ মার্চ বিজয়ী নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'জনতার মঞ্চ' থেকে রূপান্তরিত 'বিজয় মঞ্চ' হতে এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতা হারিয়ে বিএনপি উন্মাদ হয়ে গেছে, জেলায় জেলায়, থানায় থানায় অস্ত্রধারীদের নামিয়ে তাণ্ডবলীলা শুরু করেছে। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা, সেনাবাহিনী, পুলিশের কাছে আমার অনুরোধ, এই মুহূর্ত থেকে অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার শুরু করুন। কারো কাছে যেন কোন অবৈধ অস্ত্র না থাকে, নিশ্চিত করুন।

শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতায় থাকাকালে ৫ বছর খালেদা জিয়ার সরকার কয়েকশ' মানুষকে হত্যা করেছে। পুলিশ ও মাস্তান লেলিয়ে দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনী প্রহসনেই কেবল ১শ' ২০ জনকে হত্যা করেছে। শেখ হাসিনা বলেন, এসব খুনের জন্য আমি খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করছি, বিচার দাবি করছি।

Dhaka University Institutional Repository

কক্সবাজারে ট্রাক ভর্তি অস্ত্র আটকের ঘটনা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, ওই অস্ত্র কোত্থেকে এসেছে, কার জন্য এসেছে, বিএনপি-ছাত্রদলের মাস্তানরা কোত্থেকে অস্ত্র পায়, জানতে চাই। তিনি কক্সবাজারে আটক অস্ত্রের ব্যাপারে অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, তাহলেই বেরিয়ে আসবে ওই অস্ত্র কোত্থেকে — কার জন্য এসেছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি-র জন্মদাতা জেনারেল জিয়া ক্ষমতার জন্য সেনা সদস্য ও জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন। যাহোক, তারপরেও ১৯৯১ সালে আবার বিএনপি ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু জন্মদোষ খণ্ডানো যায় না, সেটাই হয়েছে। দলীয়করণ আর সন্ত্রাসকে পুঁজি করেই বিগত ৫ বছর ধরে শাসন শোষণ চালিয়েছে।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর খুনীদের সাথে খালেদা জিয়ার কি সম্পর্ক এ প্রশ্ন করে বলেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ খালেদা জিয়া খুনী কর্নেল রশিদকে চাটুকার নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত ঘোষণা দিয়ে সংসদে ঢুকিয়েছিলেন। কিন্তু খোদাতাআলা শাস্তি দিয়েছেন, ওই জালিয়াতির সংসদে টেকেনি। এরশাদও খুনী কর্নেল হুদাকে একইভাবে সংসদে ঢুকিয়েছিলেন, সেই সংসদও টেকেনি। শেখ হাসিনা বলেন, খালেদা কেন বঙ্গবন্ধুর খুনীকে সংসদে এনেছিলেন, জনগণের হাতেই এই রহস্য উন্মোচনের ভার দিলাম।

৩১ মার্চ ঢাকায় এক জনসভায় : জামাতে ইসলামীর আমির গোলাম আযম বলেন, বিএনপি সবচেয়ে বড়ো সন্ত্রাসী দল। তারা ক্ষমতায় থাকাকালে অবৈধ অস্ত্র দিয়ে সন্ত্রাসী বাহিনী তৈরি করেছে। বিএনপি-র মতো সন্ত্রাসী সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়নি। এ অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে।

পরাজিত নেত্রী খালেদার প্রতিক্রিয়া ঃ

৩১ মার্চ পরাজিত নেত্রী খালেদা জিয়াও কর্মীদের মনোবল ধরে রাখার জন্যে এক জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি পরাজিতের মতোই হুমকি ধমকি দেন। এদিন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দলীয় নেতা কর্মীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, একটা কর্মীর ওপর আঘাত হানলে পাল্টা আঘাত হানতে হবে। কোন ছাড়াছাড়ি নেই। তিনি বলেন, আমরা সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়েছি, সামনের দরজা দিয়েই ঢুকব, পেছনের দরজা দিয়ে নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩১ মার্চ বিএনপি স্থাপিত এই 'গণতন্ত্র মঞ্চ' থেকে দেয়া খালেদা জিয়াসহ তার সহযোগীদের উস্কানিমূলক বক্তব্যের নিন্দা জানান বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন। তারা বলেন, প্রহসনের নির্বাচনের পরেও নানা কূটকৌশলে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে খালেদা জিয়া ও তার সহযোগীরা যে রণমূর্তি নিয়ে মাঠে নেমেছেন তা দেশের অস্থিতিশীলতাকেই আরও বাড়াবে।

কিন্তু আন্দোলনকারী সচিবদের বিচার ও শাস্তি দাবি করে দেয়া ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম ২ এপ্রিল মঙ্গলবার শেষ হলেও বিএনপি পরবর্তী কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এমনকি বিএনপি-র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এ আলটিমেটামের কথা পরে অস্বীকার করেন।

২ এপ্রিল মঙ্গলবার রাতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের উত্তরে খালেদা জিয়া বলেন, 'আমি আলটিমেটাম দিইনি। এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।'

অথচ, গত ৩০ মার্চ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর বিকেলে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত জনসভা থেকে বিএনপি-র ১১ দফা দাবি ঘোষণা করা হয়। তাতে আন্দোলনকারী সচিবদের বিচার ও শাস্তি দাবি করে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া এ জনসভাতেই বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটি সদস্য অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটামের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু এক সময়ে সার্কের চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালনকারী খালেদা জিয়া আটকে যান এবং ৩০ ও ৩১ বক্তৃতায় ভুটানের সার্বভৌমত্বের বিষয়ে আপত্তিকর বক্তব্যে। ভুটান সরকার ও তীব্র প্রতিবাদ করেন খালেদা জিয়ার কথার।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মুখে, পদত্যাগ করার পর বিএনপি-র প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই উগ্র। গত ৩০ ও ৩১ মার্চের বিএনপি আয়োজিত দু'টি জনসভায় নেতাদের বেসামাল বক্তৃতা তার প্রমাণ দেয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, দলের চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও সে কাতারভুক্ত হয়েছেন। আর হয়েছেন বলেই উগ্র দক্ষিণপন্থী

Dhaka University Institutional Repository

বক্তৃতা দিয়ে কর্মী সমর্থকদের মনোবল অটুট রাখতে চেয়েছেন। তা চাইবেন বৈকি; কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রকে 'করদ রাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নিত করবেন এটা কেমন কথা। ভুটান যে একটি স্বাধীন দেশ, এতদিনেও কি তিনি এটা উপলব্ধি করতে পারেননি? ভাগ্য ভালো যে, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি এমনতরো কোন বক্তব্য দিয়ে বসেননি। সেক্ষেত্রে বিষয়টা আমাদের সবার জন্যই খুব লজ্জাজনক হতো। হয়তো ভুটান সরকার প্রতিবাদ জানাতেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুঃখ প্রকাশ করতে হতো। কিন্তু তা হয়নি। তবে যা হয়েছে সেটাও কম দুঃখজনক নয়। খালেদা জিয়া অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। দোষ স্বীকার করে নেয়ার জন্য আমরা তার প্রশংসা অবশ্যই করবো। সেই সাথে আশা করবো যে, সংশ্লিষ্ট সকলেই স্ব স্ব রাজনৈতিক চর্চা করতে গিয়ে দায়িত্ববোধের পরিচয় দেবেন।

এর আগে ৫ এপ্রিল খালেদা জিয়া এই ব্যাপারে তার দায়িত্বহীন উক্তির প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিদিদের কাছে তিনি বলেন, 'আমি দুঃখিত। আসলে ভুটান একটি স্বাধীন দেশ, সার্কভুক্ত দেশ।'

উপদেষ্টাদের নতুন সরকার ঃ

এদিকে ৩ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ নিয়োগ লাভ করে। বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্ব অনুষ্ঠানে শপথ নেয়া এই ১০ জন উপদেষ্টা হলেন ঃ

বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সেগুফতা বখত চৌধুরী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মো.শামসুল হক
বিশিষ্ট চিকিৎসক মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুর রহমান খান
গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ ইউনুস
মেট্রোপলিটন শিল্প ও বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও নারী আন্দোলনের নেত্রী ড. নাজমা চৌধুরী
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
এবং সাবেক সচিব এজেডএম নাছির উদ্দিন।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের প্রত্যেকেই একজন পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি বিএনপি প্রথম থেকে মানেনি, যে জন্যে দেশে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, অবস্থার চাপে যারা শেষ পর্যন্ত এই আইন পাস করতে বাধ্য হয় সেই বিএনপি নেতারা ৪ এপ্রিল ঢাকায় এক সমাবেশে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশবাসীকে দেয়া বিএনপি-র উপহার, তাই একে সার্বিক সহযোগিতা আমরা করবো।

এর প্রায় একুশ দিন পর ভোরের কাগজ এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বিএনপি নেতা, সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসেঙ্গ একটি সুন্দর মন্তব্য করেন যা পরবর্তীকালে বহুলভাবে আলোচিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দশ ফেরেশতা (উপদেষ্টা) তিনশত মন্দলোক (সংসদ সদস্য) নির্বাচিত করতে এসেছেন।

৬ এপ্রিল দেশে আরেকটি দুষ্ট গ্রহের পতন ঘটে। এদিন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অনুরোধে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি একেএম সাদেক পদত্যাগ করেন।

৯ এপ্রিল নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু হেনা শপথ গ্রহণ করেন। আবু হেনার নিয়োগের প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেন অপর অপদার্থ নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুল জলিল। অনেকদিন পরে নির্বাচন কমিশন বিচারপতিদের তথাকথিত প্রশাসনের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়।

আবু হেনার নিয়োগে সন্তোষ করে অভিনন্দন বার্তা পাঠান বিএনপি-র মহাসিচব ব্যারিস্টার সালাম তালুকদার, স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী। আওয়ামী লীগ নেতারা ১০ এপ্রিল পর্যন্ত অভিনন্দন বাণী দেননি।

রহমান বিশ্বাসের মিনি সামরিক অভ্যুত্থান ঃ

গণঅভ্যুত্থানে বিদায়কালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বহীন বিএনপি সরকার ত্রয়োদশ সংশোধনী এনে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর (প্রধান উপদেষ্টার) হাত থেকে রাষ্ট্রপতির হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাখার ব্যবস্থা করে। সেই সময়ই একটা আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠেছিল। আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় মে মাসের মাঝামাঝি। ১৯ মে দেশের সংবাদগুলো এই মর্মে এক খবর প্রকাশ করে

Dhaka University Institutional Repository

যে, রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস তাঁর হাতে আকস্মিকভাবে আসা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাবলে দু'টো পৃথক নির্দেশে বগুড়া এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল জি.এইচ.মোরশেদ খান বীর বিক্রম ও বাংলাদেশ রাইফেলসের উপমহাপরিচালক বিগ্রেডিয়ার মীরন হামিদুর রহমানকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিস থেকে অবসর প্রদান করেন।

দৈনিক প্রকাশিত ভোরের কাগজ জানায় ঃ

'কোনো কারণ উল্লেখ ও তদন্ত ছাড়া উক্ত দু'জন উচ্চ পদস্থ মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কর্মকর্তার অবসর প্রদান আদেশ সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়। খবর নিয়ে জানা গেছে এ বিষয়টি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সদর দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা বা কোনো মতামত ছাড়াই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় একমাত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়টি রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসে হাতে রয়েছে। বিতর্কিত ষষ্ঠ সংসদে বিএনপি-র এককভাবে পাস করা ত্রয়োদশ সংশোধনী বলে রাষ্ট্রপতির হাতে একটি নির্বাহী মন্ত্রণালয় রাখা বিষয়টি ইতিমধ্যে বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এবং আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের আগে এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।'

২০ মে সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বগুড়া এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল জিএইচ মোরশেদ খান বীরবিক্রম ও বাংলাদেশ রাইফেলসের উপমহাপরিচালক বিগ্রেডিয়ার মিরণ-হামিদুর রহমানকে আকস্মিক অবসর প্রদানের ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'কোনো দৃশ্যমান কারণ ছাড়াই তাদের সেনাবাহিনী থেকে আকস্মিকভাবে অবসর প্রদান করায় জনগণের মনে সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর ফলে সেনাবাহিনীর মনোবল বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

বিবৃতিতে শেখ হাসিনা আরো বলেন, রাষ্ট্রপতি দলমতের উর্ধ্বে একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। সরকারের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা তিনি বিএনপি-র দলীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে আচরণ করেছেন, বিএনপির স্বার্থ রক্ষা করছেন এবং এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগের

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করায় ক্ষমতাচ্যুত বিএনপি সরকারের মতলব সম্বন্ধে, দেশবাসী সন্দিহান ছিল। দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি অবসর প্রদানের ফলে সেই সন্দেহ, আরো ঘনীভূত হয়েছে। একটা দেশের নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্রকে দ্বিধাবিভক্ত করে সরকারের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, জানানো হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত এই দুই সেনা কর্মকর্তা অবসর দেয়ার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নেত্রী রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগে বিরত থাকার এবং প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। তিনি বলেন, 'প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে অর্পণ করার জন্যও আমি দাবি জানাচ্ছি।'

প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলেও রাষ্ট্রপতি পদে তখনো বিএনপি দলীয় রহমান বিশ্বাস চেয়ারে আসীন ছিলেন। দুইজন সামরিক অফিসার বহিস্কারের ভেতরের মতলব প্রকাশিত হয় ২০ মে তারিখে। এদিন জাতির উদ্দেশে এক আকস্মিক ভাষণে রাজাকার রহমান বিশ্বাস মুক্তিযোদ্ধা প্রধান সেনাপতি জেনারেল নাসিমকেও তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। রহমান বিশ্বাসের এই ঘোষণায় সমগ্র জাতি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, রহমান বিশ্বাস তাঁর অনুগত সেনাদের দ্বারা রেডিও, টেলিভিশন, বঙ্গভবন এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ট্যাংকে স্থাপন করে ছোট খাট একটা সামরিক অভ্যুত্থানই ঘটিয়ে ফেলেন। রহমান বিশ্বাস জাতির উদ্দেশে মিথ্যা ভাষণও দেন। তিনি জাতিকে জানান, সেনাবাহিনীর পদ থেকে জেনারেল নাসিমকে বহিস্কারের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার কথাও হয়েছে। রহমান বিশ্বাস তাঁর ভাষণে এমন একটা ভাব দেখান যে, প্রদান উপদেষ্টার পরামর্শেই তিনি এসব করেছেন। প্রেসিডেন্টের এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদ জানান স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা। জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে পরদিন বিচারপতি হাবিবুর রহমান স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন একজন রাষ্ট্রপ্রধান কেমন করে মিথ্যাচার করেছেন এবং প্রধান উপদেষ্টা সেনাবাহিনীর কাছে আবেদন রাখেন, 'যেন বড়ো দুঃখী এই বাংলাদেশের মাটি, ভাইয়ের রক্তে কলঙ্কিত না হয়।'

Dhaka University Institutional Repository

হয়তো জেনারেল নাসিম ও তাঁর সমর্থকরা এই আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। ফলে অনেকটা অঘটন থেকে জাতি রক্ষা পায়। রহমান বিশ্বাস ও তাঁর অনুচররা জাতীয় নির্বাচন ভণ্ডুল করার যে বড় ধরনের চক্রান্ত করে তা মূলতঃ ভন্ডুল হয়ে যায়। যদিও জেনারেল নাসিমের ধৈর্য ও সহনশীলতায় আপাতঃ মনে হয় যে, শক্তি পরীক্ষায় রহমান বিশ্বাস এবং বঙ্গভবনে আশ্রয় গ্রহণকারী জেনারেল সুবিদ আলী ভুইয়া জিতে গেছেন তথাপি দেশে এরপরও নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনে বিএনপি-র ভরাডুবি ঘটে।

তবে এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস নিজে এই সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিলেন এই ভেবে যে, যাতে পাল্টা জেনারেল নাসিম সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা নিয়ে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। কারণ ছিল তিনটি এর পেছনে ১. এতে বিএনপি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হাতে পরাজয়ের হাত থেকে বেঁচে যেত, ২. জেনারেল নাসিমের অভ্যুত্থানকে আওয়ামী লীগের চক্রান্তবলেও প্রচারণা চালানো যেত, ৩. পাশাপাশি তবু যে কোন সেনা অফিসার দ্বারাই ক্ষমতা চালিত হতো এবং আওয়ামী লীগকে অন্ততঃ ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা সম্ভব ছিল।

নির্বাচনের ফলাফল ঃ সামগ্রিক পর্যালোচনা

অবশেষে শত উস্কানি ও শঙ্কার পরও ভালোয় ভালোয় ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। দেশের মানুষ একুশ বছর পর ক্ষমতার পরিবর্তনের পক্ষে তাদের রায় জানায়। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর দেশের ক্ষমতা একুশ বছর সেনানিবাসেই আটকে থাকে। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত জিয়া এবং ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এরশাদের সামরিক শাসন, এমনকি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল মার্চ মাস পর্যন্ত খালেদার শাসন পর্যন্ত সেনানিবাস থেকেই চলতে থাকে।

১২ জুনের নির্বাচনের ফলাফলে এই প্রথম একুশ বছর পর সেনানিবাস থেকে বাংলার ক্ষমতা জনগণের কাছে ফিরে আসে। ১২ জুন ঘোষিত ২৭১টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৩৩টি, ১০৪টি জাতীয় পার্টি ২৯টি, জামাত ২টি, স্বতন্ত্র ১টি, জাসদ রব ১টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট ১টি আসন লাভ করে। পরে নির্বাচন কমিশন ২৭টি আসনে পুনঃনির্বাচন ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করে। ১৯ জুন অনুষ্ঠিত এই পুনঃনির্বাচনের ফলাফল দাঁড়ায় আওয়ামী ১৪৭, বিএনপি ১১৬, জাতীয় পার্টি, ৩১, জামায়াতে ইসলাম ৩ এবং জাসদ (রব) ১টি আসন। ১৯৯৬ সালের এই নির্বাচনের দলের ফলাফলের তুলনামূরক চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ

রাজনৈতিক দল	১৯৯৬ সালের ফলাফল	১৯৯১ সালের ফলাফল	প্রদত্ত ভোটের অনুপাতে প্রাপ্ত ভোটেপর হার ১৯৯১	১৯৯৬
আওয়ামী লীগ	১৪৭	৮৮	৩৩.৭৩%	৩৭.৫৩%
বিএনপি	১১৬	১৪০	৩০.৮১%	৩৩.৪০%
জাতীয় পার্টি	৩১	৩৫	১১.৯২%	১৫.৯৯%
জামাতে ইসলামী	৩	১৮	১২.১৩%	৮.৭১%
জাসদ (রব)	১	০	—	—
স্বতন্ত্র	১	৩	—	—
অন্যান্য	০	১৫	—	—
ঘোষিত ফলাফল	২৭১	৩০০	—	—
প্রদত্ত ভোটের হার	—	—	৫৪.৬১%	৭৩.৬১%

১৯৯১ সালে ভোটের চিত্রের বিপরীতে ফলাফল দেখা গেছে এবারের নির্বাচনে। ১৯৯১ এ আওয়ামী লীগ ভোট বেশি পেলেও আসন পেয়েছিল কম। এবার তাদের ভোটও বেড়েছে ৩১ লাখ ৫০ হাজার। দেশের ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা এবার ১ কোটি ৫৬ লাখ ২৩ হাজার ৩৯৪ ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে বিএনপির ভোট বেড়েছে ৩৪ লাক্ষ ২৮ হাজার। ৩০০ আসনে বিএনপি-র প্রার্থীরা এবার ১ কোটি ৩৯ লাখ ৭ হাজার ১৩১, জাতীয় পার্টির ভোট বেড়েছে ১৯৯১ সালের তুলনায় ২৫ লাখ ৯৩ হাজার ২১৩টি। জাপার ২৯২ জন প্রার্থী এবার ৬৬ লাখ ৫৬ হাজার ৭৫৩ ভোট পেয়েছেন। অন্যদিকে কেবলমাত্র জামাতে ইসলামী এবার ভোট হারিয়েছিল ৫ লাখ ১১ হাজার ৬১৪টি। জামাতে ৩০০ প্রার্থী এবার ৩৬ লাখ ২৫ হাজার ৪৭ ভোট পায়। জামাতের ভোট হারানোর অনুপাতে আসন হারানোর ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাত্র ৪১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৬১ ভোট পেয়ে ১৯৯১ সালে জামাত ১৮টি আসন পেয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এবারের নির্বাচনে আরো একটা বড়ো ঘটনা হচ্ছে ভোট মূলত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামাত প্রার্থীরা মোট প্রদত্ত ভোটের ৯৫.৬৩ শতাংশই পেয়েছেন। বাকি ৭৭টি দল অবশিষ্ট ভোট ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে। ১২ জুনের নির্বাচনে দেশের ৫ কোটি ৬৫ লাখ ৬২ হাজার ১১ জন ভোটারের ৭৩.৬১ শতাংশ অর্থাৎ ৪ কোটি ১৬ লাখ ৩৩ হাজার ৮৬০ জনই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ রকম নজিরবিহীন ভোটারির উপস্থিতি আর কোনো সাধারণ নির্বাচনে দেখা যায়নি।

একটি হিসাবে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী বাদে এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী আর মাত্র ৩টি দল লাখের ঘরে ভোট পেয়েছিল। প্রচুর অর্থ খরচ করে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ফরিদপুরের আটরশির আধ্যাত্মিক নেতার সমর্থক জাকের পার্টি ২৪১ জন প্রার্থী সারা দেশে মাত্র ২ লাখ ৬ হাজার ৬৪১ ভোট পায়।

একুশ বছর পর আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণ ঃ

এদিকে ১২ জুনের নির্বাচনের পরদিন ঘোষিত ফলাফলের ভিত্তিতে এক সংবাদ সম্মেলনে সরকার গঠন সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা প্রস্তুত। আমরা রাষ্ট্রপতির আহবানের জন্য অপেক্ষা করছি।' শেখ হাসিনা বলেন, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছি। রাষ্ট্রপতি থাকলে আমরা সরকার গঠন করতে পারবো। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি আশাবাদী।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, সব দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ১২ জুনের নির্বাচনের জন্য তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশবাসী আওয়ামী লীগকে সংসদে একক বৃহত্তম দল হিসেবে প্রয়োজনীয় আসন দিয়েছে। এটি একই সঙ্গে সরকার গঠনে আওয়ামী লীগের ওপর গুরুত্ব দায়িত্ব অর্পণ করেছে। তিনি বলেন, 'আমি জাতিকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা এই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি।' তিনি বলেন, একটি কঠিন কাজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা হলো শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করা। প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সার্বিক সহযোগিতা করবে

Dhaka University Institutional Repository

বলে আমি আশা করি। জনগণের রায় বানচালের চেষ্টা করা কারো উচিত নয়। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যকে সুসংহত করা রজন্য শেখ হাসিনা দেশবাসীর প্রতি শান্ত থাকার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সমাজের অগ্রগতির ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও শান্তির প্রয়োজন।

জাতির ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালনার পূর্ব প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করতে চাই না। আমরা অচিরে দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে জাতীয় সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করবো।

তবে ১৪ জুন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচন উত্তর সংবাদ সম্মেলনে সতর্ক মন্তব্য করেন। তিনি এদিন নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণও করেননি কিংবা প্রত্যাখ্যানও করেননি। তবে তিনি বলেন, নির্বাচন এখনো শেষ হয়নি। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই আমরা আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাব। তিনি বলেন, বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। এই দল ইতিবাচক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। জনগণের রায় মানতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত। জনগণ চাইলে ক্ষমতায় থেকে যেমন সেবা করতে প্রস্তুত, ঠিক তেমনি জনগণ চাইলে বিরোধী দলে থেকেও আমরা তাদের সেবা করবো। এ ব্যাপারে আমাদের কোন দ্বিধা নেই।

কিন্তু ঠিক এর আগের দিন ১৩ জুন সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি-র জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, নির্বাচনে পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ষড়যন্ত্রমূলক ও ইতিহাসে নজিরবিহীন কারচুপি সংঘঠিত হয়েছে। বিশেষ একটি দলকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য এ কারচুপি করা হয়েছে। তিনি ১১১টি আসনে পুনঃনির্বাচন দাবি করেন।

বিএনপি মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার বলেন, বিএনপি ১১টি আসনের পুনঃনির্বাচন না দেয়া পর্যন্ত নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারে প্রতি আহবান জানান।

১৬ জুন সংবাদপত্রে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী ও মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এক বিবৃতিতে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন দেন। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে সরকার গঠনের আহবান জানানোর জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতিও তাঁরা অনুরোধ জানান।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন এক যোগে জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সমমনা দলসহ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনসাধারণের অবাধ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। গত ১২ জুন অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন অর্জনকারী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠন করার জন্য আমরা রাষ্ট্রপতিকে আওয়ামী লীগ প্রধানকে অবিলম্বে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আহবান জানাচ্ছি।

তারা বলেন, দেশে সুষ্ঠু, সুস্থ্য-গণতান্ত্রিক এবং স্থিতিশীল সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সংরক্ষণ ও প্রসারিত করার লক্ষ্যেই আমরা গত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন অর্জনকারী দলকে সমর্থন দেব। তারা আরো বলেন, 'আমাদে পার্টি আশা করে যে, গত নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সংসদ গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এর পূর্ণাঙ্গ মেয়াদকাল সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

২১ জুন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর মহাসচিব আসএম আব্দুর রব এক বিবৃতিতে বলেন, সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় তার দল আওয়ামী লীগকে প্রয়োজনীয় সমর্থন দেবে। একই সঙ্গে তিনি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আহবান জানান।

আসম রব বলেন, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা যে অঙ্গীকার করেছেন সেই ভিত্তিতেই জাসদ আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেবে।

১৬ জুন রাশেদ খান মেননের ওয়ার্কার্স পার্টি তাঁর আসনে জাতীয় পার্টির কারচুপির অভিযোগ তোলেন। তবে সংবাদ সম্মেলনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করায় আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,

> আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠনের অধিকারী। জনগণ সুস্পষ্টভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে নির্বাচিত সরকারের হাতে বাঁধাহীন ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর দেখতে চায়।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের অপর গ্রুপ (আরেফ ইনু) এর নেতা কাজী আরেফ আহমেদ ১৭ জুন সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়ায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান এবং তাকে সরকার গঠনে ডাকার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আহবান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

বিবৃতিতে তিনি তার নির্বাচনী এলাকা কুষ্টিয়া-১ আসনে বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে বলেন, নির্বাচনের দিন একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়ে প্রকাশ্যে ধানের শীষে ভোট দিতে জনগণকে বাধ্য করে। তিনি বলেন, নির্বাচনের পরও তারা সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি অবিলম্বে এদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

কিন্তু সকল মহলের দাবি সত্ত্বেও বঙ্গভবনে বসে রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস পর্দার আড়ালে নানা খেলা শুরু করেন। তিনি আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনে ডাকতে গড়িমসি করেন। বরং আওয়ামী লীগ যাতে সরকার গঠন করতে না পারে সে জন্য বিএনপি, জাতীয় পার্টির নেতা জেনারেল এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু কারাগার থেকে এ মাসের সময়ের সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ ঘৃণাভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। তাঁর এই ভূমিকা গণতান্ত্রিক মহলে সর্বত্র প্রশংসিত হয়। জাতীয় পার্টি বরং উল্টো আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে রাষ্ট্রপতির প্রতি আহবান জানায়। ২১ জুন জাতীয় সংসদ সদস্যরা যাতে শপথ না করতে পারে তার জন্যেও বিএনপি দলগতভাবে চেষ্টা চালায়। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ভেস্তে যায়।

২১ জুন বিজয়ী আওয়ামী লীগের সংসদীয় গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের সংসদীয় দলের প্রথম সভায় সর্বসম্মতভাবে সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত হন। সভায় নবনির্বাচিত দলীয় সাংসদদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে শেখ হাসিনা জনগণের প্রভু নয়— সেবক হিসেবে দায়িত্ব পালনে প্রস্তুতি নেয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সরকার কোন দলীয় সরকার হবে না, সরকারকে হতে হবে দেশের ১২ কোটি মানুষের দলমত নির্বিশেষে সবার। তিনি জনগণের রায় বানচালের যে কোন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহবান জানিয়ে আরো বলেন, আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, গরিব ভোটারের পূর্ণ কুটিরে ভোট চাইতে গেছি, ক্ষমতায় গিয়ে যেন কোন অবস্থাতেই তাদের কথা ভুলে না যাই। যাদের রক্ত ঘাম ও সাহায্য সহযোগিতায় ২১ বছর পর এই বিজয় এসেছে তাদের ভুলে যাওয়া চলবে না।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন সরকার ঃ

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন ছিল ঐতিহাসিক দিন। দীর্ঘ একুশ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠন করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর নির্বাচিত আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছিল। তারপর থেকে দীর্ঘ একুশ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালিত হয়েছিল সেনানিবাস থেকে। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন একুশ বছর পর রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা সেনানিবাসের বাইরে চলে আসতে সক্ষম হয়। বাংলার ইতিহাসে এমনিতেও ২৩ জুনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

অবশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে। ২৩ জুন রোববার বিকেল সাড়ে ৫টায় বঙ্গভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা দেশের ১০তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এর পরপরই ১১ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং ৮জন প্রতিমন্ত্রী শপথ নেন। মন্ত্রিসভায় টেকনোক্রেট হিসেবে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য এসএমএস কিবরিয়া এবং জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস শপথ বাক্য পাঠ করান।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বেগম রহমান বিশ্বাস নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানসহ উপদেষ্টামন্ডলীর সকল সদস্য, স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী, বিচারপতিবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধান, বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রধান, উচ্চ পর্যায়ের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ছাড়াও গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন, জাসদের সাধারণ সম্পাদক আসম আবদুর রব, আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিসহ বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১২ জুনের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা স্বামী ড. ওয়াজে মিয়া, বোন শেখ রেহানা, ছেলে জয় ও মেয়ে পুতুলকে নিয়ে বঙ্গভবনে আসেন ৫টা ২৭ মিনিটে। এ সময় গোটা দরবার হল করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে।

ঘড়ির কাটায় তখন সাড়ে পাঁচটায়, প্রথমেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম। এর পরপরই মন্ত্রিপরিষদ সচিব সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করানোর জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন। ক্রিম রঙের রাজশাহী সিল্ক পরিহিত শেখ হাসিনা উঠে গিয়ে রাষ্ট্রপতির পাশে দাঁড়ান। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করানোর পরপরই দরবার হলে উপস্থিত সবাই হাততালি দিয়ে নয়া প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী পদে শেখ হাসিনার শপথ গ্রহণের পর ১১ জন পূর্ণ মন্ত্রী এক সঙ্গে শপথ নেন। এর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগের ১০ জন এবং জাতীয় পার্টির ১ জন মন্ত্রী। আওয়ামী লীগের ১০ ছিলেন ঃ আবদুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, এসএমএস কিবরিয়া, এএসএইচকে সাদেক, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, নুরুদ্দিন খান, মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, মোহাম্মদ নাসিম ও বেগম মতিয়া চৌধুরী। জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুও একই সঙ্গে শপথ নেন।

পূর্ণ মন্ত্রীদের শপথ নেয়ার পর ৮ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ নেন। এরা সবাই আওয়ামী লীগের সাংসদ। তারা হচ্ছেন ঃ ডা. মোজাম্মেল হোসেন, সতীশ চন্দ্র রায়, ওবায়েদুল কাদের, আবুল হাসান চৌধুরী, আলহাজ সৈয়দ আবুল হোসেন, মাওলানা মীর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, আফসার উদ্দিন আহমদ, এবং এডভোকেট আবদুল মতিন খসরু।

২৩ জুন বঙ্গভবনের এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এমন সকল দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আমন্ত্রিত হন গত ২১ বছরে যাদের বঙ্গভবনের চত্বরে কোন উপলক্ষেই দেখা যায়নি। এদের মধ্যে ছিলেন কবি শামসুর রাহমান, শওকত ওসমান, হাসান ইমাম, ড. আরেফিন সিদ্দিক, রামেন্দু মজুমদার, আব্দুল মান্নান চৌধুরী প্রমুখ।

নয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গভবনেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেন।

২৯ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করেন। দু'জন পূর্ণ মন্ত্রী ও ৪ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ নেন। এ নিয়ে মন্ত্রিসভায় সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায়। ২৩ জুন নতুন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের ৭ দিনের মাথায় নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়। মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের বাইরে থেকে একজন মন্ত্রী নেয়। জাসদ (রব) নেতা আসম আবদুর রব পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ায় আওয়ামী লীগ দলের বাইরে মন্ত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় দুই। মন্ত্রিসভা গঠনের সুচনাতেই জাতীয় পার্টির আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শেখ হাসিনার নতুন ধারণা জাতীয় ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবেই আওয়ামী লীগ ভিন্ন অন্যান্য দল থেকে মন্ত্রী নেয়া হয়।

নতুন যারা মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হন ও বিভিন্ন দফতর পান তারা হলেন ঃ মন্ত্রী সালাউদ্দিন ইউসুফ (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়), আসম আবদুর রব (নৌ পরিবহন ও জাহাজ চলাচল), প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ (তথ্য), একে ফায়জুল হক (পাট), এমএ মান্নান (শ্রম ও জনশক্তি) ও রাশেদ মোশাররফ (ভূমি)।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার

সার্বিক মূল্যায়ন

স্বৈর শাসক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, '৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, সাধারণ নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ গঠন এসব ঐতিহাসিক পটভূমির মাধ্যমে বাংলাদেশের ৫ম সংসদের প্রতিষ্ঠিত হয় বলে এই সরকারের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা ছিল অনেক। প্রথম দিকে এই সংসদ ইতিবাচক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। "সরকার ও বিরোধী দল সংসদীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত রচনায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এ ব্যবস্থা মূলতঃ নির্ভর করে সরকারের সহনশীলতার উপর নির্ভর করে বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক চেতনার উপর।"[৪১]

পূর্ববর্তী চারটি সংসদের তুলনায় এই সংসদ ছিল এবং অধিক কার্যকরী। ৫ম সংসদে ২২টি অধিবেশন সম্পন্ন করে প্রায় ৫ বৎসরের কাছাকাছি টিতে থাকে। পরিমাণগতভাবে সফল হলেও গুণগত ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারেনি। বিরোধী দলের ২২ মাস অনুপস্থিতিতে এটি একটি একদলীয় সংসদে পরিণত হয়। এই সংসদ প্রায় ৫ বৎসরের কাছাকাছি গেলেও কতটুকু বৈধ ছিল সেটাই বিবেচ্য বিষয়। কারণ সংবিধানের ৫৬(৬) ধারা অনুযায়ী ৩শত নির্বাচিতসহ ৩০টি সংরক্ষিত আসন ও সম্মিলিত জবাবদিহিতার যে নিশ্চয়তা দেওয়া আছে বিরোধী দলের পদত্যাগে সেই ধারা আর বজায় থাকেনি।

বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে পূর্বে গবেষণা হয়েছে। এইসব গবেষণা থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তা হলো যতদিন রাজনৈতিক দলগুলি তাদের স্বার্থগত অবস্থান দলীয় সংকীর্ণতা, শ্রেণীগত আচরণ ও ক্ষমতার মোহ ত্যাগ না ত্যাগ করবে এবং জনগণের কথা না ভাববে ততদিনে তাদের দলীয় আচরণ ও পরিবর্তন হবে না। বিরোধী দলকে হতে হবে সহনশীল, সমঝোতাপূর্ণ মানসিকতার। এই গবেষণায় সংসদীয় দলের আচরণ সাপেক্ষে বিরোধী দলের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

---

[41] অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র, প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা, ঢাকা করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারী দলের কেবল বিরোধিতা করার জন্য নয় বরং সঠিকপথে পরিচালনা করার জন্য। ইহা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা জেনেছি, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিরোধী দলের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ভূমিকা সম্পর্কে অনেকেই অনেক মত ব্যক্ত করেছেন। বৃটেনে সাংবিধানিক বিরোধীদের প্রথম লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য দেশেই মূলতঃ গণতন্ত্র ও এর বিরোধীদের ধারণা পাওয়া যায়। গণতন্ত্রের উন্নয়নের সাথে সাথে এমন এক রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার সৃষ্টি হয়েছে যে, রাজনৈতিক কার্যকলাপে সরকারী ও বিরোধীদল থাকবে এবং এই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের দল দেশ শাসন করবে এবং বিরোধী দল শাসনকারী দলের অপারগতা তুলে ধরবে এবং সরকার ও পরিচালনা ও রাজনীতিতে একটি বিকল্প সরকার হিসেবে বিরোধী দল গণতান্ত্রিক কাঠামোর অংশ হিসেবে কেবল নির্বাহী বিভাগের কার্যাবলীই নিশ্চিত করবে না বরং গণতান্ত্রিক কাঠামোর কার্যকলাপ যাতে সাবলীলভাবে চলতে পারে সে দায়িত্বও পালন করে। আইন বিভাগের ভিতরেও বাহিরেও দায়িত্বশীল বিরোধী দলের গঠনগত ভূমিকা কার্যকরী। অনেক নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ গণতান্ত্রিক চর্চায় ততটা অভ্যস্ত নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী গণতন্ত্রের চর্চা করে আসছে। কিন্তু সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অধিকাংশের শাসন ও শোষন করাই নির্ধারিত হয়। প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ সরকারের তেমন কোন বিরোধী দল ছিল না।

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করে জামাত-ই-ইসলামীর সহায়তায়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বড় বিরোধী দল হিসেবে জাগ্রত হয়। পারস্পরিক অসমঝোতা ও অসহিষ্ণুতায় ক্ষমতাসীন দলকে বিরোধীদের প্রতি অসহিষ্ণু করে তোলে। ফলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিরোধিতা নাকি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধিতা তা বোঝা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এভাবে বিরোধীরা কখনও বাইরে যায় না। কখনও সংসদে গিয়ে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয় এবং চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে তারা রাস্তার রাজনীতি বা সন্ত্রাস ও অসহিষ্ণুতার রাজনীতি করে। এই সংসদে বিরোধী দল কোন ছায়া সরকার হিসেবে কাজ করেনি। তারা জাতীয় উন্নয়নমূলক রাজনীতিতে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীদলের কার্যকরী করার জন্য কিছু সুপারিশ ঃ

১। সংবিধানের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এ জন্য কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা যাবে না। সরকার ও জনগণের অংশ হয়ে বিরোধীদের কাজ করতে হবে। "The opposition is at one the alternative to the government and a focus to the discontent of the people".

২। সরকারী ও বিরোধী দল উভয়ই সহনশীল ও সংযমী হয়ে সংসদকে সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় পরিণত করতে হবে। রাজপথে হরতাল ভাংচুর করে নয় বরং সংসদে বরং সংসদের ভিতর থেকেই জনগণের কথা বলতে হবে। কোরাম সমস্যা দূর করে ব্যক্তিগত বিষয় নয় বরং জাতীয় বিষয় নিয়ে দলকে ভাবতে হবে।

৩। রাজনেতিক দলগুলির মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা এবং জাতীয় ইস্যু ও সমস্যার ব্যাপারে ঐকমত্য থাকতে হবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের ঐকমত্য রয়েছে বলেই বৃটেনে সংসদীয় ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "The prime ministers needs the convenience of the leader of the opposition and the leader of the opposition meets the convenience of the government".

৪। জাতীয় বিষয়সমূহ সরকারী ও বিরোধী দলের ঐকমত্যে সংসদীয় পদ্ধতিসমূহকে কার্যকর অন্যতমগ উপায় বলে অনেকে মনে করেন।

৫। সরকারী ও বিরোধী দলগুলোর সংকীর্ণ নীতি ও রেষারেষির জন্য গণতন্ত্র নাজুক অবস্থায় চলে যায়। তাই সংঘাত নয়। রেষারেষি নয়, সমঝোতার অনুশীলন থাকতে হবে।

৬। সংসদীয় সরকারকে অর্থবহ করে তোলার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সংসদীয় সংস্কৃতির চর্চা ঢেসটি সরকার ও বিরোধী দল উভয়কেই পালন করতে হবে। এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধিতাই বেশী প্রাধান্য পায় থাকে oppositional potovism বলা হয়।

সামগ্রিক অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ে। অর্থাৎ হরতালের রাজনীতি চলে বিরোধিতার নামে যা পরিহার করা একান্ত জরুরী। কেবল বিরোধিতা না করে যদি সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং ভালো দিকগুলির প্রশংসা করে তবে জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। পক্ষান্তরে

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী দলকেও এই সংসদীয় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হতে হবে যে, সংসদে সকল দল ও মতের প্রাধান্য দিতে হবে। এখানে কোন দলীয় কর্তৃত্ব থাকা যাবে না। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই সংসদীয় সংস্কৃতির চর্চা দলগুলির মধ্যে দেখা যায়।

বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপট দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল সংসদীয় গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব সরকার এবং বিরোধী দলের। এখানে সরকারকে জবাবদিহিমূলক এবং দায়িত্বশীল হতে হবে এবং বিরোধী দলকে ও দায়িত্বশীল হবে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সরকারকে পরিবর্তন করতে হবে। তবে সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীল বিরোধী দলের উপস্থিতি ও গঠনমূলক ভূমিকার উপর। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঠিকপথে পরিচালিত হওয়ার পিছনে প্রধান প্রতিবন্ধকতার হলো রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অনুপস্থিতি। দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ না হলে ক্ষমতাসীন হয়ে গণতান্ত্রিক আচরণবিধি অনুসরণ অসম্ভব। ১৯৯১-'৯৬ খালেদা জিয়ার শাসনামলে তার সরকারে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তেমন উপস্থিতি না থাকায় বিরোধী দল লাগাতার হরতাল, সংসদ ও অসহযোগ আন্দোলন-এ সকল কর্মসূচী পালন করতে বাধ্য হয়েছিল। সে সাপেক্ষে দেশের তৎকালীন সার্বিক পরিস্থিতি চরম দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। এরূপ অকার্যকর অস্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরোধী দলের যৌক্তিক ও সময়োগপযোগী দাবীর কাছে নতি স্বীকার করেন। পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বিরোধীদলের প্রাণের দাবীসমূহকে বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ সদ্য প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের সফলতাকে যেমন সঠিক পথে চলতে উৎসাহিত করে। তেমনি বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ যৌক্তিক দাবীসমূহ পূরণ করতে বাধ্য হয়। যার প্রেক্ষিতে পরবর্তী নির্বাচন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।

তাই Shamsul Huda Harun এর সাথে সুর মিলিয়ে বলতে পারি "The opposition has the potentiality of transforming itself into the ruling party provided former carries the people with8 it in the next election – a system that helps opposition party "approximate to office".

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ এমাজউদ্দিন ঃ বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা, ঝিনুক প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০২।

আহমেদ এমাজউদ্দিন ঃ বাংলাদেশের রাজনীতির কিছু কথা ও কথকতা, মৌলি প্রকাশনী ৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৯৯।

আহমেদ ইয়াসমিন ও রাখী বর্মন ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৪।

আহমেদ আবুল মনসুর ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮।

আলম আলহাজ্ব বদিউল ঃ রাজনীতির সেকাল একাল, প্রসঙ্গ; বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রকাশক অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ, নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম ১৯৯৬।

আহম্মদ এমাজউদ্দিন ঃ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের স্বরূপ "গণতন্ত্র" সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ২৭।

আহমেদ কামাল উদ্দিন ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা 'গণতন্ত্র' সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৯০-৯৪।

উমর বদর উদ্দিন ঃ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯৭।

কাইয়ুম আব্দুল ঃ সংঘর্ষের রাজনীতি, মরমী প্রকাশনী, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, ১৯৯৯।

কামাল মোস্তফা ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, মুন্নী প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১০৯৬।

কামাল আহমেদ ঃ কালের কল্লোল–বাংলাদেশ (১৯৪৭-২০০০), মৌলি প্রকাশনী, ৩৪ নর্থ ব্লক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০০।

কবির সৈয়দ আলী ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া, "গণতন্ত্র" সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৯০।

করিম সরদার ফজলুল ঃ 'গণতন্ত্র এবং সহনশীলতা' 'গণতন্ত্র' সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৫।

খান মিজানুর রহমান ঃ সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী মিজানুর রহমান ঃ রাজনীতির দিনকাল, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, গুলশান, ঢাকা-১২০৭, ২০০১ ।

চৌধুরী দীপক ঃ বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা, মম প্রকাশ ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৯৭ ।

জাহাঙ্গীর বোরহান উদ্দিন খান ঃ খালেদা জিয়ার জেহাদ, 'দৈনিক জনকণ্ঠ' ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ।

ফিরোজ জালাল ঃ পার্লামেন্টারী শব্দকোষ, প্রকাশক গোলাম মঈন উদ্দিন, পাঠ্য পুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

বালা হীরা লাল ঃ বাংলাদেশের দারিদ্র অতীত ও বর্তমান, বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা তারেক সামসুর রেহমান, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮ ।

মতিন আব্দুল ঃ খালেদা জিয়ার শাসনকাল, একটি পর্যালোচনা, রেডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৭ ।

মুহাম্মদ আনু ঃ শিল্পায়নে বিলম্বিত পদক্ষেপ আত্মঘাতি মূলক হতে পারে দৈনিক খবর, ১৯৯৪ ।

মুহাম্মদ আনু ঃ 'গণতন্ত্র সংবিধান ও অর্থনীতি বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছরা, সম্পাদনা, তারেক সামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮ ।

মিয়া এম এ ওয়াজেদ ঃ বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৫ ।

রহমান শামসুর ঃ "রাজনৈতিক দল যেন সন্ত্রাসীদের অভয় আশ্রয় না হয়" বাংলার বাণী, ঢাকা, ১৯৯১, ৩রা নভেম্বর, পৃষ্ঠা ৪ ।

রহমান তারেক এসটি ঃ "সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ" বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা, তারেক সামসুর রেহমান, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

রহমান এএইচএস আমিনুর ঃ বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার প্রকৃতি ও প্রত্যাশা, সমাজ নিরীক্ষন, ৪৯, ১৯৯৩ ।

রহমান আতাউর ঃ উন্নয়ন ও গণতন্ত্রনায়ন ২৫ বছরের মুল্যায়ন "বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর", সম্পাদনা, তারেক সামসুর রেহমান, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮ ।

রহমান সাঈদুর ঃ অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে বাংলাদেশ, মৌলি প্রকাশনী, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০০ ।

শহিদুল্লাহ এ,কে,এম ঃ বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র : প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা, সম্পাদনা এমাজউদ্দিন আহমদ, করিম বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১২০৭, ১৯৯২ ।

হাসিনা শেখ ঃ আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

হান্নান মোহাম্মদ ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৯০-১৯৯৯), মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, জুন, ২০০০।

হোসেন আমজাদ ঃ বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, প্রকাশক কবির আহম্মদ, পড়ুয়া, ৪৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, ১৯৯৬।

হোসেন আলহাজ্ব সৈয়দ আবদুল ঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংকট, প্রকাশক মোঃ আবদুল কাদের, ১৬ কবি জসিম উদ্দিন রোড, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ২২।

হাসানুজ্জামান আল মাসুদ ঃ পার্লামেন্টারী কমিটি সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, রিজিওনাল স্টাডিজ ১৩(১) ১৯৯৩-৯৪।

হাসানুজ্জামান আল মাসুদ ঃ ওভার ডেভেলপড ..... পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্রাইসিস অব পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, সম্পাদনা, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৮।

হোসেন আলহাজ্ব সৈয়দ আব্ল ঃ গণতন্ত্র নেতৃত্ব ও উন্নয়ন, প্রকাশক মোঃ আবদুল কাদের, প্রকাশক মোঃ আবদুল কাদের, ১৬ কবি জসিম উদ্দিন রোড, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৯১।

হোসেন আলহাজ্ব সৈয়দ আব্ল ঃ শেখ হাসিনার অমর কীর্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি, সাকো ইন্টারন্যাশনাল, আমিনকোর্ট, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২০।

হোসেন মইনুল ঃ অনেক কিছুই ভুলতে হইবে, অনেক কিছুই শিখিতে হইবে, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৪ই মে, ১৯৯৪।

Allan Ran Wick & Lan Swinburn : Basic Political Concept, Hufichinmon & Company 1983, Page–96.

Ahmed Moudud : Era of Sheikh Mujibur Rahman, UPL.

Ahmed Moudud : Bangladesh Conditional Quest for Autonomy, UPL–1979.

Ahmed Moudud : Crisis of Democracy in Bangladesh, Holiday, October 18, 1997, P–3.

Ahmed Kamruddin : A Socio Political History of Bengal and The Birth of Bangladesh.

Azad Maulana Abul Kalam : India Wins Freedom, Orient Longman, New Delhi, 1989.

Ahmed Sirajuddin : Sheikh Hasina Prime Minister of Bangladesh, Golam Mustafa, Hakkani Publishers, 1999, Page-132.

Ahmed Imtiaz : State & Foreign Policy : Indians Role in South Asian Academic Publishers 1993, PP 209–304.

Dhaka University Institutional Repository

Birch H. Anthoney : The British System of Government, Allan Union, London, 1986.

Ball, Allan : Modern Politics & Government, The Macmillan Press Ltd. ed. 1977. Printed in great Britain. By Richard Clay Limited, Beng way, Suffolk, P–56.

Bather and Harvey : The British Constitution.

Chowdhury G.W. : The Last Days of United Pakistan, Churst, London, 1974.

Chouwdhury Nazma : The Legislative Process in Bangladesh, Politics & Functioning of the east Bengal legislature, 1947–58, UPL, Dhaka, 1980.

Emerson Rupert : From empire to nation, Boston : Beacon Press, 1960, P–94.

Finer H. : The Theory and practice of Modern government London, Pal Mall Press, 1962, P–592.

Frank Andre Gunder : Development of Under Development in Charles K Illber(ed) "The Political Economy of Under development. New York, Random House, 1973.

Gettle, R.G. : Political Science, World Press Calcutta, 1950, Page–199.

Harun Shamsul Huda : Bangladesh Voting Behavioral A Psychological Study 1973, UPL, April, 1986, P–21.

Haque Abul Fazal : "The Problem of National Identity of Bangladesh" Journal of Social Studies, No–24, April 1984, P–230.

Haider Jaglul : Parliamentary Democracy in Bangladesh: From Crisis to Crisis, Page–64, Vol. 42, No. 1, J, Asiatic Soc,. 1997.

Haque Khandaker Abul : Parliamentary Committees in Bangladesh : Structures and Function, Congressional Studies Journal, Vol. 2, No. 1, January, 1994.

Haider Jaglul : Ethnic Problem in Bangladesh : A case study of Chakma Issue in the Chittagong Hill Tracts, The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, No. ixv, 1982, PP : 56–79.

Harun Shamsul Huda : Parliamentary Behaviour in a Multinational state 1947–58 : Bangladesh Experience, Asiatic Society of Bangladesh 1984.

Islam M Nazrul : The politics of National Integration in new states : A comparative study of Pakistan & Malaysia 1957–1970. Ph.D discretion, Griffith University, Australia, 1981.

Islam Nazrul : Parliamentary Democracy in Bangladesh : An Assessment, Perspective in Social science review, Vol. 5, No. 1, 1997, Page–5.

Jennings Ivor : Cabinet Government, Cambridge University Press, 1961, P–16.

Dhaka University Institutional Repository

Jennings Ivor : The British Constitution, Cambridge University Press, New York, 1950, P–65.

Jahan Rounaq : Bangladesh Politics Problems and Issues, UPL Ltd. 1980.

Jahan Rounaq : Pakistan Failure in National Integration, Columbia University Press, New York 1972.

Khan Rahman Zillur : Leadership Crisis in Bangladesh; Dupl, 1984, Redcross Building, Motijheel C/A, P–167.

Laski, J Harold : Democracy in crisis, London, George Allenand & Union Ltd. 1933.

MacIver R.M. : The Modern State, London, Oxford University Press, 1964, Page–399.

Monirujjaman Talukder : The Bangladesh Revolution and its aftermath, UPL, Dhaka, 1983.

Mohammad Anu : "Economics of the world Bank; growing resources, increasing deprivation" Holiday, December, 1995.

Mascarenras Anthony : Bangladesh a legacy of blood, London, 1986.

Narien Verendra : Foreign Policy of Bangladesh (1979-81) Hauoyr Helekh Publishers, 1987, P–207.

Pye Lucian : Aspect of political development, Little Brown and Company, Boston, 1966, P-68.

Sayeed K.B : The political system of Pakistan, Boston, Ltoughton, Miffin Co. 1967, P-12.

Sabur AKM Abdus : Some Reflections on the Dynamics of Bangladesh Indian Relations in Iftekharujjaman & Imtiaz Ahmed (ed) Bangladesh and SAARC Issues Perspective and out look : Dhaka Academic Publishers, 1992, P–150.

Sayeed K.B : Pakistan The Formartine phase, 1957–198, London, Oxford University Press.

Yong Koland : The British Parliament, 1967, Page–22.

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য পঞ্জি

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক সংবাদ, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক আজকের কাগজ, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক বাংলার বাণী, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক বাংলা বাজার, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক জনতা, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক ভোর, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক ইনকিলাব, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক দিনকাল, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

দৈনিক খবর, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬।

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ৩০ শে আগস্ট, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৯২।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৬।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৪।

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ঢাকা, ৪ঠা জুলাই, ১৯৯৪।

সাপ্তাহিক বাংলা বার্তা, ঢাকা, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৪।

সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, ঢাকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, ঢাকা, ১৪শে জুলাই, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক ২০০০, ঢাকা, ৬ই আগস্ট, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

DAILY PAPERS

Daily Star, Dhaka, May 15, 1996

Daily Star, Dhaka, January 1, 1993

Daily Star, Dhaka, December 19, 1994

Daily Star, Dhaka, March 20-26, 1996

Daily Star, Dhaka, 1-3, 2000

Daily Star, Dhaka, December 1, 1996

The Independent, Dhaka, February 8, 1998

Bangladesh Observer, Dhaka, February 20, 1979

WEEKLY PAPER & MAGAZINE

Holiday, Dhaka, November 23, 1990

Holiday, Dhaka, December, 1996

Holiday, Dhaka, January 11, 1997

Holiday, Dhaka, January 18, 1996

Holiday, Dhaka, February 15, 1997

Weekly Dhaka Courier, Dhaka, November 24, 1993

Weekly Dhaka Courier, Dhaka, March 13, 1993

Fer Eastern Economic Review, October 31, 1992